মানুষের শেষ ঠিকানা

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

পারিবারিক গ্রন্থাগার
জাসরীনা বিনতে মুজাহিদ

মানুষের শেষ ঠিকানা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মানুষের শেষ ঠিকানা

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

দারুল হিকমাহ্ বাংলাদেশ
পরিবেশক : কামিয়াব প্রকাশন ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
কামিয়াব প্রকাশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১১২২০৪, ০১৮২১৬৬০৪, ০১৭১৮৮২৮৭০

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০২

মূল্য
একশত চল্লিশ টাকা মাত্র
(একদামে ক্রয় করুন)

প্রচ্ছদ
রফিক উল্যাহ, দি ডিজাইনার

বর্ণবিন্যাস
রহমত কমপিউটার্স

মুদ্রণ
কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং

Manusher Shash Thikana : by Abduddaian Muhammad Eunus, Published by kamiub Prokashon, Banglabazar, Dhaka 1100. Phone 7112204, 018216604, 017882870. Fixed price : Tk 120.00 Only. US $ 8

www.pathagar.com

আমার প্রিয় মা, মরহুমা মজিবা খাতুন
যাঁকে আমার ছোট বেলায়
আল্লাহ তাঁর কাছে নিয়ে গেছেন।

শাশুড়ি, শ্রদ্ধেয়া শামছুন্নাহার
আব্বা, মৌলভী মুজাফফর আহমদ
ও
শ্বশুর, মাওলানা আব্দুল আউয়ালের
প্রতি নিবেদিত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
আমরীনা বিনতে মুজাফ্ফির

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, 'মানুষের শেষ ঠিকানা' বইটি যাঁর একান্ত অনুগ্রহে লেখা সম্পন্ন হলো।

এ বিষয়ের উপর কোন বই লেখার উদ্দেশ্যে প্রথম লেখা শুরু করিনি। ২০০০ সালে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারা যাবার সংবাদ শুনে 'মৃত্যুই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা' শিরোনামে একটা ছোট প্রবন্ধ লিখি, যা লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আলোর পথ' পত্রিকায় ছাপা হয়। এর পর লন্ডনে 'মুসলিম কমিউনিটি রেডিও'তে জান্নাত ও জাহান্নামের উপর আলোচনার জন্য আমাকে বলা হলে বিষয়টির উপর কিছু পয়েন্ট নোট করতে বসি। তখন ছিল ২০০১ সালের রমযান মাস। পবিত্র রমযান মাসে পয়েন্ট লিখতে বসে বিষয়টির উপর আমার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখার কলেবর বৃদ্ধি পায়, যা লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা'য় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। পত্রিকায় প্রকাশের পর অনেকেই একে বই আকারে প্রকাশের পরামর্শ দেন। তাঁদের পরামর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিষয়টির উপর আরো পড়াশুনা শুরু করি এবং লেখায় সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়াস পাই।

আমরা সবাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে আমাদের যেতে হবে পরপারে। কিন্তু কে কখন পরপারের পথিক হবো তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। এজন্য সবসময় মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য পুঁজি সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অনেকেই অধিকাংশ সময় দুনিয়ার মোহে আবিষ্ট থাকেন। ধন-সম্পদের আকর্ষণে আখিরাতের কথা বেমালুম ভুলে যান। দুনিয়া নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকেন যে, ঠিকমত নামায পড়ারও সময় পান না। অথচ দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেলে দুনিয়ার কোন কিছুই সাথে যাবে না। সাথে যাবে শুধু নেক আমল।

আমাদের চোখের সামনে অনেককে ইন্তিকাল করতে দেখি। আমরা প্রতিনিয়ত এমন অনেকের জানাযা পড়ি, অনেককে কবরে রাখি। যারা প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক, অনেক ক্ষমতার অধিকারী। যাদের ঘরে ঢুকলে মখমলের বিছানা, সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র চোখে পড়ে। মরণের পর তাঁদের সাথে কি আমরা এসব জিনিস দিয়ে দেই? লেপ, তোশক সুন্দর বিছানা কিছুই আমরা কবরে দেই না। ধপধপে সাদা কাফনের কাপড়ে জড়িয়ে কবরে রাখি। আর কবরে শুধু মাটি আর মাটি।

আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদেরকেও একদিন মরতে হবে। আমাদেরও একদিন জানাযা পড়া হবে। একদিন আমাদেরকেও কবরে রাখা হবে। কিন্তু আমরা জানি না কবে আমাদের মরণ হবে, কোথায় আমাদের জানাযা হবে, কোথায় আমাদের কবর হবে, কে আমাকে কবরে রাখবে। কিংবা আদৌ কেউ কবরে রাখতে পারবে কিনা? কেননা অনেক মানুষ দুর্ঘটনায় মারা যান যাদের লাশও খুঁজে পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

আমরা যদি মরণের কথা সবসময় মনে জাগরূক রেখে দুনিয়ায় চলি, তাহলে আমাদের দ্বারা কোন খারাপ কাজ হতে পারে না। কারণ আমাদের বিশ্বাস মরণ শুধু জীবনাবসানের নাম নয়; মরণ নতুন জীবনের সূচনা। যে জীবনের সুখ বা দুঃখ নির্ভর করে দুনিয়ার জীবনের কর্মের উপর। কেউ যদি দুনিয়ার জীবনে কারো উপর যুলুম করে, আখিরাতে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। দুনিয়ার জীবনে 'দুনিয়ার আদালত'-এর সাজা থেকে বাঁচতে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হলেও 'আল্লাহর আদালত'-এর সাজা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। মরণের সাথে সাথে ফেরেশতারা রূহ নিয়ে যাবে। ভাল কাজ করলে ইল্লীনে আর খারাপ কাজ করলে সিজ্জীনে রূহ নিয়ে যাবার পর নেয়ামত বা সাজা ভোগ শুরু হয়ে যাবে। আখিরাতে বিচার ফায়সালার পর চূড়ান্ত পুরস্কার জান্নাত বা চূড়ান্ত শাস্তি জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

আখিরাতে শাস্তির এ ভয় একজন মানুষকে সৎ বানায়। একজন মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তা, চেতনা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। আখিরাতে পুরস্কারের আশায় দুনিয়ার জীবনে একজন মানুষ ইসলামের জন্য জীবন বিলায়। ইসলামের জন্য যুলুম নির্যাতন ভোগ করে। যদি আখিরাতে শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের আশা না থাকতো তাহলে দুনিয়ায় আদৌ শান্তি থাকতো না। দুনিয়া পরিণত হতো দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর অন্যায়ের লীলাভূমিতে। বর্তমানে দুনিয়াতে যেসব অন্যায়, অশান্তি দেখা যায় তার কারণ হল, আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস বা দুর্বল বিশ্বাস। দুনিয়ার সবাই যদি আখিরাতের পুরস্কার বা শাস্তির কথা মনে রেখে চলতো তাহলে দুনিয়ার জীবন হতো প্রেম-প্রীতিপূর্ণ শান্তির নীড়।

আমরা দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য কত কিছুই করি। বাড়ি-গাড়ি ও বিলাসবহুল আরো কত কিছু ভোগ করি। কিন্তু এসব কিছু আমাদের সাথে কবরে নেওয়া যাবে না। আখিরাতের পথে এসব আমাদের সঙ্গী হবে না। এমনকি আদরের সন্তান-সন্ততি পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন কেউ আমাদের সঙ্গী হবে না। মৃত্যুর পর কবরে মাটি দেওয়া শেষ হলে সবাই কবরে রেখে চলে আসবে। কবরে আমাদের সঙ্গী হবে আমল। আমরা যদি দুনিয়াতে নেক আমল করি, তাহলে কবরে শান্তিতে থাকবো আর আখিরাতে শেষ ঠিকানা হবে জান্নাত। আর যদি দুনিয়াতে খারাপ আমল করি তাহলে কবরে সাপের কামড়, আগুনের তাপসহ আরো কত কষ্ট ভোগ করতে হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। তাছাড়া আখিরাতে আমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। আমাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, নাওযুবিল্লাহ।

এখন একটু চিন্তা করা দরকার, আমরা দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য যা কিছু করি সে তুলনায় স্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য কি করি? আমরা সবাই আখিরাতে সুখ চাই। কিন্তু অনেকসময় শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে সে পথে চলতে পারি না। দুনিয়ার মোহ আমাদেরকে আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করা থেকে বিরত রাখে। দুনিয়ার মোহে না পড়ে আখিরাতের জন্য নেক আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ উদ্দেশ্যেই আলোচ্য বইটি লেখা হয়েছে।

www.pathagar.com

এ বইতে কুরআন ও হাদীস থেকেই তথ্য নেওয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে 'তাফসীর তাফহীম আল কুরআন' 'তাফসীর মাআরেফ আল কুরআন' ও 'তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন'-এর বাংলা অনুবাদ থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ফিকহ, আকাঈদ ও আখিরাত সংক্রান্ত আরবী, বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় রচিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। বইটিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরপারের বিভিন্ন ধাপের একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর সাথে আকীদা সংক্রান্ত কিছু বিষয় এবং ফিক্হী ও দার্শনিক কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলেও তা মূল উদ্দেশ্য ছিল না। এ কারণে যেখানে এসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা এসেছে তা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থান করা হয়েছে।

বইটিতে আখিরাতের বিভিন্ন ধাপের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে মাঝে-মধ্যে যুক্তি প্রদর্শন করা হলেও বইটি যুক্তিনির্ভর করার চেয়ে কুরআন ও হাদীস-এর বক্তব্যনির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ, আখিরাতের প্রতিটি ধাপের যে বিবরণ কুরআন ও হাদীসে এসেছে তা গায়েবের উপর ঈমান আনার সাথে সম্পৃক্ত। আলমে আখিরাতের কোন বিষয় মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধিতে বুঝে আসুক বা নাই আসুক তা বিশ্বাস করতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তিনির্ভর হয়ে অতীতে মুতাযিলাসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। তারা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য যুক্তি দিয়ে বুঝার চেষ্টা করতে গিয়েই বিভ্রান্ত হয়েছে। এ কথা ঠিক যে, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। আল্লাহ্ নিজেই কাফির-মুশরিকদের সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দিতে গিয়ে কুরআনে অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু মানুষের সীমিত জ্ঞান ও বুদ্ধিতে কুরআন ও হাদীসের সকল কিছু বুঝে আসা কঠিন। তবে এর অর্থ এ নয় যে, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করা যাবে না। আল্লাহ্ মানুষকে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন এ জ্ঞান দিয়ে কুরআন ও হাদীস বুঝার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর করার জন্য আল্লাহ্ কুরআনের অনেক জায়গায় বলেছেন। এভাবে তাদাব্বুর বা তাফাক্কুর করার পরও যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে কিংবা মানবীয় যুক্তির বিপরীত মনে হয়, সে সময় অন্ধভাবেই কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে সত্য বলে গ্রহণ করার নামই হচ্ছে ঈমান। আফসোসের বিষয়, মুসলমানদের কেউ কেউ যুক্তি তালাশ করতে গিয়ে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টা করেন। যেমন– কবরের আযাবের বিষয়টি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মুতাযিলা সম্প্রদায় কবরের আযাবে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, কবরের আযাব সত্য। অনেক সহীহ হাদীসে কবরে আযাবের সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। এ বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের কোন অবকাশ নেই।

বইটিতে আখিরাতের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি মানুষ কেন দোযখে যাবে এবং কোন্ পথে চললে বেহেশতে যাবে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ, আমাদের সমাজে এমন অনেকেই আছেন যারা আখিরাতে নাজাত পাওয়ার জন্য এমন

www.pathagar.com

পথে চলেন, যেটা নাজাতের পথ নয়। এমনকি কেউ কেউ শির্‌ক ও বিদআতেও লিপ্ত হয়ে পড়েন। তাই কুরআন ও হাদীস থেকে আখিরাতে নাজাতের সঠিক পথ তুলে ধরা প্রয়োজন বলে অনুভব করেছি।

বইটিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকেই তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি পাঠে কেউ যদি সামান্যতম উপকৃত হন তাহলে শ্রম সার্থক হবে। আর এ বইটি যেন আখিরাতের কঠিন সময়ে নাজাতের ওসিলা হয়, আল্লাহর কাছে সে দোয়াই করছি। বইটি লেখার ক্ষেত্রে যেসব গ্রন্থ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে, আল্লাহ্ সেসব গ্রন্থের লেখকদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর যাঁরা বইটি লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে আমার জীবনসঙ্গিনী রোজি সাজেদা ও শিশু পুত্র ইবরাহীম জাওয়াদের কথা উল্লেখ করতে হয়। শিশু পুত্রকে আদর করার অনেক সময় এ বইটি লেখার কাজে ব্যয় করতে হয়েছে। আল্লাহ্ যদি সকলের উপর রাজি ও খুশি হন তাহলে এর বিনিময়ে জান্নাতে এক সাথে থাকা যাবে। আল্লাহকে খুশি করার মত আমল যেন সবাই করতে পারি– সে ফরিয়াদ জানাচ্ছি।

বইটিতে কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি থেকে সহীহ্ কথা লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার চেষ্টার পরও যেসব ভুল রয়ে গেছে, আল্লাহ্ তার জন্য আমাকে মাফ করুন। কোন পাঠকের কাছে কোন ভুল ধরা পরলে আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। আমি বিশেষভাবে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কামিয়াব প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন ও হেলাল উদ্দীনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া শ্রদ্ধাস্পদ হামিদ হোসাইন আযাদ, জনাব নাজমুল হাসান ও সুপ্রিয় নজরুল ইসলাম, বড় বোন ছালেহা মমতাজ, তাহেরা আরজু ও ছোট বোন মাহেরা রুবীসহ যারা বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়েছেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁদের সকলের নিকট ঋণী। আল্লাহ্ পাক তাঁদের সকলকে আখিরাতে পুরস্কৃত করুন এবং আমাদের সকলকে নেক আমল করার তাওফিক দান করুন। আমাদের যাবতীয় গুনাহ-খাতা মাফ করে দিন। আমীন।

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ
রবিবার, ৯ জুন ২০০২
ডাইরেক্টর, আল ইকরা রিসার্চ একাডেমী
লন্ডন-বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবী মানুষের আসল ঠিকানা নয়

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব/২৫

দুনিয়া মানুষের আসল ঠিকানা নয়/২৮

মানব জীবনে আখিরতে বিশ্বাসের প্রভাব/৩৩

মৃত্যু হল পরীক্ষা স্বরূপ/৩৯

মৃত্যু অবধারিত/৪১

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ প্রসঙ্গে/৪৩

নির্ধারিত হায়াত শেষেই সকলের মরণ হয়/৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা

মৃত্যু আখিরাতের পথে যাত্রার নাম/৫১

কোন ধরনের মৃত্যু উত্তম/৫৩

যে ধরনের মরণ থেকে পানাহ চাইতে হবে/৫৪

চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় মৃত্যু/৫৫

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে/৫৫

সাকরাতুল মাওত-এর সময় করণীয়/৫৭

মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতা, দেনা পরিশোধ ও অসিয়ত/৫৮

কারো মৃত্যুর পর জীবিতদের করণীয়/৬২

চোখ বুঝে দেওয়া/৬৩

শরীর কাপড় দ্বারা ঢেকে দেওয়া/৬৩

দ্রুত কবর দেওয়া/৬৩

মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ/৬৪

ধৈর্য ধারণ করা; বিলাপ না করা/৬৫

মৃত মানুষ সম্পর্কে ভাল বা খারাপ মন্তব্য করা/৬৭

মাইয়েতের গোসল/৬৯

কাফন/৭৩

জানাযা/৭৫

দাফন বা কবর/৮০

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

কবরের সওয়াল-জওয়াব ও বরযখের জগৎ

কবর সম্পর্কে কিছু কথা/৮৬
কবরের সওয়াল ও জওয়াব/৮৬
জান্নাতীদের জান্নাতের পোশাক ও জাহান্নামীদের জাহান্নামের পোশাক দেওয়া হবে/৮৭
জান্নাতীরা কবরেও নামায পড়তে চাইবে/৮৮
কবর আযাব/৮৮
কবরে আযাবের ধরন বা প্রকৃতি/৯৩
সাপে দংশন/৯৩
লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে/৯৩
জাহান্নামের স্থান প্রদর্শন/৯৪
কবর সংকুচিত করে দেওয়া/৯৪
কবর আযাবের কারণ সম্পর্কে হাদীস/৯৪
চোগলখুরী করা ও পেশাব থেকে সতর্ক না থাকাও কবরে শাস্তির কারণ হবে/৯৪
যাদের লাশ পাওয়া যায় না/৯৫
আলমে বরযখের আরো কতিপয় প্রসঙ্গ/৯৮
সওয়াল জওয়াব কি শুধু উম্মতে মুহাম্মদী'র জন্য/৯৮
কবরবাসী কি শুনে/১০০
আলমে বরযখে রূহ কোথায় থাকে/১০২
নবী ও রাসূলগণের রূহ/১০২
শহীদদের রূহ/১০২
শহীদ ছাড়া সাধারণ মুমিনদের রূহ/১০৩
স্বপ্নে রূহের সাথে সাক্ষাৎ/১০৪
এক সঙ্গে অনেকেই মারা যায় কিন্তু কিভাবে রাসূলকে সবার কবরে দেখা যায়/১০৪
সওয়াল-জওয়াব মুখস্থ করলে ফায়দা নেই/১০৪
কবর পাকাকরণ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ প্রসঙ্গ/১০৫
কবর যিয়ারত/১০৬
মৃতের জন্য শোক প্রকাশ/১০৭
স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক/১০৮
মৃতের জন্য শোক সভা ও কুলখানি করা/১১০
মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা দান/১১০
মৃত মানুষের কাছে কিছু চাওয়ার পরিবর্তে দোয়া করা/১১১

www.pathagar.com

মাইয়েতের জন্য যা উপকারী/১১১
মৃত্যুর পরও সওয়াব পেতে হলে/১১৩
সদকায়ে জারিয়া/১১৪
নেক সন্তান/১১৫
উপকারী ইলম/১১৬
কবরে লাশ পচে যাওয়া/১১৮

চতুর্থ অধ্যায়

কিয়ামত বা মহাপ্রলয়

ইস্রাফীলের শিঙ্গা ফুঁক/১২১
কিয়ামতের কতিপয় চিত্র/১২৩
পৃথিবী হঠাৎ করেই প্রকম্পিত হবে/১২৩
পাহাড় পর্বত তুলার মত উড়তে থাকবে/১২৪
আসমান-জমিন টুকরো টুকরো হবে এবং লুক্কায়িত সব রেকর্ড বাইরে ফেলে দেবে/১২৫
আসমান কাঁপতে থাকবে ও বিগলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে/১২৫
চন্দ্র ও সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে/১২৬
সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে/১২৬
সেদিন প্রত্যেকে নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা স্মরণ করবে না/১২৭
কিয়ামত কবে হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন/১২৭
কিয়ামতের নিদর্শন/১২৮
কিয়ামতের বড় নিদর্শন-দাজ্জালের আবির্ভাব/১২৯
হযরত ঈসার আগমন/১৩১
ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব/১৩১
কিয়ামতের দশ নিদর্শন-সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া/১৩২
হাশর বা মহাসমাবেশ/১৩২
হাশরের কতিপয় চিত্র/১৩৪
সবাই নগ্ন থাকবে/১৩৪
আল্লাহ্ সবাইকে পুনর্জীবন দান করবেন/১৩৪
ফেরেশতারা হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে/১৩৫
নাফরমান লোকদের হাশর/১৩৬
অপরাধীদের অনুতাপ/১৩৭
অপরাধীদের চেহারা দেখে চেনা যাবে/১৩৮
নেককার লোকদের অযুর স্থানসমূহ চিকচিক করে চমকাবে/১৩৮

www.pathagar.com

সূর্য খুব কাছে থাকবে/১৩৮
হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যারা/১৩৯
হিসাব, মীযান ও বিচার/১৩৯
বিচারের ক্ষেত্রে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয়/১৪৩
কোন উকিল, সাহায্যকারী বা দোভাষী থাকবে না/১৪৪
প্রত্যেককে পাঁচটি বিষয়ের জবাব দিতেই হবে/১৪৪
প্রত্যেককে নিজের আমলনামা পড়তে দেওয়া হবে/১৪৫
আমলনামায় সব কিছু লিপিবদ্ধ দেখতে পাবে/১৪৫
নেক্ বান্দারা ডান হাতে আর বদকাররা বাম হাতে আমলনামা পাবে/১৪৬
বন্ধু-বান্ধব কেউ কারো উপকারে আসবে না/১৪৭
একমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিই সুপারিশ করতে পারবেন/১৪৭
ভাল-মন্দ সব কিছুর প্রতিফল দেওয়া হবে/১৪৮
আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত সকল নিয়ামতের হিসাব নিবেন/১৪৮
যাদের চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাদের পরিত্রাণ নেই/১৪৮
হাক্কুল্লাহর মধ্যে আল্লাহ প্রথম নামাযের হিসাব নিবেন/১৪৯
হাক্কুল ইবাদের মধ্যে রক্তপাতের হিসাব প্রথম নেওয়া হবে/১৫০
আল্লাহ সরাসরি তার বান্দার সাথে কথা বলবেন/১৫০
নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে/১৫০
বিচারের রায়/১৫১
বিচারের পর জান্নাতীদের আনন্দ ও জাহান্নামীদের বেদনা/১৫২
শাফায়াত/১৫৩
হাউজে কাওসার/১৫৬
পুলসিরাত/১৫৮
নূর বা আলো বন্টন/১৫৯
জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করা হবে/১৬০

পঞ্চম অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নাম

জান্নাত/১৬৩
জান্নাতের আট তোরণ প্রসঙ্গে/১৬৩
জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য/১৬৪
কুরআন ও হাদীসের আলোকে জান্নাতের বিবরণ/১৬৭
সৌরভ ও সুগন্ধ সবসময় পাওয়া যাবে/১৬৭

www.pathagar.com

সবুজ শ্যামল বাগান/১৬৮
প্রবহমান ঝরণা ধারা/১৬৮
দুঃখ-বেদনা বা কোন ধরনের চিন্তা থাকবে না, সবাই সন্তুষ্ট থাকবে/১৬৯
জান্নাতীদের খাদেম/১৬৯
কোন বাজে কথা শুনবে না/১৬৯
বিশেষ উপহার/১৭০
হুর ও গেলমান/১৭০
কিশোরদের সম্ভাষণ/১৭১
যা চাইবে তাই পাবে/১৭২
পোশাক/১৭২
মখমলের বিছানা ও হেলান দেওয়ার মত বালিশ/১৭৩
স্বর্ণের জিনিস ব্যবহার করতে পারবে/১৭৩
খাবার ও পানীয়/১৭৩
শরাব দেওয়া হবে/১৭৩
মধু ও দুধের নহর/১৭৪
নানা ধরনের ফল ফলাদি/১৭৫
পাখির গোশত/১৭৬
কাঁটাবিহীন বদারিকা বৃক্ষ/১৭৬
থাকার আবাস কেমন হবে/১৭৬
সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আল্লাহর দীদার/১৭৭
জান্নাত প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা/১৭৮
জান্নাতীদের আর মৃত্যু নেই, জান্নাতই স্থায়ী আবাস/১৭৮
জান্নাতে কোন জিনিস নষ্ট ও শেষ হবে না এবং কোন কষ্ট হবে না/১৭৯
বেহেশতের বাজার/১৭৯
পরিবার-পরিজনসহ বসবাস/১৮০
জান্নাতীদের একে-অপরের সাথে সাক্ষাৎ/১৮০
গরীবরা জান্নাতে আগে প্রবেশ করবে/১৮০
জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের মর্যাদা ভোগ/১৮১
একজন সাধারণ জান্নাতীর প্রাপ্য/১৮১
হযরত আদম (আ) কোন জান্নাতে ছিলেন/১৮২
জান্নাতের পথ একটাই/১৮৩
জাহান্নাম/১৮৩

www.pathagar.com

জাহান্নামে সাতটি স্তর বা দরজা প্রসঙ্গে/১৮৫
জাহান্নাম সম্পর্কিত কিছু বিষয়/১৮৯
দোযখের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর/১৮৯
জাহান্নামীদের মৃত্যু কামনা/১৮৯
দোযখের আগুন/১৮৯
দোযখের গভীরতা/১৯০
জাহান্নামে নিযুক্ত ফেরেশতারা হবে কঠোর স্বভাবের/১৯০
জাহান্নামের শাস্তির কিছু বিবরণ/১৯০
ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে জাহান্নামীদেরকে নেওয়া হবে/১৯১
পিপাসিত থাকা/১৯১
মাথার সম্মুখভাগের চুল ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে/১৯১
আগুন ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে/১৯২
আগুনের লেলিহান শিখা ঘিরে রাখবে/১৯২
মাথায় গরম পানি ঢালা হবে/১৯২
আগুনের পাহাড়ে উঠতে দেওয়া হবে/১৯৩
লোহাড় হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে/১৯৩
জিঞ্জির দ্বারা আটকে রাখা হবে/১৯৩
চামড়া বারবার পরিবর্তন করে দেওয়া হবে/১৯৩
চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে/১৯৪
সবসময় বিকট চিৎকার করবে/১৯৪
কি ধরনের খাবার ও পানীয় দেওয়া হবে/১৯৪
যাক্কুম ভক্ষণ করতে হবে/১৯৪
পানীয় হবে ফুটন্ত পানি, পুঁজ ও মলমূত্র/১৯৪
কাঁটাযুক্ত খাবার/১৯৫
গন্ধকের গন্ধযুক্ত আগুনের কাপড় পরিধান করতে দেওয়া হবে/১৯৬
পায়ে আগুনের জুতা/১৯৭
চাদর ও বিছানা হবে আগুনের/১৯৭
জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন/১৯৮
জান্নাত ও জাহান্নাম কি এখনও বিদ্যমান এবং স্থায়ী হবে/১৯৮
তাকদীরের লিখাই কি জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ/২০০

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

যেসব কারণে মানুষ দোযখে যাবে

কুফর/২০৯
আল্লাহর জাত ও সিফাতকে মন থেকে অস্বীকার করা/২১০
আল্লাহর রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার/২১০
আল্লাহর কোন নির্দেশকে অস্বীকার করা/২১১
আচরণের মাধ্যমে কুফরী/২১১
জবানের মাধ্যমে কুফরী/২১১
শির্‌ক/২১২
শিরক কয়েকভাবে হতে পারে/২১২
উলামায়ে কেরাম শিরক্‌কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন/২১৩
শিরকে আকবার/২১৩
শিরকে আসগার/২১৪
নিফাক/২১৫
নিফাক্‌কে উলামায়ে কেরাম দু'ভাগে ভাগ করেছেন/২১৫
নিফাকে আকবর/২১৫
নিফাকে আসগর/২১৫
রিদ্দাত/২১৮
ভ্রান্ত ধর্ম, দর্শন বা আকীদা অনুসরণ/২২০
ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসরণ/২২২
ইহুদীবাদ/২২২
খ্রিস্টবাদ/২২৪
হিন্দু ধর্ম/২২৭
ভ্রান্ত জীবন দর্শন বা মতবাদের অনুসরণ /২৩১
পুঁজিবাদ/২৩২
সমাজতন্ত্র/২৩৪
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ/২৩৬
ভ্রান্ত আকীদার অনুসরণ /২৪০
কাদিয়ানী মতবাদ/২৪০

সপ্তম অধ্যায়

আরো যেসব কারণে মানুষ দোযখে যেতে পারে

কবীরা গুনাহ কি/২৪৩
হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর হক আদায় না করা/২৪৪

www.pathagar.com

নামায তরক করা বা নামাযে শিথিলতা প্রদর্শন করা/২৪৪
যাকাত আদায় না করা/২৪৬
রমযানের রোযা পালন না করা/২৪৮
হজ্জ না করা/২৪৮
হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক নষ্ট করা/২৪৯
কারো উপর যুলুম করা/২৪৯
কারো সাথে তিনদিন কথা না বলা/২৪৯
রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা/২৫০
পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ/২৫০
গীবত করা/২৫১
সুদী কারবার করা/২৫২
চোগলখুরী করা কিংবা কারো দোষ খুঁজে বেড়ানো/২৫৩
ওজনে কম দেওয়া/২৫৩
মজুতদারি করা/২৫৩
চোরাচালান করা/২৫৪
ব্যবসায়ে কসম ও ধোঁকাবাজি করা/২৫৪
দালালি করা/২৫৪
ঘুষ/২৫৪
খিয়ানত/২৫৪
কোন সাহাবীকে গালি দেওয়া বা কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া/২৫৫
ইয়াতীমের হক নষ্ট করা/২৫৬
জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা/২৫৬
হুদূদ-কেসাস তথা দণ্ডযোগ্য অপরাধ করা/২৫৭
যিনা করা/২৫৮
কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা/২৬০
চুরি/২৬০
কারো প্রতি অপবাদ দেওয়া/২৬১
মাদকদ্রব্য সেবন/২৬২
সমকামিতা /২৬৩
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) যা হারাম করেছেন তা করা/২৬৩
মীরাস বণ্টনে আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করা/২৬৪
গণকের কাছে যাওয়া/২৬৫
হারাম কিছু ভক্ষণ করা/২৬৫

www.pathagar.com

মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া/২৬৫
স্বর্ণালংকার ব্যবহার ও রেশমের কাপড় পরিধান করা/২৬৫
যাদু করা/২৬৬
জুয়া খেলা ও লটারি/২৬৬
অহংকার ও রিয়া/২৬৬
সিনেমা দেখা/২৬৭
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও কাউকে ধোঁকা দেওয়া/২৬৭
যৌতুক নেওয়া/২৬৭
জিহাদের ময়দান থেকে পালানো/২৬৮
মুহরিম বা মুহরিমাত ছাড়া বাকিদের সাথে পর্দা পালন না করা/২৬৮
অপচয় ও অপব্যয় করা/২৬৮
আত্মহত্যা করা/২৬৮
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা/২৬৯
সন্তানাদির মধ্যে সমতা রক্ষা না করা/২৬৯
ভাস্কর্য নির্মাণ করা/২৬৯
অবৈধ গর্ভপাত ঘটানো/২৬৯
নিষিদ্ধ পেশা গ্রহণ করা/২৭০

অষ্টম অধ্যায়
আখিরাতে সফলতা লাভের পথ
ঈমান/২৭৩
আমলে সালেহ/২৭৬
ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত পালনে অনেক নেকী/২৮০
পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করা/২৮০
জুমআর নামায/২৮২
দুই ঈদের নামায/২৮৩
জানাযার নামায/২৮৩
নামাযের সাথে সম্পৃক্ত আমলেও সওয়াব আছে/২৮৪
অযু/২৮৪
মেসওয়াক/২৮৪
জুমআর নামাযের জন্য গোসল করা/২৮৫
তাইয়্যাতুল অযুর সালাত/২৮৫
আযান/২৮৬

www.pathagar.com

আযানের দোয়া/২৮৭
ইকামাত/২৮৭
জামাতের সাথে সালাত আদায়/২৮৭
নামাযের পর আল্লাহর কাছে দোয়া করা/২৮৮
ফরয রোযা পালন করা/২৮৮
রোযার সাথে সম্পৃক্ত আমলেও সওয়াব আছে/২৯০
ইফতার/২৯০
কাউকে ইফতার করানো/২৯০
সাহরি/২৯১
তারাবীহ/২৯১
বেশি বেশি নফল ইবাদাত ও যিকর-আযকার করা/২৯১
ইতিকাফ করা/২৯১
লায়লাতুল কদর/২৯২
সদকাতুল ফিতর আদায় করা/২৯২
ফরয হজ্জ আদায় করা/২৯৩
হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত আমলেও সওয়াব আছে/২৯৪
অর্থ ব্যয়/২৯৪
ইহরাম ও তালবিয়া/২৯৫
ইহরামের আগে নামায/২৯৫
তাওয়াফ/২৯৫
হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করা/২৯৬
মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামায/২৯৬
সাফা ও মারওয়ায় সায়ী বা দৌড়ানো/২৯৬
আরাফার ময়দানে বিশেষ ক্ষমা/২৯৭
রামী বা পাথর নিক্ষেপ/২৯৭
মুযদালিফায় রাত্রি যাপন/২৯৮
মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা/২৯৮
কুরবানী/২৯৯
যমযমের পানি পান করা/৩০০
বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীতে সালাত আদায়/৩০০
মসজিদে কুবায় নামায আদায়/৩০০
যাকাত আদায় করাতেও সওয়াব আছে/৩০১
নফল আদায়েও অনেক সওয়াব/৩০২

www.pathagar.com

নফল সালাতেও অনেক নেকী/৩০২
নফল সিয়ামেও অনেক নেকী/৩১০
শাওয়ালের ছয় রোযা/৩১০
মুহাররামের রোযা/৩১০
আরাফাতের দিনের রোযা/৩১১
আশুরার রোযা/৩১১
শা'বানের রোযা/৩১১
আইয়ামে বীয-এর রোযা/৩১১
সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা/৩১২
নফল দান ও সদকাতেও অনেক নেকী/৩১৩
ওমরা আদায়েও অনেক নেকী আছে/৩১৪
আমলে সালেহএর আরো কতিপয় উদাহরণ/৩১৫
ইলমে দীন হাসিলে সময় দান/৩১৫
কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন শিখা ও অপরকে শেখানো/৩১৭
পবিত্র অবস্থায় থাকা/৩১৯
যিকর, দোয়া, তাসবীহ ও তাহলিল/৩২০
মুসলমান পরস্পর পরস্পরের হক আদায়েও নেকী/৩২১
আল্লাহর রাসূলের নামে দরূদ পড়া/৩২২
পিতা-মাতার খিদমত/৩২৩
জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ/৩২৩
একজন ঈমানদার সব কিছুতেই সওয়াব পেতে পারে/৩২৭
ঘুমেও সওয়াব জাগরণেও সওয়াব/৩২৭
খাওয়াও সওয়াব উপবাসও সওয়াব/৩২৮
আদরেও সওয়াব শাসনেও সওয়াব/৩২৮
দান করাতেও সওয়াব না করাতেও সওয়াব/৩২৯
গোপনে দানও সওয়াব প্রকাশ্যে দানও সওয়াব/৩২৯
ভালবাসায়ও সওয়াব ভাল না বাসাতেও সওয়াব/৩২৯
স্ত্রীর সাথে ভালবাসাও সওয়াব/৩৩০
যে-কোন প্রাণীকে দয়া করলেও সওয়াব মিলে/৩৩০
পায়খানা-পেশাবেও সওয়াব আছে/৩৩১
সওয়াবের ভেতর সওয়াব/৩৩১
সব নেক আমলই গুরুত্বপূর্ণ/৩৩২
আখিরাতে নাযাতের ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/৩৩৪

www.pathagar.com

নিয়তের বিশুদ্ধতা সকল নেক আমলের জন্য অপরিহার্য/৩৩৪
আল্লাহর রহমত ছাড়া শুধু আমল দিয়ে নাযাত পাওয়া যাবে না/৩৩৫
হেদায়েতের উপর অবিচল থাকার জন্য দোয়া করতে হবে/৩৩৬
শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে/৩৩৭
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুণাহ থেকে বিরত রাখা/৩৪১
প্রবৃত্তিকে দমন করে সবসময় তাকওয়ামণ্ডিত জীবন-যাপন করতে হবে/৩৪৪
গোনাহ হলেই তাওবা করতে হবে/৩৪৬
ভ্রান্ত মত ও পথের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে/৩৪৮
রুহবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যবাদী দর্শন/৩৪৮
খারেজী সম্প্রদায়/৩৪৯
শিয়া সম্প্রদায়/৩৪৯
মুতাযিলা সম্প্রদায়/৩৪৯
বিদ'আত/৩৪৯
শেষ কথা/৩৫১
মানব সৃষ্টির ক্রম বিস্তার /৩৫৫
এক নজরে মুমিন ও কাফিরের পরিণতি/৩৫৬
কি কারণে একজন মানুষ জান্নাতে যাবে বা জাহান্নামে যাবে/৩৫৮
এক নজরে কতিপয় কবিরা গুনাহ ও আমলে সালেহ/৩৫৯
পাদটীকা/৩৬১
তথ্যপঞ্জী/৩৬৬

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবী মানুষের আসল ঠিকানা নয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব

পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ডারউইনের বিবর্তনবাদ[২] এক সময় আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুললেও বর্তমানে এ মতবাদের অসারতা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা ঠিক যে, পৃথিবীতে মানুষের আগে জিন জাতির অস্তিত্ব ছিল। তাই আল্লাহ্ যখন ফেরেশতাদের সামনে মানব সৃষ্টির পরিকল্পনার কথা বললেন তখন তারা জবাবে বলল, "হে আমাদের রব! আমরা তো আপনার তাসবীহ্ পাঠ করি, গুণকীর্তন করি। আপনি কি এমন জাতি সৃষ্টি করতে চান যারা পৃথিবীতে মারামারি করবে, ফিতনা-ফাসাদ করবে?" মূলত ফেরেশতাগণের এ কথার মাধ্যমে পূর্ববর্তী জাতির চরিত্র ফুটে উঠেছে। আর ফেরেশতাগণ এ কথা বলে আল্লাহর পরিকল্পনার বিরোধিতা করেননি; বরং আল্লাহর কাছে তাদের অভিজ্ঞতার কথাই শুধু তুলে ধরেছেন।

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ)-কে সারা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে মাটি নিয়ে পয়দা করেছেন।[৩] আর এ কারণেই মাটির রঙ ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের কারণে মানুষের রঙ ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। আর এজন্যই একই পরিবারে জন্ম নিয়েও একজন হয় উন্নত চরিত্রের, অন্যজন হয় নিকৃষ্ট চরিত্রের। একজন হয় কালো, আরেকজন হয় সুন্দর। একজন হয় মেধাবী, আরেকজন হয় বোকা।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ ফেরেশতাদের সামনে মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা পেশের সময় বলেছিলেন, দুনিয়াতে আমার খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। এ থেকে বুঝা গেল, মানুষের আবাসস্থল হবে দুনিয়া। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ্ প্রথমেই মানুষকে দুনিয়াতে না পাঠিয়ে জান্নাতে রাখলেন কেন?

কুরআন থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাতে থাকতে দেওয়ার পর বলে দিলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খেতে পারবে, কিন্তু ঐ গাছটির[৪] কাছেও যেতে পারবে না। কিন্তু শয়তান তাঁদেরকে ঐ গাছটি প্রসঙ্গে প্ররোচিত করে। ফলে তাঁরা জান্নাতে থাকতে পারলেন না। তাঁদের আবাসস্থল হল পৃথিবী।

শয়তান প্ররোচিত করবেই কারণ, আদম সৃষ্টির পূর্বে সে মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিল। কিন্তু আদম সৃষ্টির পর ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হয় আদমকে সেজদা করার জন্য। এ নির্দেশের আওতায় শয়তানও ছিল। সে ছিল আগুনের তৈরি, আর আদম মাটির তৈরি। এ নিয়ে তার মধ্যে

www.pathagar.com

অহংবোধ কাজ করল। যার কারণে সে সেজদা করল না। আর এ অপরাধে সে আল্লাহর লানতের শিকার হল এবং তখন থেকেই সে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন হয়ে গেল।

মানব সৃষ্টির সূচনাতে আদম (আ)-এর সাথে শয়তানের এ ঘটনা এ কারণেই সংঘটিত হয়েছে যে, মানুষ যেন মনে করে তাদের প্রথম আবাস ছিল বেহেশত। দুনিয়া তাদের আসল ঠিকানা নয়। মানুষ যদি দুনিয়াতে আল্লাহর হেদায়াতের অনুসরণ করে তাহলে আবার জান্নাত হবে তাদের স্থায়ী আবাস। আর যদি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে তাদের আবাস হবে জাহান্নাম।

এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা হল, মানুষ আল্লাহর খলীফা। মানুষ খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গেলে শয়তান বাধা দেবে। শয়তানের বাধা অতিক্রম করে যারা চলতে পারবে, তারাই হবে সফলকাম। আর শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে কখনও কোন ভুল হয়ে গেলে তওবা তথা আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হওয়াই হল একজন সত্যিকার মানুষের বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখতে পাই, মানব ইতিহাসের সূচনায় কৃতকর্মের জন্য আদম অনুতপ্ত হলেন আর শয়তান জিদ করে নিজের কর্মের পক্ষে সাফাই গাইল। এটাই হল শয়তান ও সত্যিকার মানুষের চারিত্রিক পার্থক্য।

মূলত ফেরেশতাগণ আল্লাহর সব নির্দেশই যথাযথভাবে পালন করে এবং শয়তান সব নির্দেশেরই বিরোধিতা করে। আর মানুষকে তাঁর নির্দেশ পালন বা অমান্য করার এখতিয়ার ও শক্তি দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যেসব মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে আল্লাহর মর্জিমত সব কাজ করবে, তারাই আল্লাহর খাঁটি বান্দা। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধানের বিরোধিতা করবে, তারা হল শয়তানের শিষ্য।

এখন একটি বিষয় ভাবা দরকার, আলমে আরওয়াহ তথা রূহের জগতে সব মানুষকে এক সাথে সৃষ্টি করলেও পৃথিবীতে এক সাথেই সকল মানুষ আসেনি। আল্লাহ আদম ও হাওয়া (আ)-এর মিলনের মাধ্যমে মানব বংশের বিস্তৃতির যে ধারা শুরু করেন তা আজও বিদ্যমান। কিয়ামত পর্যন্ত এ একই ধারায় মানব বংশ বিস্তার লাভ করবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এক সাথে দুনিয়াতে পাঠাতে পারতেন কিংবা একজন মানুষ মারা যাবার পর আসমান থেকে আরেকজন পাঠিয়ে তার শূন্যস্থান পূরণ করার মাধ্যমে মানব অস্তিত্ব ঠিক রাখতে পারতেন; কিন্তু আল্লাহ তা করেননি। আল্লাহ মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিজেই বলেন, "আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

www.pathagar.com

এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অতঃপর তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়।" (মুমিনূন ঃ ১৩)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, আমি মানুষকে পচা কর্দম থেকে তৈরি শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি এবং জিনকে এর আগে লু-এর আগুনের দ্বারা সৃজন করেছি। (হিজর ঃ ২৫-২৬)

আল্লাহ্ তাআলা মানব বংশ বিস্তারে এ প্রক্রিয়া অবলম্বনের কারণেই সন্তানের জন্য মাতা-পিতার আদর-সোহাগ এবং মানুষের মনে পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্ম না হয়ে মানুষ যদি সরাসরি আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতো, তাহলে কেউ নতুন আসার সাথে সাথে পৃথিবীতে অবস্থানকারীরা তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করাও অস্বাভাবিক ছিল না।

অপরদিকে নারী-পুরুষের মিলনের ফলে মানব সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, অস্তিত্বহীন থেকে আল্লাহ্ যেমনি তোমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তোমার মৃত্যুর পর তোমার মাটির শরীর মাটিতে মিশে গেলেও আল্লাহ তোমাকে আবার অস্তিত্ব দান করবেন এবং দুনিয়াতে যা কিছু করেছো তার হিসাব নিবেন। যদিও কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা হল, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। অথচ তারা যদি তাদের সৃষ্টি নিয়ে একটু চিন্তা করত তাহলে তারা এ ধরনের অসার ধারণা পোষণ করত না। কারণ, আল্লাহ্ যিনি প্রথমেই অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি আবার অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম।

পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে, যারা নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী বলে মনে করেন। অথচ তারা ভাবেন না তাদেরকে এ বুদ্ধি কে দিয়েছেন? কারণ পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষও আছে যারা পাগল। রাস্তায় চলতে যারা বকবক করে। আফসোসের বিষয় হল, আল্লাহ্ যাদের বুদ্ধি, বিবেক দিয়েছেন তাদের কেউ কেউ আল্লাহর দেওয়া বুদ্ধি আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের বিরুদ্ধে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করার কাজে ব্যয় করেন। অথচ আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার চেষ্টা করেন না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যে জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর বিরোধিতা করছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তো তার জ্ঞান লোপ করে দিতে পারেন। আল্লাহ্ তাকে বিরোধিতা করার শাস্তি স্বরূপ সাথে সাথে পাগল করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্ এভাবে দুনিয়াতে শাস্তি দেন না। তবে মাঝে মাঝে দু-একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেন মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

www.pathagar.com

আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান দিয়েছেন সে জ্ঞান দিয়ে মানুষ পৃথিবীতে যা আবিষ্কার করে তা নিয়েও যদি মানুষ গভীরভাবে ভাবতো তাহলে তার কাছে অনেক কিছু সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় থাকতো না। যেমন- কোন কোন মানুষের ধারণা, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কিভাবে মানুষের আমল পরিমাপ করবেন? মানুষ ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে দুনিয়াতে অনেক কিছুই যথাযথভাবে ধারণ করে। টেপ রেকর্ডের মাধ্যমে অনেক কথাই রেকর্ড করে। কম্পিউটারের ডিস্কে অনেক ফাইল সেভ করে রাখে। তাহলে আল্লাহ্ কি আসমান-জমিন, চাঁদ-সুরুজের মাধ্যমে ভিডিও, অডিও টেপ করে রাখতে পারেন না? ছোট একটি কম্পিউটারে কত হাজারো বিষয় সংরক্ষণ করে রাখা যায়। যেসব ফেরেশতা মানুষের আমল সংরক্ষণ করেন তারা কি বিশেষ কুদরতে এভাবে আমল সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন না?

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার এসব আবিষ্কার দিয়ে এটা প্রমাণ করা ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ এভাবে আখিরাতে আমল পরিমাপ করবেন। আল্লাহ্ আমল পরিমাপ করবেন আল্লাহ্র বিশেষ কুদরতে। তবে মানব বুদ্ধিপ্রসূত এসব আবিষ্কার থেকে এ কথার প্রমাণ মিলে যে, মানুষ যদি ক্ষুদ্র জ্ঞানে এসব আবিষ্কার করে অনেক কিছু সংরক্ষণ করতে পারে তাহলে আল্লাহ্ যিনি সব ক্ষমতার মালিক তাঁর কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। অবশ্যই তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

দুনিয়া মানুষের আসল ঠিকানা নয়

বর্তমানে আমরা যারা দুনিয়াতে আছি, অতীতে আমরা ছিলাম না। অতীতে যারা ছিল তারা বর্তমানে নেই। আবার যারা বর্তমানে আছি ভবিষ্যতে থাকবো না। দুনিয়াতে আমরা মুসাফিরের মত। একজন মুসাফির কোথাও গেলে সাথে বেশি কিছু নেয় না। চলাফেরার জন্য যতটুকু দরকার শুধু ততটুকুই নেয়। মানুষ দুনিয়াতে মুসাফিরের মত। এর অর্থ হল, দুনিয়াতে আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন মানুষ দুনিয়া থেকে শুধু ততটুকু ভোগ করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ লাভের জন্য চেষ্টা করবে না।

এ সম্পর্কে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন, দুনিয়াতে অপরিচিত বা মুসাফিরের মত হয়ে যাও।"

ইবনে উমর (রা) বলতেন, "সন্ধ্যাবেলা সকালের অপেক্ষা করো না। অসুস্থ শরীরের জন্য সুস্থ্ শরীর সংগ্রহ করে নাও, আর মৃত্যুর জন্য জীবিত অবস্থায় পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।" (বোখারী)

www.pathagar.com

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আমরা যখন যতটুকু সময় পাই, ততটুকু সময়েই আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করা দরকার। অনেক সুস্থ মানুষ হঠাৎ করে এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারেন না। চলাফেরা করতে পারেন না। এমনকি খাবার খেতেও অন্যের সহযোগিতা লাগে। হাসপাতাল বা ক্লিনিকেই অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়। এভাবে অনেক সুস্থ মানুষকে অসুস্থ হয়ে কষ্টের জীবন-যাপন করতে হয়। অনেকের দৃষ্টিশক্তি বা হাতে ধরার শক্তি হঠাৎ লোপ পায়। এমতাবস্থায় ইচ্ছা করলেও অনেক সময় মসজিদে যাওয়া, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা সম্ভব হয় না। তাই প্রত্যেকেরই সবসময় আল্লাহর হুকুম মেনে চলা উচিত। দুনিয়ার প্রতিটি মুহূর্তকে আখিরাতের লাভজনক কাজেই ব্যয় করা প্রয়োজন। কেননা কে কতদিন সুস্থ থাকবে কিংবা কে কখন অসুস্থ হয়ে পড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এটা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

এ কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনীমত মনে কর। তন্মধ্যে অন্যতম বিষয় হল জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে গনীমত মনে করা। কিন্তু অনেক সময় জীবনের চাকচিক্য আমাদেরকে আখিরাতের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে। অথচ আমাদের চোখের সামনে দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ি, সুরম্য প্রাসাদ, খাল-বিল, নদ-নদী, চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-নক্ষত্র যা কিছুই দেখি একদিন এসব ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলা সূরা আত-তাকভীরে মানুষকে সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এভাবে ঃ

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। যখন পর্বতমালা অপসারিত হয়ে যাবে। যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে। যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে। যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে। যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে। যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল। যখন আমলনামা খোলা হবে। যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে এবং যখন জান্নাত সন্নিকিটবর্তী হবে। তখন সকলেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে।" (তাকভীর ঃ ১-১৪)

অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেক মানুষ জানবে সে কি নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছে এবং সে তার চোখের সামনে আমলনামা দেখতে পাবে।

অনুরূপভাবে সূরা আল ইনফিতারে বলা হয়েছে, "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে। যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে। তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।" (ইনফিতার ঃ ১-৫)

www.pathagar.com

এখানে অগ্রে প্রেরণ-এর মর্ম বর্ণনায় এক তাফসীরে বলা হয়েছে, ব্যক্তি দুনিয়াতে যা নিজে করেছে। আর পশ্চাত বলতে যে কাজ সে করেনি, বরং ভিত্তি স্থাপন করেছে। এ কাজ যদি ভাল হয় যেমন মসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা বা সদকায়ে জারিয়ার যে-কোন কাজ, তাহলে সওয়াব পাবে। আর এ কাজ যদি খারাপ হয় যেমন সিনেমা হল স্থাপন বা যে-কোন ধরনের অপকর্মের সূত্রপাত করে যাওয়া, তাহলে তার খারাপ ফল পাবে।

এ থেকে বুঝা গেল আমরা দুনিয়াতে যা কিছুই করি তার প্রতিফল একদিন পেতে হবে। ভাল করলে ভাল প্রতিফল আর খারাপ কিছু করলে খারাপ প্রতিফল পেতে হবে। আর যে দুনিয়ার মোহে আমরা আল্লাহর কথা ভুলে যাই সে দুনিয়ার চাকচিক্য একদিন থাকবে না। আমরাও এ চাকচিক্যময় জগতে অনাদিকাল থাকবো না। আমাদেরকে যেতে হবে এ দুনিয়া ছেড়ে আরেক জগতে। সে জগতের নাম আখিরাত।

তাহলে বুঝা গেল, দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। বরং আখিরাত আমাদের আসল ঠিকানা। আখিরাতে কি হবে তা নির্ভর করছে দুনিয়ায় আমাদের কৃতকর্মের উপর। আমরা আমাদের মৃত্যুর পর সুখে থাকবো না দুঃখে থাকবো তা আমাদের আমলের উপরই নির্ভর করছে। আমরা যদি দুনিয়ায় সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে পারি তাহলে আখিরাতে সুখে থাকবো। আমাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। আর যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন এবং আমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে। আমরা যদি দুনিয়াতে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে নিজের মন মত চলি, কিংবা আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য কারো বিধান অনুযায়ী চলি, তাহলে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ দুনিয়াতে আমাদেরকে সৃষ্টি করার পর আমাদের ভোগের জন্য অনেক কিছু দিয়েছেন। নানা ধরনের ফল, নানা ধরনের মাছ, শাক-সবজি আরো কত কি? আল্লাহ এসব কিছু আমাদের জন্য দিয়েছেন সত্য, আমরা এসব কিছু আমাদের ইচ্ছামত উপভোগ করতে পারব না। আল্লাহর ইচ্ছামত দুনিয়ার সব কিছু উপভোগ করতে হবে। আমরা যদি নিজের ইচ্ছামত এসব কিছু ব্যবহার করি তাহলে আমাদের ও চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে কোন ফারাক থাকে না। তখন আমরা হয়ে যাব 'কাল আনআম' অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর মত। আর আমরা যদি এসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছামত ব্যবহার করি তাহলে আমরা হব 'খায়রা উম্মাহ' তথা শ্রেষ্ঠ জাতি।

www.pathagar.com

আমরা দুনিয়াতে যা করি তার হিসাব নেওয়া হবে। এর ভিত্তিতে আখিরাতে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। এ জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া হল আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ। একজন কৃষক তার ক্ষেতে যে ধরনের বীজ বুনে সে ধরনের ফসল পায়। যেমনিভাবে পাট ক্ষেতে চা হয় না, আম গাছে কাঁঠাল ধরে না। তেমনিভাবে খারাপ কিছু করে ভাল ফল আশা করা যায় না।

মানুষ যদি দুনিয়ার জীবনে ভাল কিছু করে তাহলে মৃত্যুর পর ভাল ফল পাবে। আর যদি খারাপ কিছু করে তাহলে খারাপ ফল পাবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হল, অনেক মানুষ দুনিয়ার জীবনের সুখ-শান্তির জন্য যেভাবে সময় ব্যয় করেন, সে তুলনায় আখিরাতের জন্য পুঁজি সঞ্চয় করেন না। তারা দুনিয়াতে শুধু আরো পেতে চান। একটা বাড়ি আছে আরেকটা বাড়ি চাই। একটা গাড়ি আছে আরেকটা গাড়ি চাই। তাদের প্রসঙ্গেই সূরা আত-তাকাসুরে বলা হয়েছে ঃ "সম্পদের আধিক্য (ও স্বার্থের প্রতিযোগিতা) তোমাদেরকে (জীবনের আসল লক্ষ্য থেকে) গাফেল করে রেখেছে, এমনকি (দেখতে দেখতে) একদিন তোমরা তোমাদের কবরের কাছে গিয়ে হাজির হবে।" (তাকাসুর ঃ ১-২)

এ আয়াতের তাফসীরে মাওলানা মওদূদী (র) লিখেছেন, "তাকাসুর শব্দের মূল কাসরাত।" এর তিনটি অর্থ হয়।

১. মানুষের বেশি বেশি প্রাচুর্য লাভ করার চেষ্টা করা।

২. প্রাচুর্য লাভ করার জন্য মানুষের পরস্পরের অগ্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা।

৩. লোকদের অন্যের তুলনায় বেশি প্রাচুর্য লাভ করার কথা নিয়ে পরস্পরের মোকাবিলায় বড়াই করে বেড়ানো।

কাজেই "আল হাকুমুত তাকাসুর-এর অর্থ দাঁড়ায় তাকাসুর বা প্রাচুর্য তোমাদেরকে তার নিজের মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে নিয়েছে, যার ফলে তার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা তোমাদেরকে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে।"[৬]

মূলত যে জীবন আখিরাতের সফলতার পরিবর্তে দুনিয়ার সফলতাকেন্দ্রিক পরিচালিত হবে, সে জীবনে দুনিয়া পূজা থাকাটাই স্বাভাবিক। দুনিয়া পূজারীর লক্ষ্য থাকে দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, শক্তি ও কর্তৃত্ব। আর আখিরাতের সফলতাকেন্দ্রিক যে জীবন পরিচালিত হয়, সে জীবনে দুনিয়ার সুখ মুখ্য থাকে না। আখিরাতের সুখই সকল কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক শক্তি থাকে। আখিরাতের সুখ লাভের জন্য দুনিয়ার সুখ ত্যাগ করতে

www.pathagar.com

সে দ্বিধা করে না। কারণ তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, দুনিয়ার সুখ ক্ষণস্থায়ী। আর আখিরাতের সুখই চিরস্থায়ী। তার কাছে আখিরাতের সুখ শান্তি দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। দুঃখের বিষয় হল, অধিকাংশ মানুষ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াকেই প্রাধান্য দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (আ'লা ঃ ১৬-১৭)

আল্লাহ্ আরো বলেন, "এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত।" (আল আনকাবুত ঃ ৬৪)

এখন আমাদের একটু ভাবা দরকার যে, ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য আমরা যত বেশি পেরেশান, সে তুলনায় চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তির জন্য আমাদের মাঝে পেরেশানী আছে কিনা? আমাদের প্রতিদিনের সময় হিসাব করা দরকার, কত ঘণ্টা দুনিয়া পাওয়ার জন্য ব্যয় করি আর কত ঘণ্টা আখিরাতের জন্য কাজে লাগাই।

মানুষের মধ্যে পার্থিব জীবনের প্রতি সহজাত আকর্ষণ বিদ্যমান। আল্লাহ্ এ আকর্ষণ মানুষের মন থেকে দূর করার জন্য ইরশাদ করেন, "তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন কোন এক বৃষ্টির অবস্থা, যদ্দ্বারা সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এর পর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। এর পর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছুই নয়।" (হাদীদ ঃ ২০)

আল্লাহ্ মানুষকে স্থায়ী কল্যাণের পথে জীবন ব্যয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, "ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম।" (কাহাফ ঃ ৪৬)

আল্লাহ্ তাআলার কাছে পার্থিব জীবনের কোন গুরুত্ব নেই। তাই দেখা যায়, অনেক কাফির-মুশরিকরা অঢেল সম্পদের মালিক। অথচ অনেক ঈমানদার দীন-হীন জীবন-যাপন করছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্র কাছে যদি দুনিয়ার মূল্য মাছির ডানার মতও হত তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এক ফোঁটা পানিও দিতেন না।

আফসোস, আল্লাহ্র কাছে যে দুনিয়ার কোন গুরুত্ব নেই, সেই দুনিয়ার সহায়-সম্পদ লাভের জন্য কত মারামারি, হানাহানি, খুনাখুনি, আত্মসাৎ, মিথ্যা,

www.pathagar.com

প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অনিয়ম, দুর্নীতি আরো কত কী! অথচ মৃত্যুর সাথে সাথেই দুনিয়ার সব স্বাদ, আহ্লাদ শেষ হয়ে যায়। আর যে আখিরাত স্থায়ী, সে আখিরাতের কথা আমরা বেমালুম ভুলে থাকি। অথচ আল্লাহ কুরআনে আমাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন, "হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং সে প্রতারক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর।" (ফাতির ঃ ৫-৬)

মানব জীবনে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব

একজন মানুষ যদি আখিরাতে বিশ্বাসী হয়, তবে তার গোটা জীবন-জিন্দেগীতে সে বিশ্বাসের প্রতিফলন থাকে। আর যিনি আখিরাতে বিশ্বাসী নন, কিংবা দুর্বল বিশ্বাসী তারও জীবন পরিচালিত হয় তার বিশ্বাসবোধের আলোকে। এ বিশ্বাসবোধ তার সকল কর্মের নিয়ন্ত্রক শক্তি। এ বিশ্বাসবোধই তার দুনিয়ার জীবনকে উন্নত কোন আদর্শের অনুসারী করে কিংবা আত্মপূজারী বানায়। এ বিশ্বাসবোধই তার আয়-উপার্জন, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ বিশ্বাসবোধের কারণেই হয়ত সে দুনিয়া প্রেমিক হয় কিংবা হয় আল্লাহ্ প্রেমিক। এ বিশ্বাসবোধের আলোকেই একজন ব্যক্তির জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়। যিনি আখিরাতে বিশ্বাসী তাঁর কাছে দুনিয়ার সফলতা চূড়ান্ত সফলতা নয়; 'আখিরাতের সফলতাই মূল। আর যে আখিরাতে বিশ্বাসী নয়, তাঁর কাছে দুনিয়ার সফলতাই মুখ্য। দুনিয়ার বস্তুগত সফলতাই তার কাছে সফলতার মানদণ্ড।

এ কথা ঠিক যে, মানুষের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি সহজাত আকর্ষণ বিদ্যমান। দুনিয়ার মাল-সম্পদ, ধন-দৌলত লাভের প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবে মনে উঁকি দেয়। মালকে মাল বলার কারণই হল, মালের প্রতি মানুষের মনের আকর্ষণ। আর মাল শব্দের শাব্দিক অর্থ হল মনের ঝোঁক বা আকর্ষণ। মালের প্রতি মনের এই যে আকর্ষণ তা প্রতিনিয়তই মানুষের মনে দোলা দেয়। তাই মাল লাভের জন্য অনেকে বৈধ-অবৈধ চিন্তা করে না। কিন্তু একটি বিশ্বাস মালের প্রতি এ লোভ, লালসার নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সে বিশ্বাসের নাম হল আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আখিরাতের সফলতাকেন্দ্রিক জীবন পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসী সে দুনিয়ার ধন-দৌলতকে ক্ষণস্থায়ী মনে করে। আর যে ব্যক্তির আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস নেই তার কাছে দুনিয়ার মাল-সম্পদই আকর্ষণীয়।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সূরা আল হুমাযাহ-তে ইরশাদ করেন, "(শোচনীয়) দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য, যে (সম্পদ ও ক্ষমতার দম্ভের কারণে অন্যকে) অপমান করে, পেছনে পেছনে তাদের বদনাম করে বেড়ায়। যে (কাঁড়ি কাঁড়ি) অর্থ জমা করে এবং (নিঃশেষিত হওয়ার আশঙ্কায়) তা গুনে গুনে রাখে। সে (নরাধম) মনে করে, তার গুনে রাখা অর্থ (বুঝি) তার কাছে (চিরদিন) স্থায়ী হবে। বরং নির্ঘাত তার জমানো অর্থ সম্পদ অল্পদিনের মধ্যেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী (এক গর্তের) অতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।" (আল হুমাযাহ ঃ ১-৪)

সাইয়েদ কুতুব তাঁর তাফসীরে অর্থ লোলুপতাকে মানব চরিত্রের একটা ঘৃণ্য ও নিকৃষ্টদিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এক ধরনের সংকীর্ণমনা ছোটলোক অনেক সমাজেই দেখা যায়, তারা কিছু অর্থ দান করতঃ এ দানকে পুঁজি করে নিজ প্রতিপত্তি জমাতে চেষ্টা করে। এ জন্য সে যত নিচে নামা সম্ভব এত নিচে নামে। তারা ভাবে সম্পদই হল জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পুঁজি। এর সামনে আর কোন মূল্যবান জিনিস নেই। মানবিক, সামাজিক কিংবা নৈতিক মূল্যবোধ সবই অর্থ সম্পদের সামনে হেয় ও গৌণ। তারা মনে করে অর্থের মালিক হতে পারলেই সকল মানুষের মান-মর্যাদা প্রদর্শন ও মূল্যবোধ বিনা নিক্লেশে তার করতলগত হবে। অর্থ সম্পদকে এই শ্রেণীর মানুষ সর্বশক্তিমান খোদা বলে মনে করে। কোন কিছুই সম্পদের অসাধ্য নয়। এমন কি অর্থ-সম্পদ দিয়ে মৃত্যুকেও ঠেকানো যায় এবং জীবনকে চিরস্থায়ী করা যায় বলে তারা মনে করে।[৭]

এ আয়াতের তাফসীরে মাওলানা মওদূদী (র) বলেন, অর্থ জমা করার এবং তা গুনে রেখে দেবার কাজে সে এত বেশি মশগুল যে, নিজের মৃত্যুর কথা তার মনে নেই। তার মনে কখনো এ চিন্তার উদয় হয় না যে, এক সময় তাকে এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।[৮]

দুনিয়াতে অনেক নিঃসন্তান মানুষকেও দেখা যায়, অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকার মালিক হবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তার সম্পদের অভাব নেই। তবু দুর্নীতি করছে, আত্মসাৎ করছে, অবৈধভাবে উপার্জন করছে। সে এ কথা ভাবে না, তার এ সম্পদ তাকে মরণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার এ সম্পদ দোযখের আগুন ভোগ করার কারণ হতে পারে। তার বিপরীতে আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ দুনিয়াতে অর্থনৈতিকভাবে কষ্ট করে চলে; তবু অনৈতিক কোন কাজ করে না। কারণ সে আখিরাতের সফলতা চায়। সে দুনিয়ার সফলতাকে জীবনের টার্গেটে পরিণত করে না। তাই সে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে ওজনে কম দেওয়া, ঠকানো, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি প্রভৃতি থেকে বিরত থাকে। আর যার কাছে আখিরাতের সফলতার কোন কনসেপ্টই নেই অথবা দুর্বল বিশ্বাসী, সে অর্থনৈতিক সফলতা লাভের জন্য অনৈতিক যে-কোন ধরনের কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

www.pathagar.com

এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, আখিরাতে বিশ্বাস একজন ব্যক্তির জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে। যে আখিরাতে বিশ্বাসী নয় তার জীবনধারা, আর যে আখিরাতে বিশ্বাসী তার জীবন ধারা এক নয়। জীবন শেষে মৃত্যু হবে, আর মৃত্যুর পর জীবনের সব কিছুর হিসাব দিতে হবে। এ বিশ্বাস একজন ব্যক্তির সমস্ত কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ আখিরাতে হিসেব দিতে হবে এ বিশ্বাস লালনকারী ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন কিছু বিনা হিসাবে করে না। সে কোন কিছু করার আগে হিসাব করে, আমার এ কাজ আখিরাতে আমার জন্য লাভজনক হবে না ক্ষতিকর হবে। যদি ক্ষতিকর হয় তাহলে সে তা ত্যাগ করবে, এতে দুনিয়ার বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে যতই লাভ থাকুক না কেন।

আমাদের সমাজে যত খুন-খারাবি হয় তার কারণ হল, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসহীনতা কিংবা দুর্বল বিশ্বাস। আখিরাতের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই তারা যে-কোন অপকর্ম করতে দ্বিধাবোধ করে না। কারণ তাদের জবাবদিহিতার ভয় নেই। আর দুর্বল বিশ্বাসীরা নিজেকে তার বিশ্বাসবোধের আলোকে পরিচালিত করতে পারে না। তাই তার বিশ্বাস তাকে অপকর্ম করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। সমাজে অনিয়ম, অপকর্ম আর দুর্নীতি প্রসারের কারণ হল, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসহীনতা বা দুর্বল বিশ্বাস। সমাজকে অনিয়ম মুক্ত করতে হলে মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করতে হবে। এ নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে আখিরাতে বিশ্বাস সবচেয়ে কার্যকর পন্থা।

সরাকারি বিধি বা পাহারাদার দিয়ে সমাজের অনিয়ম বা অপকর্ম সম্পুর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ হল, সমাজের পাহারাদারকে ফাঁকি দেওয়া যায়, সমাজের বিধি-বিধানের অপপ্রয়োগ করা যায়। মানুষের মধ্যে আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় থাকলে পাহারাদার ছাড়াই সবকিছু ঠিকমত চলে। পাহারাদার দুনিয়াতে কেউ থাকুক বা না থাকুক আল্লাহ্ সবকিছু দেখছেন। তিনি আখিরাতে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেবেন, এ বিশ্বাসই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট।

আজকের সমাজে যুলুম-নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের মধ্যে এ ধারণা যদি বিরাজ করত যে, আমি যদি যুলুম করি তার প্রতিশোধ একদিন নেওয়া হবে। এমনকি একটা গরু যদি আরেকটা গরুর প্রতি যুলুম করে তারও প্রতিকার হবে। এসব প্রাণীর পরস্পরের যুলমের প্রতিশোধ নেওয়ার পরই তাদেরকে মাটি করে দেওয়া হবে। আর কোন মানুষ যদি কারো প্রতি যুলুম করে, তার বিচার ছাড়া সে আখিরাতে মুক্তি পাবে না। মাযুলুম যদি তাকে ক্ষমা না করে, তাহলে আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। কোন মানুষ যদি এ ধরনের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয় তার পক্ষে কারো উপর যুলুম করা সম্ভব নয়। সে কখনও

www.pathagar.com

ভুলে কোন অন্যায় করে ফেললেও তার জন্য অনুতপ্ত হবে। আদালতে মাযলুমের ফরিয়াদের আগেই নিজে মাযলুমের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে।

আমরা দুনিয়াতেও দেখি, একজন ছাত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয় ভাল ফলাফলের জন্য। যদি পরীক্ষা না থাকতো তাহলে অনেক ছাত্র পড়াশুনা করত না। তেমনিভাবে আখিরাতে জবাব দিতে হবে, এ বিশ্বাস থাকার কারণেই একজন ঈমানদার রাতের আঁধারে না ঘুমিয়ে 'কিয়ামুল্লাইল' বা রাত্রি জাগরণ করে। চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, তাসবীহ-তাহলিল করে। আর যে আখিরাতে বিশ্বাসী নয় সে নাইট ক্লাবে রাত কাটায়। তার কাছে দুনিয়ার আমোদ-ফুর্তিই মূল। সে আখিরাতের জন্য কোন প্রস্তুতি নেওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোন কাজই ঠিকমত করে না। সে হয় অলস প্রকৃতির।

আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মানুষের কাছে দুনিয়া হল আখিরাতের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। একজন কৃষক যদি তার জমিতে কৃষি কাজ না করে, তবে তার জমিতে আগাছা জন্মাবে। তার পাশের জমিতে অনেক ফল হবে, অনেক ধান হবে; আর তার জমিতে কিছুই হবে না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে নেক আমল করবে না সে আখিরাতে কোন ফল পাবে না। একই ঘরে বা একই সমাজে বসবাস করে একজন নেককার ব্যক্তি আখিরাতে অনেক প্রতিফল পাবে, আর আরেকজন ব্যক্তি অলস কৃষকের মত কোন কিছুই পাবে না।

আমরা দুনিয়াতে আরো দেখি, অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে মারা যায়। যে সন্তান এ সম্পদ সঠিকভাবে কাজে লাগায় সে মুনাফা পায়, আর যে সন্তান সম্পদ সঠিকভাবে কাজে লাগায় না তার সম্পদ ঠিক থাকে না। তেমনিভাবে কেউ যদি দুনিয়ার প্রতি মুহূর্ত আখিরাতের মুনাফা অর্জনের কাজে লাগান, তিনি আখিরাতে অনেক প্রতিফল পাবেন। আর যে আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার মুনাফা অর্জনের কাজে সময় ব্যয় করে, সে দুনিয়ার জীবনের পর আখিরাতে কিছুই পাবে না। আখিরাতে প্রাপ্তির এ অনুভূতিই একজন মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খল বানায়। আর এ অনুভূতি না থাকার কারণেই আরেকজন হয়ে উঠে উশৃঙ্খল, লাগামহীন। একজনের সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয় ভাল কাজে, আর আরেকজনের এসব ব্যয় হয় পাপের কাজে।

আখিরাতে বিশ্বাসীর কাছে প্রেম, ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্যই। তার দুনিয়ার কাউকে ভালোবাসার পেছনে আল্লাহকে খুশি করাই টার্গেট থাকে। যার কারণে তার এ ভালোবাসা নির্মল ও পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সে কাউকে কিছু দেয় আল্লাহর জন্য। আর কিছু দিতে নিষেধও করে আল্লাহকে খুশি রাখার জন্য। এ ধরনের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসায় ব্যক্তি স্বার্থ থাকে না। এ ধরনের ভালোবাসা

www.pathagar.com

কাউকে অন্ধ বানায় না। কখনো যদি দেখা যায়, এ ভালোবাসার বন্ধন ত্যাগ করা আল্লাহকে খুশি করার জন্য জরুরি, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই সে তা ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি স্বামী-স্ত্রী দু'জনের পরস্পরের মহব্বত অন্ধ বানায় না। তারা একে অপরকে মহব্বত করতে গিয়ে আল্লাহর মহব্বত থেকে দূরে সরে যায় না। আল্লাহর মহব্বত পাবার জন্যই তারা একে অপরকে মহব্বত করে। আর দুর্বল বিশ্বাসীরা একে অপরকে মহব্বত করতে গিয়ে আল্লাহর মহব্বত থেকে নিজেদেরেকে বঞ্চিত করতেও দ্বিধা করে না।

আমাদের সমাজ পরিচালনা করেন সমাজপতিরা। নেতারা দেশ চালায়। কর্তাব্যক্তিরা প্রশাসন চালায়। পত্রিকায় অনেক সময় জনগণের গম আত্মসাৎ করার কারণে দায়িত্ববানদের গ্রেপ্তার হবার ঘটনা দেখা যায়। অনেক সময় দেশের স্বার্থ বিকিয়ে বিদেশের সাথে চুক্তি হয়। ঘুষ না দিলে অফিসের ফাইল এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যায় না। টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিলসহ সরকারি বিল ঘুষের বদৌলতে অনেক কমিয়ে আনা যায়। আবার ঘুষ না দিলে ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত থাকতে হয়। এর কারণ কি? এর কারণ হল আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসহীনতা বা দুর্বল বিশ্বাস। যদি আখিরাতের প্রতি মজবুত বিশ্বাস থাকে তাহলে সমাজপতিরা অন্যায়-অবিচার করবে না। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। কারো অধিকার নষ্ট করবে না। দেশের কর্তাব্যক্তিরা ইসলামের স্বার্থে, দেশের জনগণের স্বার্থে কাজ করবে। নিজের স্বার্থে, গদি রক্ষার স্বার্থে জনগণের আমানতের খেয়ানত করবে না। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। শত্রুর সাথে আচরণেও ইনসাফ বজায় রাখবে। আর যে আখিরাতে বিশ্বাসী নয় কিংবা দুর্বল বিশ্বাসী সে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যা খুশি তাই করবে। তার কাছে নিজের পরিবার পরিজনের সুখ বড় নয়; নিজের সুখ বড়। তার কাছে দেশের স্বার্থ বড় নয়; নিজের স্বার্থ বড়। সে হয় স্বার্থ পূজারী। সে হয় আত্মপূজারী। আত্মসুখ কিংবা আত্মপূজার অনলে জ্বলে জ্বলে সে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে শুধু সুখ চাইবে। এ সুখ যে তার জন্য অনন্ত দুঃখের কারণ সে কথা সে ভুলে যায়।

আমরা অনেক সময় দেখি, দুর্নীতির দায়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্তাব্যক্তিরাও অভিযুক্ত হন। অভিযুক্ত হবার পেছনে মৌলিক কারণ হল, তাঁর মজবুত বিশ্বাস নেই যে, তাঁকে তাঁর দায়িত্বের জন্য শুধু সরকারের কাছে নয়, বরং আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে।

মূলত যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে দায়িত্বহীন আচরণ করা তখনই সম্ভব হয় যখন তাঁর আখিরাতের প্রতি মজবুত বিশ্বাস না থাকে। মজবুত বিশ্বাস থাকলে তিনি ওমরের মত কাঁদবেন আর বলবেন, ফোরাত নদীর তীরে একটি

www.pathagar.com

কুকুর না খেয়ে মারা গেলে আমি উমরকে খলীফা হিসেবে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। এ জবাব দেওয়ার অনুভূতির কারণেই তিনি নিজের পিঠে আটার বস্তা নিয়ে প্রজার ঘরে পৌঁছিয়েছেন। এ অনুভূতির কারণেই খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয পারিবারিক কাজের সময় রাষ্ট্রের প্রদীপ নিভিয়ে রাখতেন। এ অনুভূতির কারণেই গরীব মেয়ে মায়ের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে দুধের সাথে পানি না মিশিয়ে মাকে বলেছে 'মা রাতের অন্ধকারে পানি মিশালে খলীফা না দেখলেও আল্লাহ দেখছেন'। আফসোসের বিষয় হল, বর্তমানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতির অভাবে বা দুর্বল বিশ্বাসের কারণেই প্রজার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করে নিজের ব্যাংক একাউন্টে জমা করেন। অনিয়ম, দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির চেষ্টা করেন।

মূলত আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ বিশ্বাসবোধের ছাপ থাকে। তিনি দুনিয়ার জীবনের কোন ক্ষেত্রে নৈতিক সীমা ছাড়িয়ে যান না। তিনি আনন্দ উল্লাস করেন, কিন্তু সে আনন্দ শালীনতা ছাড়িয়ে যায় না। তিনি দুঃখবোধ করেন, কিন্তু সে দুঃখে ভেঙে পড়েন না। তিনি এসব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করেন। আর দুর্বল বিশ্বাসী বা আখিরাতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি দুনিয়াতে আনন্দ করার জন্য নৈতিক কোন সীমারেখাতে বিশ্বাসী নয়। তার কাছে আনন্দ প্রকাশের কোন সীমারেখা নেই। আনন্দ উল্লাসের ক্ষেত্রে নৈতিক সীমারেখার সে ঘোর বিরোধী। এ কারণে তার কাছে নৃত্য অবৈধ নয়। সে সব সময় গান-বাদ্য, মদের আসরে আনন্দ-ফুর্তি করে সময় কাটায়। আর যিনি আখিরাতে বিশ্বাসী তাঁর কাছে দুনিয়ার আনন্দ আসল আনন্দ নয়। তাঁর কাছে আখিরাতের আনন্দই স্থায়ী আনন্দ। তাই তিনি নৈতিক সীমারেখার ভেতরে আনন্দ উল্লাস করেন। আর তিনি দুনিয়ার যে-কোন কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস হল, দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানার মত আর কাফিরের জন্য আনন্দ মেলা। তাই কাফির মুশরিকদের দুনিয়ার জৌলুস দেখে তিনি বিভ্রান্তও হন না।

আখিরাতের বিশ্বাস সমাজ জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। যিনি আখিরাতে বিশ্বাসী, তিনি একজন অভাবগ্রস্ত বা সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে দেখে চোখ বুজে থাকেন না। তিনি স্মরণ করেন, আল্লাহর বাণী, "কেউ কাউকে কর্জে হাসানা দিলে আল্লাহ তাকে অনেকগুণ পুরস্কার দিবেন।" তাঁর চোখের সামনে ভাসে আল্লাহর রাসূলের হাদীস, 'কেউ যদি দুনিয়াতে কারো সমস্যা লাঘব করেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুসীবত লাঘব করবেন'। যারা আখিরাতে বিশ্বাসী নয় তারা অনেক সময় অপরের সমস্যা দেখে নীরবে চলে যায়। কারণ তার কাছে অপরের দুঃখের কোন গুরুত্ব নেই। সেতো আত্মসুখে, আত্মচিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। অপরের সুখ, অপরের দুঃখ নিয়ে চিন্তা করার তার কোন ফুরসত নেই।

www.pathagar.com

এ ধরনের মানুষ কখনও যদি অপরের সাহায্য করে তখন তার পেছনে কাজ করে শুধু মানবতাবোধ। আর যিনি আখিরাতে বিশ্বাসী তাঁর মাঝে মানবতাবোধ-এর পাশাপাশি আখিরাতে পুরস্কারের আশা থাকে। তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে যান। তিনি মানুষের উপকার করতে চান। তাঁর দ্বারা কারো যেন ক্ষতি না হয় এ জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন। তিনি কাউকে আঘাত করেন না। তাঁর আচরণে কেউ কষ্ট পায় কিনা এ চিন্তায় তিনি সবসময় সতর্ক আচরণ করেন। এমন কি কথার মাধ্যমেও কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁর কাছে পরিষ্কার, কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে আঘাত করলে আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে। বর্তমানে কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া তো মামুলি ব্যাপার, শারীরিকভাব আঘাত করতেও মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে বস্তাবন্দি করে মেরে ফেলতে ইতস্ততবোধ করে না। কখনও কখনও পত্রিকায় খবর বের হয়, একজন আরেকজনকে গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে জ্বালিয়ে মেরে ফেলছে আর উল্লাস প্রকাশ করছে। এর কারণ হল, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা সম্পর্কে দুর্বল বিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতা। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি যদি থাকে তাহলে কোন মানুষ অপর মানুষকে এমনকি অন্যান্য প্রাণীকে পর্যন্ত কষ্ট দিতে পারে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষাক্ত ও ক্ষতিকর কিছু প্রাণী ছাড়া আর কোন প্রাণীকে অহেতুক মারতে নিষেধ করেছেন। চাষাবাদের গরু, উট, ভেড়াসহ এ ধরনের কোন প্রাণীকেও কষ্ট দেওয়া বা তাদের শক্তির অতিরিক্ত বোঝা দেওয়া বা পরিশ্রম করানো নিষেধ। অথচ আজকের সমাজে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে পর্যন্ত অহরহ কষ্ট দেওয়া হল।

মৃত্যু হল পরীক্ষা স্বরূপ

যিনি আখিরাতে বিশ্বাসী তিনি সারাজীবন মৃত্যুর পরর্বতী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে মৃত্যু হল আখিরাতের চূড়ান্ত পরীক্ষার সূচনা। আমরা দেখি, দুনিয়াতেও পরীক্ষার মাধ্যমে একজন ছাত্রের মেধার মূল্যায়ন হয়, পড়ালেখার মূল্যায়ন হয়। যারা পরীক্ষার পূর্ববর্তী সময়গুলো যথাযথভাবে কাজে লাগায়, তারা পরীক্ষায় ভাল করে। পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়ে তারা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন খুশি হয়। এমনকি অনেকের হাস্যোজ্জ্বল ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়। আর যারা পরীক্ষার পূর্ববর্তী সময়গুলো ভালভাবে কাজে লাগায় না, তারা পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করে। আর এ রেজাল্ট পেয়ে তার মন খারাপ হয়। সে কাউকে রেজাল্ট বলতে চায় না। তেমনিভাবে দুনিয়ার জীবন হল আখিরাতের পরীক্ষার প্রস্তুতি কেন্দ্র। যারা এ সময়গুলোতে আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলে তারা আখিরাতের পরীক্ষায় সফলতা লাভ করবে। তারা

www.pathagar.com

আখিরাতের প্রতিটি ধাপে হাসি-খুশি থাকবে। আর যারা দুনিয়ার এ জীবনে আল্লাহর নাফরমানী করবে তারা আখিরাতে অকৃতকার্য হবে। এর প্রতিদান পেয়ে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। যেমনিভাবে দুনিয়াতে একজন ভাল ফলের অধিকারী ছাত্র আর অকৃতকার্য ছাত্রের চেহারার মধ্যে আনন্দ বা বেদনার ছাপ দেখা যায়।

দুনিয়ার পরীক্ষার সাথে আল্লাহর পরীক্ষার পার্থক্য আছে। দুনিয়াতে পরীক্ষা দিতে গেলে পরে প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। তারপর উত্তর লিখতে হয়। আর আল্লাহর পরীক্ষার প্রশ্নমালা আল্লাহ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। কিভাবে প্রস্তুতি নিলে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে, তাও বাতলে দিয়েছেন। সে অনুযায়ী আমল করলে এসব প্রশ্নের উত্তর সহজেই দিতে পারবে। আর আমল না করলে এসব প্রশ্নের উত্তর যতই মুখস্থ করুক না কেন তা মুখে বলা সম্ভব হবে না।

আল্লাহ দুনিয়ার জীবন দিয়েছেন দুনিয়ার সব কিছু আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় ভোগ করার জন্য। আর একজন মানুষ আল্লাহর নির্দেশ মেনে এসব জিনিস কতটুকু ভোগ করেছে তা পরীক্ষা করার জন্য মৃত্যু দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা আল মুলকের শুরুতে ইরশাদ করেন, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ'।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করার কারণ হল মানুষকে পরীক্ষা করা। কেননা যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা স্মরণ রেখে দুনিয়ার কাজ করে তার দ্বারা কোন খারাপ কর্ম সংঘটিত হতে পারে না। অপর কোন মানুষের হক নষ্ট হতে পারে না। কোন মানুষ তার জবান বা হাত দ্বারা শারীরিক বা মানসিকভাবে আহত হতে পারে না।

মানুষকে দুনিয়াতে সৎ বানাবার জন্য মৃত্যুচিন্তা সর্বাধিক কার্যকর। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যু উপদেশের জন্য যথেষ্ট। হযরত হাসান (রা) বলেন, মালাকুল মাওত প্রত্যেকের ঘরে প্রতিদিন চক্কর দেয়। যখন কারো রিযিক শেষ হয়ে যায় তখন তার জান কবয করে। জান কবয করার পর তার নিকটজনদের কাঁদতে দেখে বলে, "আমার কোন দোষ নেই, আমি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, তার হায়াত শেষেই জান কবয করেছি। আর শুধু তার নয় তোমরা যারা বেঁচে আছো তোমাদের জান কবয করার জন্যও আমি বার বার আসবো।" মালাকুল মাওতের এ কথা যদি জীবিতরা শুনতে পেত তাহলে মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না না করে প্রত্যেকে নিজের মাওত নিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়তো এবং নিজের জন্যই কাঁদতো।[১০]

www.pathagar.com

মৃত্যু অবধারিত

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত। এমনকি যে আজরাঈল মানুষের জান কবয করে তারও একদিন মৃত্যু হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। মৃত্যু থেকে পালাবার কোন পথ নেই। যে যেখানেই থাকুক না কেন নির্দিষ্ট হায়াত শেষে তার মৃত্যু হবেই। আমাদের যে হাত আছে একদিন এ হাতের শক্তি থাকবে না। আমাদের যে চোখ আছে একদিন এ চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়বে। আমাদের যে কান আছে একদিন এ কান দিয়ে শোনা যাবে না। আমাদের যে পা আছে একদিন এ পা দিয়ে পথচলা যাবে না। আজ আমরা আমাদের হাতে কত জিনিস ধরি। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন আমরা নিজের শরীরও নিজে ধরতে পারব না। নিজে নিজের গোসল করতে পারব না। অন্য মানুষেরা গোসল দেবে। অন্য মানুষেরা কাফন পরাবে। অন্য মানুষেরা কবরে নিয়ে যাবে।

আমরা আজ ঘরে একলা থাকতে পারি না। একা একা ভয় পাই। কিন্তু কবরে একাই থাকতে হবে। আজকে আমরা আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন মিলে এক সাথে থাকি। মরণের পর কেউ আমাদের সাথে থাকবে না। আমাদের আমলই আমাদের সাথে থাকবে।

আমরা দুনিয়াতে অনেক কিছু দেখি। যা চোখে দেখি তা বাস্তব বলে মনে করি। এ কারণে আগুনে হাত দিই না। কারণ আগুনে দাহ্য শক্তি আছে। আমাদের চোখের সামনে অনেক বাড়ি-ঘরসহ বিভিন্ন জিনিস আগুনে পুড়ে যেতে দেখে আমাদের এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে। এ কারণে আমরা আগুনের তাপ গ্রহণ করলেও আগুন থেকে দূরে থাকি। তদ্রূপ আমরা আমাদের চোখের সামনে অনেককে মরতে দেখি। কেউ হঠাৎ মারা যায়। কেউ রোগে মারা যায়। কেউ বাস, ট্রেন, বিমান বা সমুদ্রে দুর্ঘটনায় মারা যায়। কেউ যুদ্ধের ময়দানে মারা যায়। এভাবে একেকজন একেকভাবে মারা যায়। আমরা এভাবে অনেকের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলেও মৃত্যুর জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করি না। অথচ মৃত্যুই হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা।

আমরা প্রতিনিয়তই অনেকের মৃত্যু সংবাদ শুনি। অনেকের জানাযা পড়ি। অনেককে কবরে রাখি। আমরা কি ভাবি অন্যের মত একদিন আমারও মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবে? অন্যদের মত একদিন আমারও জানাযা হবে? অন্যদের মত একদিন আমাকেও কবরে রাখা হবে? কিন্তু আমি জানি না কারা আমার জানাযা পড়বে। আমি জানি না কোথায় আমার কবর হবে। আমি জানি না কখন আমার মৃত্যু হবে। আমি শুধু নিশ্চিত জানি আমাকে একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি শুধু জানি, আল্লাহর নির্ধারিত হায়াত শেষেই আমার মৃত্যু হবে। যখন নির্দিষ্ট হায়াত শেষ হয়ে যাবে তার এক মুহূর্ত আগেও হবে না; পরেও হবে না। নির্ধারিত হায়াত শেষে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কার

www.pathagar.com

কখন হায়াত শেষ হবে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। অন্য কেউ বলতে পারবে না।

দুনিয়াতে আমরা দেখি, চাকরি থেকে অবসরের জন্য নির্দিষ্ট বয়স আছে। একজন চাকরিজীবী জানেন কবে তিনি অবসর গ্রহণ করছেন। কিন্তু দুনিয়ার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে কে কখন আখিরাতের জীবনে পদার্পণ করবে সে কথা কেউ বলতে পারবে না। এ না বলতে পারার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু হলে মানুষ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তওবা করে সুফী সাধক সেজে যেত। তাই আল্লাহ মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট সময় করে দেননি। অনেক সময় দেখা যায়, একশত বছরের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা দাদা-দাদী, নানা-নানী রোগ শয্যায় কাতরাচ্ছেন আর বিশ পঁচিশ বছরের সুঠামদেহী যুবক বা যুবতী নাতী কিংবা নাতনী হঠাৎ মারা যাচ্ছে। কখনও দেখা যায়, নতুন একজন শিশু জন্মগ্রহণ করার পর তার আত্মীয়-স্বজন সবাই খুশি। সবাই আনন্দে আত্মহারা। এ আনন্দঘন মুহূর্তে হঠাৎ শিশুটির মা মারা যায়। আবার কখনও দেখা যায়, যে শিশুটিকে অনেক কষ্ট করে পেটে ধারণ করল, সে শিশুটি মৃত জন্মগ্রহণ করছে। কিংবা জীবিত জন্মগ্রহণ করলেও জন্মের কিছুক্ষণ পর মারা যায়। এভাবে প্রতিনিয়তই আমরা মৃত্যুর খবর শুনি।

শুধু মানুষ নয় সকল প্রাণীই মারা যায়। আমরা গাছ-গাছালির দিকে তাকালেও দেখি, যে গাছ সজীবতা নিয়ে জন্মায়, সময়ের ব্যবধানে তার পাতা ঝরে পড়ে; গাছও মরে যায়। পাখ-পাখালি কিচির-মিচির তানে বন-বনানি মুখরিত করে রাখে। সময়ের ব্যবধানে তারাও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সকালের সূর্য কী দীপ্তি নিয়ে উদিত হয়। কিন্তু দিন শেষে দীপ্তি হারিয়ে আস্তে আস্তে অস্ত যায়। দিনের আলো রাতের আঁধারে হারিয়ে যায়। তেমনিভাবে যে শিশুটি নাদুস-নুদুস চেহারা নিয়ে জন্ম নেয়, সে শৈশব, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে একদিন বার্ধ্যক্যে পৌঁছে যায়। মুখের দাঁত পড়ে যায়। হঠাৎ একদিন ইথারে ভেসে আসে তার মৃত্যুসংবাদ। গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালির ন্যায় মানুষের মৃত্যুরও কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। সকল প্রাণীই মৃত্যুবরণ করে। তবে কোন্ প্রাণী কখন মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমরা শুধু এতটুকু জানি, আমাদের সকলকে একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "জীবন মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।" (আনকাবূত ঃ ৫৭)

মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে কোথাও পালাতে পারবে না। যেখানেই যাক না কেন নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু আসবেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, এমনকি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করলেও।" (নিসা ঃ ৭৮) তাই আমাদেরকে সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সকলকে মরতে হবে। মৃত্যুর পর যদি আর কোন জীবন না থাকতো তাহলে মৃত্যু নিয়ে কোন চিন্তার কারণ ছিল না। মৃত্যু যদি হত জীবনাবসানের নাম তাহলে অনেকেই আরাম বোধ করত। কারণ দুনিয়াতে যারা নানা কষ্টে জীবন কাটায় তাদের জন্য মৃত্যুর মাধ্যমে পরিত্রাণের পথ সুগম হত। দুনিয়াতে অনেকেই সবসময় নানা ব্যস্ততায় থাকেন। তাদের জন্য মৃত্যু হত "শান্তিময় অবসরের নাম।" কিন্তু মৃত্যু মানে দুনিয়ার জীবন থেকে আরেক জীবনে প্রত্যাবর্তন। এ কারণে মরণকে ইন্তিকালও বলা হয়। ইন্তিকাল মানে স্থানান্তর। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার জীবন থেকে পরপারের জীবনে পদার্পণ করে। একটি জীবন শেষে আরেকটি জীবনের সূচনা হয়। মানুষ এক জগৎ থেকে আরেক জগতে স্থানান্তরিত হয়। আর সে জগৎ হল স্থায়ী। সে জগতের সুখ বা দুঃখ দুনিয়ার মত সাময়িক নয়। সে জগতে অনেকেই অনন্ত সুখ বা অনন্ত দুঃখ ভোগ করবে। আর এ সুখ বা দুঃখ নির্ভর করছে দুনিয়ার জীবনের প্রস্তুতির উপর। একজন মুসাফির সফরের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি নেয় সেভাবে সফর করতে পারে। কেউ বাসের টিকেট করে বিমানে ভ্রমণ করতে পারে না। কেউ সাধারণ হোটেলের অর্থ দিয়ে এয়ারকন্ডিশন হোটেলে থাকতে পারে না। কেউ ডাল-ভাত ক্রয় করে গোশত-পোলাও খেতে পারে না। এভাবে যে-কোন কাজের জন্য একজন ব্যক্তি যে ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে সে ধরনের সুযোগ-সুবিধাই সে ভোগ করে।

মৃত্যুর পর আমরা কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা আল্লাহর কাছ থেকে পাব তা নির্ভর করছে দুনিয়ার জীবনের প্রস্তুতির উপর। আমরা যদি আখিরাতের জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করি তাহলে উত্তম সুযোগ-সুবিধা পাব। আমরা যদি আখিরাতের পরিবর্তে শুধু দুনিয়ার জীবনের সুযোগ-সুবিধার প্রতি মনোযোগী হই তাহলে দুনিয়ার জীবনের সুযোগ-সুবিধা হয়তবা পাব আখিরাতে আমাদের জন্য কিছুই থাকবে না। আখিরাতে অনুশোচনা করা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। কিন্তু সে অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। এ কারণে দুনিয়ার জীবনেই আখিরাতের জন্য সম্বল সঞ্চয় করা দরকার।

আমাদের সমাজে কাউকে বলতে শোনা যায়, বয়স এখনও কম আছে। আরেকটু বয়স বাড়ুক। তারপর ধর্মকর্ম করা যাবে। যারা এ কথা বলেন তারা কিন্তু জানেন না কার বয়স কত দিনের? কে কখন আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে কার ডাক কখন আসবে তা কারো জানা নেই, তাই সবসময় আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াই একজন বুদ্ধিমানের কাজ।

www.pathagar.com

আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার অর্থ হল সবসময় আল্লাহর প্রতি গভীর ঈমান রাখা। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ মুখে শুধু 'আমানতুবিল্লাহ' তথা আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, এ কথা উচ্চারণ নয়। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হল দুনিয়ার সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ছাপ থাকা। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি পূরণে নিজের কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দেওয়া। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হল তাঁর যাত ও সিফাতের সাথে আর কাউকে শরীক না করা। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি রিযিক দাতা, তিনিই আইন দাতা। তিনি লালনকারী, তিনিই সুখ-দুঃখে সাহায্যকারী। যার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি এ ধরনের নির্ভেজাল ঈমান আছে সে কখনও শির্‌ক করতে পারে না। তার আচরণে কুফরী বা নিফাকী থাকে না। তার আমল বিদআত এর ছোঁয়ামুক্ত থাকে।

যিনি মনে করেন, আমি যে কোন সময় আল্লাহর কাছে চলে যাব তিনি সবসময় বিনয়ের (খুশু ও খুযুর) সাথে নামায আদায় করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রতি ওয়াক্তের নামায পড়ার সময় মনে করেন, এটাই আমার জীবনের শেষ নামায হতে পারে। তাই তার নামাযে আল্লাহর ভয় থাকে। তিনি শুধু ফরয ইবাদত নয়, সাধ্যমত নফল ইবাদত বন্দেগী করার চেষ্টা করেন। সারাদিন কর্মব্যস্ততার মাঝে কাটাবার পরও গভীর রাতে আল্লাহর কাছে একান্তে মনের আকুতি পেশ করেন। দুচোখ থেকে পানি ফেলে আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাতের ফরিয়াদ জানান।

যার বিশ্বাস হল, আমার দুনিয়ার জীবন যে কোন সময় অবসান হতে পারে। আমাকে যে-কোন সময় আল্লাহর কাছে চলে যেতে হবে। তিনি সবসময় চেষ্টা করেন পবিত্র জীবন-যাপন করতে। তিনি আত্মাকে নফসের তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে সদা সচেষ্ট থাকেন। তিনি দুনিয়ার যে কোন কাজ থেকে আখিরাতের জন্য পুঁজি সঞ্চয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি দুনিয়ার সব কাজের মধ্যেও আখিরাতের সফলতার পথ খুঁজে বের করেন। তিনি খান কিন্তু তাঁর খাওয়া হয় আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী। তিনি ঘুমান কিন্তু উপুড় হয়ে ঘুমান না। তাঁর ঘুম হয় আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী। তিনি ব্যবসায় করেন সে ব্যবসায় হয় হালাল রুজি উপার্জনের জন্য। তিনি যদি বিচার-ফয়সালা করেন তাহলে সে বিচার-ফয়সালা হয় কুরআন-হাদীস অনুযায়ী। তিনি যদি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাহলে নিজের ইচ্ছামত কিংবা অন্য কোন মানুষের ভ্রান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন না। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায়ও অনুসরণ করতে চান আল্লাহর রাসূলের রাষ্ট্র দর্শন।

www.pathagar.com

যিনি মনে করেন, আমাকে যে-কোন মুহূর্তে পরপারে চলে যেতে হবে। তিনি দুনিয়ার জীবনে ভাল কিছু করার জন্যই ব্যস্ত থাকেন। আর ভাল কিছু করার জন্য ভাল লোক-এর সাহচর্যে সময় কাটান। তাঁর বন্ধু-বান্ধব হয় নেককার, পরহেযগার ব্যক্তিরা। তিনি মনে করেন, একটি গোলাপ থেকে গোলাপের সুঘ্রাণই বের হবে। আর ময়লার ডাস্টবিন থেকে দুর্গন্ধই ছড়াবে। যারা নেককার তাদের কাছে বসলে ভাল কথা শুনা যাবে। আর যারা খারাপ চরিত্রের তাদের কাছে খারাপ কথাই শুনা যাবে। তিনি খারাপ কারো কাছে যান তাকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তিনি মন্দ চরিত্রের কারো সাথে মিশেন তার কাছ থেকে মন্দ কথা শুনে পুলক অনুভব করার জন্য নয়; বরং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য।

যিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, যে-কোন মুহূর্তে আল্লাহর কাছ থেকে ডাক আসতে পারে, তাঁর হৃদয়ে সবসময় আল্লাহর স্মরণ থাকে। তিনি উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, কাজে-কর্মে আল্লাহকে স্মরণ রেখেই সব কিছু করেন। কোন কাজে আল্লাহর নাফরমানী হয় কিনা সর্বাগ্রে এ কথা বিবেচনা করেন। তাঁর জবানে যেমনি আল্লাহর যিকর থাকে তাঁর কর্মেও সে যিকরের বাস্তব প্রতিফলন থাকে।

যিনি মনে করেন যে-কোন সময় আমার মরণ আসতে পারে, তার বিশ্বাস মরণের পর আমার সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। তাই তিনি এমন কোন কাজ করেন না যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। শুধু নিজে নয়, তাঁর সামনে কাউকে কোন মুনকার বা খারাপ কাজ করতে দেখলে তিনি তাকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি মুনকার থেকে বারণ আর মারূফ বা ভাল কাজের আদেশ দানের মাধ্যমে নিজেকে ও নিজের পরিচিতদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য উদগ্রীব থাকেন।

যার মনে এ কথা বদ্ধমূল রয়েছে যে, আমার দুনিয়ার জীবনের কোন কিছুই আমার সাথে কবরে নেওয়া যাবে না। তিনি দুনিয়াতে শুধু ভোগ করতে চান না। দুনিয়াতে তিনি সম্পদের মোহ ত্যাগ করে অভাবীদের মাঝে তা বিলাতে চান। তাঁর সামনে কাউকে কষ্ট করতে দেখে তিনি গাড়ি নিয়ে নিজের বিলাস বহুল বাসায় চলে যান না। গাড়ি থামিয়ে দুঃখীজনের কথা শুনেন। অভাবীকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করেন।

এভাবে একজন মানুষ সবসময় আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সবসময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করে কাঁদেন। মাঝে মাঝে কবর যিয়ারতে ছুটে যান, মৃতদের কথা স্মরণ করে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য।

www.pathagar.com

যিনি আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করতে চান তিনি দুনিয়ার সকল কিছু থেকে উপদেশ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর সামনে বয়স্ক কাউকে চলতে দেখলে তিনি মনে মনে ভাবেন, এ বুড়ো লোকটি একদিন আমার মত যুবক ছিল। আজ তাঁর দাঁত নড়বড়ে। শক্ত কিছু খেতে পারেন না। আজ তাঁর হাতে শক্তি নেই। সামান্য কোন জিনিস ধরতেও কষ্ট হয়। আজ তিনি লাঠি বা অপরের উপর ভর করে হাঁটছেন। একদিন তিনিও দৌড়াতেন। তিনিও শক্ত জিনিস চিবাতেন। একদিন তিনিও নাদুস-নুদুস চেহারার অধিকারী ছিলেন। আজ তাঁর মাথা নোয়ানো। একদিন তিনিও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। আমি আজ হাঁটতে পারি, চলতে পারি। অনেক শক্তির অধিকারী। হয়তবা এমন একদিন আসবে যেদিন আমিও বুড়ো হয়ে যাব। আমার কালো চুল সাদা হবে। আমার চলাফেরার জন্য অপরের উপর নিভর করতে হবে।

যিনি আখিরাতের জন্য সবসময় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তিনি উপদেশ গ্রহণের জন্য মাঝেমধ্যে হাসপাতালে ছুটে যান। হাসপাতালে অনেক রোগীকে দেখেন। অনেকে কষ্টদায়ক মারাত্মক রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। অসুস্থ মানুষকে দেখে নিজের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। তাঁর কাছে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, আল্লাহ যে কাউকে যে-কোন সময় রোগ দিতে পারেন। তাই রোগে আক্রান্ত হবার আগে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করার চেষ্টা করেন।

যিনি আখিরাতের পথে যাত্রার জন্য সবসময় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তিনি প্রতিদিন নিজের আত্মসমালোচনা করেন। নিজে নিজের ক্রটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তাঁর ক্রটির জন্য আল্লাহর কাছে লজ্জিত হন, ক্ষমা চান এবং সে অন্যায় কাজটি না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তিনি নেক কাজ করার সুযোগ পেলে মনে মনে খুশি হন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। আর কখনও পাপ কাজে লিপ্ত হলে সাথে সাথে তওবা ইস্তিগফার করেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস রয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে আল্লাহর কাছ থেকে ডাক আসতে পারে।

নির্ধারিত হায়াত শেষেই সকলের মরণ হয়

আমরা দুনিয়াতে একেকজনকে একেক সময় মৃত্যুবরণ করতে দেখি। একেকজনের মরণ একেকভাবে হয়। যিনি যখন যেভাবেই মৃত্যুবরণ করুন না কেন তার নির্ধারিত হায়াত শেষেই তার মরণ হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে যখন কেউ অল্প বয়সে মারা যায় তখন অনেকেই বলেন, সে অকালে মারা গেল। আবার কেউ যদি দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জিহাদে গিয়ে মারা যান তখন কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন, আহা! সে যদি যুদ্ধে না যেত তাহলে মারা যেত

www.pathagar.com

না। কেউ যদি বাস, ট্রেন বা এমনতর কোন দুর্ঘটনায় মারা যান তাহলে মানুষ বলাবলি করে, সে যদি আজ বাড়ি থাকত তাহলে মারা যেত না। কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে মারা গেলে অনেক সময় বলতে শোনা যায়, তাকে যদি গ্রামের অমুক ডাক্তারের পরিবর্তে শহরের ভাল হাসপাতালে নেওয়া হত তাহলে হয়ত রোগ ধরতে পারত এবং এভাবে মারা যেত না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এভাবে মন্তব্য করা ঠিক নয়। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টির সাথে সাথেই তার তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে কতদিন বেঁচে থাকবে, কিভাবে মারা যাবে। সে কি রোগ শয্যায় মারা যাবে, না জিহাদে গিয়ে মারা যাবে, না দুর্ঘটনায় মারা যাবে। সবকিছু তার তকদীরে লিখা আছে।

কার কোথায় মরণ হবে? কখন মরণ হবে? তা আল্লাহ্ নির্ধারণ করে মালাক উল মউতকে জানিয়ে দেন। মালাক উল মওত এ আলোকে নির্ধারিত হায়াত শেষেই তার জান কবয করেন। কারো নির্ধারিত হায়াত শেষ হবার এক মুহূর্ত আগে বা নির্ধারিত হায়াত শেষ হবার এক মুহূর্ত পরে জান কবয করার এখতিয়ার মালাক উল মওত-এর নেই। তাই যার যখন মরণ হয় তার হায়াত শেষেই মরণ হয়। এ বিশ্বাস রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট সময়ের আগে যায় না এবং দেরিও করে না।" (হিজর ঃ ৫)

আর এ যাওয়া হয় আল্লাহর হুকুমে। এখানে কারো কোন হাত নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সে জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে।" (আলে ইমরান ঃ ১৪৫)

এ নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে যাবে তখন প্রত্যেককেই চলে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে তখন আর এক মুহূর্তও না পিছে যেতে পারবে, না এগিয়ে আসতে পারবে।" (আরাফ ঃ ৩৪)

এসব আয়াত এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, যারা দুর্ঘটনায় বা আগুনে পুড়ে কিংবা প্লাবনে বা অন্য কোন রোগে মারা যায় তারা সকলেই তাদের হায়াত শেষেই মারা যায়। আল্লাহ্ পাক মানুষের মরণের সময় নির্ধারণ করার সাথে সাথে 'কারণ'ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার মরণের যে কারণ তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে কারণেই সে মারা যায়। অন্য কোন কারণে তার মরণ হয় না।

এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ খুবই অসুস্থ। কোন ঔষধেই কাজ হল না। তারপর তার ডাক্তার পরিবর্তন করে নতুন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর রোগ ভাল হয়ে যায়। এর অর্থ এ নয় যে, ডাক্তারের ঔষধের কারণে তার রোগ ভাল হল। বরং রোগ

www.pathagar.com

ভাল হল আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য ঐ ধরনের ঔষধকে 'কারণ' হিসেবে তার তাকদীরে নির্ধারণ করে রাখার কারণে।

এখানে এক ধরনের বিভ্রান্তি থাকতে পারে যে, সবই যদি তাকদীরে লিখা থাকে তাহলে রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ সেবন করার দরকার কি? এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের সারাংশ উল্লেখযোগ্য। একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। সে সময় একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমরা কি ঔষুধ সেবন করব না? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন, তোমরা ঔষধ সেবন করবে। এ থেকে বুঝা যায়, ঔষধ সেবন করা হল সুন্নাত। তবে ঔষধ কাউকে ভাল করতে পারে না। ভাল হয় আল্লাহর ইচ্ছায়।

আরেকটি প্রশ্ন করা হয়, সবাই যদি নির্ধারিত হয়াত শেষে মারা যান তাহলে নেক আমলের কারণে মানুষের হায়াত বাড়ে এ হাদীসের ব্যাখ্যা কি? এ হাদীস প্রসঙ্গে দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ঃ

- নেক আমলের কারণে হায়াত বাড়ার অর্থ হল, যে ব্যক্তি নেক আমল করে সে ব্যক্তি তার হায়াতে যে নেক কাজ করে অন্যান্যের পক্ষে আরো অনেক বেশি হায়াত পেয়েও তত কাজ করা সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ পঞ্চাশ বছরে যত কাজ করতে পারেন অনেকে একশত বছর হায়াত পেয়েও তার অর্ধেক কাজ করতে পারেন না। নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা এভাবেই তার আমলে বরকত দান করেন।
- একজন মানুষের হায়াত সম্পর্কে আল্লাহ্ যখন ফেরেশতাকে অবহিত করেন, তখন বলেন তার হায়াত এতদিনের। কিন্তু সে যদি নেক আমল করে তাহলে এতদিনের হবে। ফেরেশতা কিন্তু জানে না সে নেক আমল করবে কি করবে না? কিন্তু আল্লাহর কাছে পরিষ্কার যে, সে নেক আমল করবে কিনা? তাই কুরআনে বর্ণিত নির্ধারিত হায়াত শেষে মরণ অর্থ হল আল্লাহর ইলমে যার যে হায়াত নির্দিষ্ট আছে তার মরণ সে নির্দিষ্ট সময়েই হবে। আর নেক আমল দ্বারা হায়াত বাড়ার হাদীসের অর্থ হল ফেরেশতাদের দৃষ্টিতে মনে হবে নেক আমলের কারণে হায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে। আসলে আল্লাহর কাছে তার এ হায়াতই নির্দিষ্ট ছিল।

এ আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, প্রত্যেকের নির্ধারিত হায়াত শেষেই মালাক উল মওত তার জান কবয করেন। আর এ জান কবয করার সাথে সাথেই তার আখিরাতের পথে যাত্রা শুরু হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মৃত্যু আখিরাতের পথে যাত্রার নাম

এখন চিন্তা করা দরকার মৃত্যু কি? মৃত্যু হল আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করার নাম। আর আত্মার এ স্থানান্তরের সাথে সাথেই শুরু হয় পরপারের যাত্রা। এর মধ্য দিয়েই দুনিয়ার মায়াবী জীবনের অবসান ঘটে। অবসান ঘটে ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজনের মায়ার বন্ধনের।

আখিরাতের পথে এ যাত্রা সুখকর হবে, না দুঃখের হবে তা নির্ভর করে দুনিয়ার জীবনের প্রস্তুতির উপর। দুনিয়ার জীবনে যদি আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করা হয় তাহলে পরপারের যাত্রার সূচনা হবে সুখকর। আর যদি দুনিয়ার জীবনে পুঁজি সঞ্চয় করা না হয় তাহলে পরপারের যাত্রা হবে কষ্টকর। পরপারের প্রতিটি ধাপে কষ্ট অনুভব করতে হবে। একজন মুসাফির তার ভ্রমণের প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে ঘর থেকে বের না হলে যেমনিভাবে তার কষ্টের শেষ থাকে না, তেমনিভাবে পরপারের পথিক যিনি হন তাঁর সাথে যদি আখিরাতের পুঁজি তথা নেক আমল না থাকে তাঁর কষ্টেরও অন্ত থাকে না। তবে দুনিয়ার মুসাফির আর আখিরাতের পথিকের মধ্যে পার্থক্য হল, একজন মুসাফির দুনিয়াতে অন্য কারো কাছ থেকে সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগ পায়, কিন্তু আখিরাতের পথিক যিনি হন, মৃত্যুর মাধ্যমে যাত্রা সূচনা করার সাথে সাথে আর কারো কাছ থেকে তার বেলায় সহযোগিতা নেওয়ার সুযোগ থাকে না। মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

মূলত মানুষের ইন্তিকালের সাথে সাথে তার আমলনামা ইল্লীন বা সিজ্জীনে চলে যায়।

আল্লাহ্ সূরা মুতাফ্ফিকীনে ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। আপনি জানেন সিজ্জীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের"। তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয়ই সৎ লোকদের আমলনামা আছে ইল্লীনে। আপনি জানেন ইল্লীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ এটা প্রত্যক্ষ করে।"

মৃত্যুর পর জান্নাতীদের আমলনামা ইল্লীনে নেওয়ার সময় ফেরেশতারা অত্যন্ত তাযীম ও তাকরীম করে নিয়ে যায়। তার জান কবয করে খুবই আসানীর সাথে। সে সময় তার কানে প্রতিধ্বনিত হয় কুরআনের আয়াত, "হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (ফাজর ঃ ২৭-৩০)

www.pathagar.com

আর নাফরমান বান্দাদের জান কবয করা হয় খুবই কষ্টের সাথে। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়, হে খবীস! আল্লাহর অসন্তুষ্টির দিকে বের হও। এতদশ্রবণে তারা রুগ্‌ণ শরীরে এদিক-সেদিক দৌড়াবে। বের হতে চাইবে না। ফেরেশতা খুবই কষ্ট দিয়ে রূহ বের করে নেবে।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, ইল্লীন হল উপরে।[১১] এটা সপ্তম আকাশে। যা খুবই খোলামেলা ও বিস্তৃত। সিজ্জীন-এর অবস্থান নিচে। এটা সাত স্তর জমিনের নিচে। আর সিজ্জীন শব্দটির মূল ধাতু হল সিজনুন। সিজনুন অর্থ- জেল। পাপীদের রূহকে জেলখানার মত কষ্টকর স্থানে রাখা হবে।

উল্লেখ্য, ইল্লীন বা সিজ্জীনে যাবার পর পূর্বে যারা মারা গেছেন তাদের সাথে দেখা হয়। যার রূহ ইল্লীনে যাবে তাকে ইল্লীনের অন্যান্য রূহ ঘিরে জিজ্ঞেস করে অমুক কেমন আছে? তখন কেউ বলে তাকে একটু আরাম করতে দাও। সে খুবই ক্লান্ত। একটু আরাম করার পর সবাই সবার পরিচিতজনদের সম্পর্কে জানতে চায়। পরিচিত জনদের কেউ মারা গিয়ে সিজ্জীনে গেলে তার সাথে ইল্লীনবাসীদের দেখা হয় না। তার সম্পর্কে যখন জানতে চায় তখন বলা হয় সেতো অনেক আগেই মারা গেছে। তোমাদের সাথে দেখা হয়নি। তখন ইল্লীনবাসীরা বুঝে নেয় তার আবাসস্থল হয়েছে সিজ্জীন।

আমরা দুনিয়াতেও দেখি, কেউ কোথাও গেলে পরিচিতজনরা বিভিন্ন জন সম্পর্কে তার কাছ থেকে জানতে চায়। ইল্লীনে বা সিজ্জীনেও ঠিক একই অবস্থা। মানুষ মারা যাবার পর পূর্ববর্তীদের সাথে তার দেখা হয়। তবে এ দেখার ক্ষেত্রে শর্ত হল, সবাই একই স্থানে থাকতে হবে। দুনিয়াতে যেমনি বাস আরোহীদের সাথে বিমান আরোহীদের দেখা হয় না, ফাইভ স্টার হোটেলবাসীদের সাথে কয়েদীদের দেখা হয় না, তেমনি ইল্লীনের অধিবাসীদের সাথে সিজ্জীনের অধিবাসীদেরও দেখা হবে না।

মানুষের মৃত্যুর পর পূর্ববর্তীদের দেখা-সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে হযরত হাসান (রা)-কে লক্ষ্য করে হোসাইন (রা)-এর উক্তি উল্লেখ করার মত। হযরত হাসান (রা) খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত হোসাইন (রা) তাঁর কাছে যান। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি বেশি চিন্তা করবেন না। আপনার দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হবার পর আপনার সাথে বাবা আলী, মা ফাতেমা, নানা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নানী খাদীজা (রা)-এর দেখা হবে। আপনি দেখতে পাবেন মামা কাসেম, তাইয়্যেব ও ইব্‌রাহীমকে। আপনি মিলিত হবেন খালা উম্মে কুলসুম, রুকাইয়্যা ও জয়নাবের সাথে। আপনি চাচা শহীদ হামজা ও জাফরকে দেখে খুশি হবেন। হযরত হোসাইন (রা) এর কাছে এ ধরনের কথা শুনার পর হযরত হাসানের চিন্তা দূর হয়ে যায়।

আমরা যারা বেঁচে আছি, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে দেখা হবে। আমরা মনে প্রাণে কামনা করি ইল্লীনেই যেন আমাদের দেখা হয়।

www.pathagar.com

কোন ধরনের মৃত্যু উত্তম

মানুষ নানাভাবে মৃত্যুবরণ করে। অনেক মানুষ দীর্ঘদিন রোগশয্যায় থাকেন। চলতে ফিরতে পারেন না। উঠতে-বসতে অন্যের সাহায্য লাগে। খাবার খেতে পারেন না। দীর্ঘদিন কষ্ট সহ্য করে জীবন-যাপন করতে হয়। তারপর মারা যান।

আবার কেউ হঠাৎ করে মারা যান। এমন অনেকের কথা জানি, যারা রাতে ঘুমের ভেতর মারা গেছেন। সকালে তাঁর রুমের দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ দেখে দরজা ভেঙে তাঁর রুমে ঢোকার পর দেখা যায় তিনি মৃত। আবার কেউ বন্ধু-বান্ধবসহ চা পান করছেন। হঠাৎ হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল। তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন। ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। কেউ দুর্ঘটনায় মারা যান। হয়তবা দেখা যাচ্ছে, বাসে বা ট্রেনে, জাহাজে কিংবা বিমানে বসে খোশ গল্প করছেন। হঠাৎ দুর্ঘটনা হল। মুহূর্তের মধ্যে সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। একটু আগে যাদের চেহারায় হাসি-খুশি ছিল মুহূর্তের মধ্যে তাদের কারো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। সবাই হয়ে যায় পরপারের যাত্রী। আবার অনেক সময় দেখা যায় ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডোতে অনেকেই মারা যান। আমি অনেকের লাশ বিশাল গাছের উপরেও ঝুলতে দেখেছি। আবার কেউ সুস্থ শরীরের অধিকারী। হঠাৎ ক্যান্সার বা অন্য কোন রোগ ধরা পড়ল। সবাই তার চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি আর সুস্থ হলেন না। আস্তে আস্তে শরীর ক্ষীণ হতে হতে একসময় দেখা যায়। তিনি মারা গেছেন। এভাবে আরো বিভিন্নভাবে মানুষের মৃত্যু হয়। এ বিভিন্ন ধরনের মৃত্যুর মধ্যে শাহাদাতের মৃত্যু সর্বোত্তম। তবে ইচ্ছা করলেই শহীদ হওয়া যায় না। শহীদ হয় আল্লাহর ইচ্ছায়। যার কারণে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেও শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেননি। আর কেউ এক জিহাদে অংশগ্রহণ করেও শহীদ হয়ে গেছেন। শাহাদাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা ভাল।

শাহাদাতের মৃত্যু ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মৃত্যু ভাল। যেমন ঃ

১. নেক কাজ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ। হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য রোযা রাখে আর এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর কেউ আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সদকা করল আর এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হল, সেও জান্নাতে প্রবেশ করল। (আহমদ)

২. গাজী বা ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ। কেউ দীনের পথে শহীদ হলে ভাল। আর কেউ যদি দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নিয়ে শাহাদাত বরণ করল না কিন্তু গাজী হল এবং পরবর্তীতে তার মৃত্যু হল সেও সৌভাগ্যের অধিকারী। "আর কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় মারা যান, তিনি তালবিয়া পাঠ করতে করতে কিয়ামতের দিন উঠবেন।" (মুসলিম)

www.pathagar.com

৩. জুমআর রাত বা জুমআর দিনে মৃত্যুবরণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিম যদি জুমআর রাত বা দিনে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তাকে কবরের ফিতনা থেকে রেহাই দেবেন। (তিরমিযী ও নাসাঈ)

৪. মহামারীতে মৃত্যু। মানুষ অনেক সময় মহামারী যেমন প্লেগ, পেটের পীড়া, যক্ষ্মা ইত্যাদিতে মারা যায় । এ ধরনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ খুশি হন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্লেগ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত। (বুখারী ও আহমদ)

হযরত রাশেদ ইবনে হুবাইশ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে সে শহীদ, প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে সে শহীদ, আর যক্ষ্মায় মারা গেলে সেও শহীদ। (আহমদ)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ। (মুসলিম)

৫. মহিলাদের সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যু। যেসব মহিলা সন্তান প্রসবকালীন বা নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তারাও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।

৬. জলোচ্ছাস, আগুনে বা ধ্বংসস্তূপে মারা যাওয়া। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহীদ পাঁচ প্রকার। যথা ঃ মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী, পেটের পীড়ায়, ডুবে ও ধ্বসংস্তূপে মৃত্যুবরণকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারী। (তিরমিযী ও মুসলিম)

তবে এ কথা ঠিক যে, মন্ত্রী এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদাভোগকারী ব্যক্তির মধ্যে যেমনি পার্থক্য আছে তেমনি হাকীকী শহীদ ও হুকমী শহীদের মধ্যেও কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের কারণেই যারা অল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ময়দানে মারা যান তাদের গোসল দিতে হয় না। আর অন্যদের গোসল দিতে হয়।

যে ধরনের মরণ থেকে পানাহ চাইতে হবে

পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাই আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়। অনেকেই আছে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না। আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার বানায়। আর কুফরী বা শিরকী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। যারা কুফরী বা শিরকী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের নাজাত মিলবে না। এ কারণে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, আল্লাহ যেন ঈমানের সাথে মওত দান করেন।

www.pathagar.com

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কেউ পাপ কাজে রত অবস্থায় মারা যায়। কয়েক বছর আগে তুরস্কে এক ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধারের সময় দেখা যায়, মৃত অনেকের হাতে মদের বোতল ছিল। নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশারত অবস্থায়ও কারো কারো মৃত্যু হয়। কেউ কেউ নৃত্যে মত্ত ছিল। এভাবে একেকজন একেকভাবে মারা যায়। পত্রিকায় এ ধরনের অনেক ঘটনা আছে। সেসব ঘটনা থেকে জানা যায়, অনেক মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এ ধরনের মৃত্যু খুবই খারাপ। তাই সবাইকে সবসময় আল্লাহর কাছে এ ধরনের মৃত্যু থেকে পানাহ্ চাইতে হবে।

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এমন অনেকেই আছেন, যারা নামায-রোযাসহ ইসলামের মৌলিক বিধানাবলি পালন করেন না। এমনকি কেউ কেউ ইসলামের হুকুম-আহকাম নিয়ে উপহাস করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। এ ধরনের বিষোদগারের মাধ্যমে মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও তারা মুরতাদ হয়ে যায় আর এ অবস্থায়ই মরণ হয়। এ ধরনের মৃত্যু থেকেও আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে হবে।

চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় মৃত্যু

জাহিলী যুগে মানুষের ধারণা ছিল চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয় কোন পুণ্যবান লোকের মৃত্যুর কারণে। মূলত এটা ভ্রান্ত ধারণা। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে ইব্রাহীম সূর্যগ্রহণের সময় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের সামনে খুৎবা দেন। খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কোন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মৃত্যুর কারণে হয়, এটা জাহিলী ধারণা। মূলত চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে এটা হয় না। তবে এটার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যখন কেউ চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন ভয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তাঁর কাছে দোয়া ও ইসতেগফার করবে। সদকা করবে ও নামায পড়বে।"

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে

মৃত্যুর পূর্বে আসমান থেকে ফেরেশতা এসে মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে এসে বসেন। নেককার ব্যক্তির জন্য সুন্দর চেহারার ফেরেশতারা জান্নাত থেকে কাফন এবং সুগন্ধি নিয়ে আসে। আর বদকার (পাপী) মানুষের জন্য কুৎসিত চেহারার ফেরেশতারা জাহান্নাম থেকে আগুনের কাফন ও দুর্গন্ধ নিয়ে আসে। অতঃপর জান কবযকারী ফেরেশতা এসে মৃত্যু পথযাত্রীর মাথার কাছে বসেন। তারপর জান কবয শুরু হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তের বর্ণনা কুরআনে এভাবে এসেছে, "কখনো না, যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে উপনীত হবে এবং বলা হবে ঝাড়ফুঁক করার কেউ আছে কি? মানুষ বুঝে নেবে এটা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময়। উভয় পায়ের গোছা বা নলা একত্র হয়ে যাবে। সেদিনটি হবে তোমার প্রভুর কাছে যাত্রা করার দিন।" (কিয়ামাহ ঃ ২৬-৩০)

এ আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেন, আয়াতে 'রাক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি 'রাকিয়াতুন' ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে এর অর্থ তাবীজ-কবচ এবং ঝাড়ফুঁক। আর 'রাকয়ুন' ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে এর অর্থ উপর দিকে উঠা। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তাহল শেষ মুহূর্তে যে সময় রোগীর সেবা-শুশ্রূষাকারীরা সবরকমের ঔষধ-পথ্য সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবে, আর কোন ঝাড়ফুঁককারীকে অন্তত খুঁজে আনলে এর জীবনটা রক্ষা করবে। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তাহল সে সময় ফেরেশতারা বলবে, কে এ রূহটা নিয়ে যাবে? অন্য কথায়, সে সময় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, ঐ ব্যক্তি আখিরাতের দিকে কি মর্যাদা নিয়ে যাত্রা শুরু করছে। সৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে যাবে আর অসৎ হলে রহমতের ফেরেশতারা তার ছায়াও মাড়াবে না। আযাবের ফেরেশতারাই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে।" (তাফহীম ঃ সূরা আল কিয়ামার তাফসীর)

এ থেকে বুঝা যায়, মৃত্যুর আগমুহূর্তেই আল্লাহ ফেরেশতাদের জানিয়ে দেন তাকে কারা বহন করবে? জান্নাতী হলে জান্নাতের ফেরেশতারা বহন করে আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামের ফেরেশতারা রূহ বহন করে।

আয়াতে বলা হয়েছে মৃত্যুর সময় উভয় পায়ের গোছা একত্র হয়ে যাবে। এর তাফসীরে অনেক মুফাসসির আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, মরার সময় পা শুকিয়ে একটি আরেকটির সাথে লেগে যাবে। আর কেউ কেউ প্রচলিত আরবী বাক্যরীতি অনুসারে শব্দটিকে কঠোরতা ও বিপদাপদ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সে সময় দুটি বিপদ একসাথে এসে হাজির হবে। একটি হল দুনিয়া এবং এর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ। আরেকটি হল একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তার হয়ে পরকালীন জগতে যাওয়ার বিপদ। যার মুখোমুখি হতে হবে প্রত্যেক কাফির, মুনাফিক এবং পাপীকে। (তাফহীমুল কুরআন)

অনেক সময় দেখা যায়, মৃত্যু পথযাত্রীর এক পা আরেক পায়ের সাথে লতাগুল্মের মত লেগে যায়। তারপর শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকে। আর নাক ডান দিক থেকে বাম দিকে বা বাম দিক থেকে ডান দিকে ঘুরায়। চোখ উপরের দিকে স্থির হয়ে যায়। এরপর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এভাবে একজন জীবন্ত মানুষ পরিণত হয় মরা লাশে।

www.pathagar.com

মৃত ব্যক্তি নেককার হলে তার চেহারায় ফুটে উঠে আনন্দ। তার শাহাদাত আঙুল উপরের দিকে উঠে আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাতের সাক্ষ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। জান্নাতের ফেরেশতাদের কাছ থেকে খোশ-খবর পেয়ে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আর আল্লাহর নাফরমানী করা অবস্থায় যাদের মৃত্যু হয়, তাদের মরণ খুবই কষ্টকর হয়। তাই তারা জান কবজের ফেরেশতাকে দেখার পর মুখ লুকাতে থাকে। তাদের মুখ খুব মলিন হয়ে যায়। মৃত্যুর পর চেহারায় বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে।

সাকরাতুল মাওত-এর সময় করণীয়

এ কথা ঠিক যে, যে যেভাবেই মৃত্যুবরণ করুক না কেন সবাইকে মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এটা সে জিনিস যা থেকে তুমি টালবাহানা করতে।" (কাফ ঃ ১৯)

এ থেকে বুঝা যায়, সকলকে মৃত্যুযন্ত্রণা উপলব্ধি করতে হবে। নবী-রাসূলগণও এ থেকে পরিত্রাণ পাননি। তবে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাদের মৃত্যুযন্ত্রণা আর নাফরমান বান্দাদের মৃত্যুযন্ত্রণা এক ধরনের হবে না। হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, শহীদদের মৃত্যুযন্ত্রণা কম অনুভূত হবে।

সত্যিই মৃত্যুর সময়ের কথা মনে উঠলে মন আঁতকে উঠে। কেননা আমি জানি না, আমার সাকরাতুল মাওত কেমন হবে। এটা যেন কম কষ্টকর হয় এজন্য সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। আর সবসময় মাওতের জন্য প্রস্তুতির কাজেই থাকতে হবে। কখনও কোন ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে ক্ষমা চাইতে হবে। তওবা করতে হবে। মনে রাখতে হবে মালাক উল মাওত জান কবয করার পূর্বক্ষণে তওবা কবুল করা হয় না। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার সাকরাত আসে।

সাকরাতুল মাওত এর সময় তার আশপাশে কুরআন তিলাওয়াত করা ভাল। হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির শেষ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাই মৃত্যুর সময় কালিমার তালকীন দেওয়া উত্তম। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যুর সময় কালিমার তালকীন দাও। তবে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, তার আশপাশে কালিমা পড়তে হবে। কিন্তু তাকে পড়ার জন্য বাধ্য করা ঠিক নয়। কারণ যদি সে পড়তে অস্বীকার করে তাহলে তার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করা হবে। সে সময় সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা

www.pathagar.com

মুস্তাহাব বলে ইবনে হাব্বান উল্লেখ করেছেন। কিতাব 'আল ফিকহ আলা মাযাহিব আল আরবা'আ গ্রন্থেও মুস্তাহাব বলে উল্লেখ আছে। তবে আল্লামা নাসির উদ্দীন আলবনী লিখেন, সূরা ইয়াসীনকে নির্দিষ্ট করে পাঠ সংক্রান্ত হাদীসটি সহীহ নয়।[১২] ইমাম মালেক ছাড়া আর সবার মতে, সাকরাত উল মাওত-এর সময় কুরআন পাঠ করা ভাল। এর মধ্যে কুরআনের অন্যান্য অংশের ন্যায় সূরা ইয়াসীনও পাঠ করা যায়।

আফসোসের কথা হল, আমাদের সমাজে অনেক মুসলমান আছেন যারা তার আপন মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর সময় তিলাওয়াত করার মত সূরা পর্যন্ত পড়তে পারেন না। তাই ভাড়া করে তিলাওয়াত করান। এ প্রক্রিয়ায় তেলাওয়াতের পরিবর্তে প্রত্যেক মুসলমানকে কুরআন সহীহ করে তিলাওয়াত শিক্ষা করা উচিত।

উল্লেখ্য, কোন অমুসলিমের মৃত্যুর সময় তার কাছে থাকাতে কোন দোষ নেই। সে সময়ও তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা যায়। হয়তবা সে ইসলাম কবুলও করতে পারে। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন ইয়াহুদী গোলাম ছিল। সে তাঁর খিদমত করত। সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে যান। অতঃপর তার মাথার কাছে বসেন। তারপর তাকে বলেন ইসলাম কবুল কর। গোলাম ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকালো। তার বাপও সেখানে ছিল। তার বাপ বলল, আবুল কাসেম! [রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যা বলে তার অনুসরণ কর। তারপর সে ইসলাম কবুল করে। এরপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ কথা বলতে বলতে বের হলেন সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি তাকে দোযখের আগুন থেকে নাজাত দিলেন। [(অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে এরপর ছেলেটির মৃত্যু হয়। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তার উপর জানাযার নামায পড়। (বুখারী, বায়হাকী ও হাকেম)]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কারো ভীষণ অসুস্থতার কথা শুনলে তাকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তি যদি অমুসলিমও হয়।

মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতা, দেনা পরিশোধ ও অসিয়ত

অনেকে মৃত্যুর আগে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এভাবে কেউ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া উচিত নয়। বরং আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং সবর করা উচিত। আর আল্লাহ সম্পর্কে কোন ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করাও ঠিক নয়। অনেকে ভীষণ অসুস্থতায় এমন অনেক

www.pathagar.com

কথা বলেন যা আল্লাহর শানে বলা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্ যা করেন মুমিনের ভালর জন্যই করেন। মুমিনের অসুস্থতার মাধ্যমে তার অনেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। সে সময় অনেকে নিরাশ হয়ে পড়েন। এ কথা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যিনি অসুস্থতা দেন, তিনিই সুস্থ করতে পারেন। তাই অসুস্থ হলেই নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। আবার অনেকেই কৃত অপরাধের জন্য খুব বেশি হতাশ হয়ে পড়েন। এ কথা ঠিক যে, নিজের কৃত অপরাধের জন্য বেশি বেশি তওবা ইসতিগফার করতে হবে। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে। আখিরাতের শাস্তির ভয় মনে জাগরূক রাখতে হবে। তার পাশাপাশি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী থাকতে হবে। আল্লাহ্ গাফুর, আল্লাহ্ রাহমান, আল্লাহ্ রাহীম। তিনি করুণার আধার। আল্লাহ্ যদি কারো প্রতি রহম করেন তাহলে তিনি তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। এ কারণে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হয়ে গুনাহ্ মাফ চাইতে হবে। গুনাহ্ যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"

কেউ কারো দেনা থাকলে তা পরিশোধ করে দেওয়া উচিত। সামর্থ্য না থাকলে তার কাছে মাফ চাইতে হবে। অবশ্য সামর্থ্য না থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেনা পরিশোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। দেনা পরিশোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীস থেকে জানা যায়, দেনা পরিশোধ করা ছাড়া মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মাফ না করেন, তাহলে তার নেক আমল থেকে তার দেনা পরিশোধ করা হবে। তার যদি নেক আমল না থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বদ আমল তার ঘাড়ে চাপানো হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কি জান মুফলিস কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন যার কাছে কোন সম্পদ বা দেরহাম নেই (অর্থাৎ টাকা পয়সা নেই) সেই মুফলিস বা গরীব। তারপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে মুফলিস যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত (সহ অনেক নেক আমল) নিয়ে আসবে। তারপর কেউ আসবে এবং বলবে সে আমাকে গালি দিয়েছে। কেউ বলবে সে আমার সম্পর্কে অপবাদ দিয়েছে। কেউ বলবে সে আমার মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে। কেউ বলবে সে অন্যায়ভাবে রক্তপাত করেছে। তারপর তার নেক আমল থেকে তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে বিচারের আগে তার নেক শেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহ্ তার জন্য নেওয়া হবে এবং তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

www.pathagar.com

এ কারণে কেউ কারো হক নষ্ট করলে মৃত্যুর আগে তার হক পূরণ করে দেওয়া উচিত। কারণ কারো হক নষ্ট করলে সে মাফ না করলে আল্লাহ্ মাফ করবেন না। তাই কেউ কারো প্রতি যুলুম করলে তার কাছে মাফ চাইতে হবে।

আমাদের সমাজে কাউকে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মৃত্যু কামনা করতে দেখা যায়, এটা ঠিক নয়। কোন রোগে-শোকে বা দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কামনা করা যাবে না। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। হযরত আব্বাস (রা)-কে মৃত্যু কামনা করতে দেখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, "হে চাচা! মৃত্যু কামনা করবেন না। যদি আপনি নেক আমল করে থাকেন তাহলে সময় পেলে আরো নেক আমল করতে পারবেন। আর যদি খারাপ আমল করে থাকেন তাহলে সময় পেলে খারাপ আমল ত্যাগ করার সুযোগ পাবেন। তাই মৃত্যু কামনা করবেন না।" হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত্যু কামনা না করে বরং এভাবে দোয়া করা যায়, "হে আল্লাহ যতদিন আমার হায়াত রাখাটা কল্যাণকর ততদিন হায়াত রাখ আর যখন আমার ওফাত কল্যাণকর সে সময় ওফাত দান কর।"

তবে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, শাহাদাত কামনা করা যায়। মনে রাখতে হবে সমস্যায় ভেঙে পড়ে মৃত্যু কামনা আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে শাহাদাতের তামান্না পোষণ এক কথা নয়।

উল্লেখ্য, মৃত্যুপথযাত্রীর যদি সম্পদ থাকে তাহলে এমন আত্মীয়-স্বজন যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পাবে না তাদের জন্য এবং সদকায়ে জারিয়ার কাজে অসিয়ত করা মুস্তাহাব। মীরাসের আয়াত নাযিল হবার আগে এটা ওয়াজিব ছিল। এ প্রসঙ্গে সূরা আল বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায় তবে তার জন্য অসিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হল, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরি।" নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন ও শুনেন। যদি কেউ অসিয়ত শুনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। (বাকারা ঃ ১৮০-১৮২)

উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত হল, মীরাসের আয়াত নাযিল হবার পর অসিয়ত সংক্রান্ত এ বিধানটি মানসূখ হয়ে যায়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের খুৎবায় ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের পক্ষে অসিয়ত করা জায়েয নয়। (তিরমিযী) তবে অন্যান্য

www.pathagar.com

ওয়ারিসগণ যদি অনুমতি দেয় তাহলে কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত করা বৈধ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনায় এসেছে, কোন ওয়ারিসের জন্য সে পর্যন্ত অসিয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত না অন্যান্য ওয়ারিসগণ অনুমতি দেয়। (আহকামুল কুরআন)

উল্লেখ্য, আলেমদের কারো কারো মতে, যেসব আত্মীয় মীরাস পান না তাদের জন্য অসিয়ত করা এখনও ওয়াজিব। তাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মীরাসের আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করা রহিত করে দিয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত ছিল। এছাড়া অন্য যে সব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি তাদের জন্য অসিয়ত করার হুকুম এখনও অবশিষ্ট আছে। (আহকামুল কুরআন, কুরতুবী)

এ প্রসঙ্গে মুফতী শফী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেন, আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হল যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি তাদের জন্য অসিয়ত করা জরুরি নয়। এখন প্রয়োজন বিশেষে এটা মুস্তাহাব।

অসিয়তের ক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, এক তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশি অসিয়ত করা যাবে না। কেউ যদি এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি অসিয়ত করে, তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের এখতিয়ার থাকবে, তারা ইচ্ছা করলে এক তৃতীয়াংশের বেশি কৃত অসিয়ত পূরণ করতে পারে অথবা যা এক তৃতীয়াংশের বাইরে তা পূরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইমরান ইবনে হাসীনের একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। এক ব্যক্তির ছয়জন দাস ছিল। এ ছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। সে মৃত্যুর আগে সব দাসকেই মুক্ত করে দেয়। এরপর তার আত্মীয়রা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে সে যা করেছে তা অবহিত করে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি এটা জানতাম তাহলে তার জানাযা পড়তাম না। এরপর তিনি লটারি করে ছয়জন দাস থেকে দু'জনকে মুক্ত করে দেন। আর বাকি চারজনকে উত্তরাধিকারীদের কাছে ফেরত দেন। (আহমদ ও মুসলিম)

হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, কোন পাপ কাজের অসিয়ত করলে তা পূরণ করা উত্তরাধিকারীদের উপর জরুরি নয়। যেমন কেউ কোন সিনেমা হল নির্মাণে বা দীনের বিরোধিতা করার জন্য কোন ক্ষেত্রে বা যে-কোন পাপ কাজে ব্যয় করার জন্য অসিয়ত করলে, তার অসিয়ত বাতিলযোগ্য।

ইমাম নববী (র) বলেন, "কারো যদি সন্দেহ থাকে তার মৃত্যুর পর তার জানাযা বা কবরে বিদয়াত হতে পারে তাহলে তার থেকে বিরত থাকার জন্য

www.pathagar.com

অসিয়ত করে যাওয়া মুস্তাহাব।" আমার মনে পড়ে আমার মায়ের কথা। তিনি মারা যাবার আগের রাতে বড় ভাইয়াদের বলে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে মসজিদের কাছে কবর দিতে এবং তার জানাযার খাট যেন এমন কেউ না ধরে যারা ধূমপান করে। এ কারণে আমাদের নিকটাত্মীয়দের কাউকে কাউকে বড় ভাইয়ারা মায়ের খাট ধরতে দেননি।

উল্লেখ্য, কাউকে অসিয়ত করার জন্য বাধ্য করা ঠিক নয়। আর কেউ যদি অসিয়ত করতে চায়, তাহলে দু'জন বিশ্বস্ত মানুষের সামনে অসিয়ত করা ভাল।

কারো মৃত্যুর পর জীবিতদের করণীয়

কেউ যখন মারা যায়, তার রূহ ইল্লীন বা সিজ্জীনে চলে যায়। তার রূহ চলে যাবার সময় চোখ তাকিয়ে থাকে। এভাবে দেহ থেকে রূহ চলে যাবার সাথে সাথেই আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ সর্বত্রই সংবাদ প্রচারিত হয়ে যায়। সবার মুখে মুখে অমুক মারা গেছে। এভাবে আমরা প্রতিনিয়তই দুনিয়াতে অনেকের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করি কিংবা মৃত্যু সংবাদ শুনি। যারা কারো মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে বা মৃত্যু সংবাদ শুনে তাদের কিছু করণীয় রয়েছে।

মৃত্যু নিশ্চিত হবার সাথে সাথেই বা মৃত্যু সংবাদ শুনে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়া প্রয়োজন। এর ভাবার্থ হল, আজ অমুক ব্যক্তি মারা গেছে, আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদেরকেও হে প্রভু তোমার কাছে ফিরে যেতে হবে। আমরা কেউ দুনিয়াতে চিরদিন বেঁচে থাকবো না।

মূলত যে-কোন বিপদ মসীবতের সময়ই এ দোয়া পড়া উত্তম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।" (বাকারা ঃ ১৫৬)

যে-কোন বিপদে পড়লে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাতি নিভে গেলে তিনি বললেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

জনৈক সাহাবী এতদশ্রবণে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতি নিভে যাওয়াও কি বিপদ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন। হ্যাঁ, যার দ্বারা মুমিনের কষ্ট হয় তাই বিপদ।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, অমুসলিম কারো মৃত্যুসংবাদ শুনলেও কি 'ইন্নালিল্লাহ' পড়া যাবে? এর জবাবে বলা যায়, বিপদ, মুসীবতে কিংবা মুসলিম কারো মৃত্যু সংবাদ শুনে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন' পড়ার বিষয়টি সহীহ

www.pathagar.com

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কোন অমুসলিম মারা যাবার পর এটা পড়ার যেমনি দলীল পাওয়া যায় না; তেমনি পড়তে নিষেধ করারও প্রমাণ মিলে না। তাই অমুসলিম কারো মৃত্যুসংবাদ শুনে এটা পড়া জরুরি নয়। আবার পড়লেও ক্ষতি নেই। কেননা এটার অর্থ হল, আমরা সবাই আল্লাহর জন্য আর আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। এটা মৃত কাফির-মুশরিকের জন্য দোয়া নয়। তাদের জন্য দোয়া করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ার অর্থ হল জীবিত ব্যক্তির অনুভূতিকে শাণিত করা। তার বিশ্বাসকে আরো পোক্ত করা যে, আজ অমুক মারা গেছে, এভাবে আমাকেও একদিন চলে যেতে হবে।

চোখ বুজে দেওয়া

হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সালামার মৃত্যুর পর তার কাছে আসেন। সে সময় তার দু'চোখ খোলা ছিল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বন্ধ করে দেন এবং বলেন যখন জান কবয করা হয় তখন চোখ সে দিকে তাকিয়ে থাকে এবং রূহ কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তা অনুসরণ করতে থাকে।

শরীর কাপড় দ্বারা ঢেকে দেওয়া

কেউ মৃত্যুবরণ করার পর তার সারা শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁকে একখানা চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। কিন্তু যারা ইহরাম অবস্থায় মারা যায় তাদের মাথা ও মুখ ঢাকা যাবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলাম এমতাবস্থায় একজন আরোহী তার বাহন থেকে পড়ে মারা যায়, রাসূলে করীম তাকে গোসল দিতে বলেন, তার কাপড় দিয়ে কাফন দিতে বলেন এবং মাথা ঢাকতে নিষেধ করেন। (অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, সুগন্ধি লাগাতেও নিষেধ করেছেন) ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় কিয়ামতের দিন উঠবে।

দ্রুত কবর দেওয়া

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা দ্রুত জানাযা কর। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তাকে তোমরা

www.pathagar.com

আটকে রেখো না। তাকে নিয়ে দ্রুত কবরের দিকে যাও। আর তার মাথার পাশে সূরা বাকারার প্রথম অংশ থেকে এবং পায়ের কাছে বসে শেষ অংশ তিলাওয়াত কর। (তিবরানী)

এ কারণে যারা যেখানে মারা যান তাদেরকে সেখানেই কবর দেওয়া উত্তম। অবশ্য কোন কোন আলেমের মতে, যারা যেখানে মারা যান তাদেরকে সেখানেই কবর দেওয়া প্রয়োজন। কেননা এক শহর থেকে আরেক শহরে স্থানান্তরের কারণে দ্রুত কবর দেওয়া সংক্রান্ত সহীহ্ হাদীসের খেলাফ (বিপরীত) কাজ করা হয়। এ কারণে অধিকাংশ আলেমের মতে, কেউ যদি অসিয়ত করে যায় তাকে অন্য কোন শহরে কবর দিতে, তার এ ধরনের অসিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমরা জানি, অনেক মানুষ দেশের বাইরে মারা যান। তাদেরকে দেশে ফিরে আনার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়। এ টাকা দিয়ে সদকায়ে জারিয়ার কোন কাজ করলে মৃত ব্যক্তির উপকার বেশি হবে। তবে আত্মীয়-স্বজন শেষ দেখার আগ্রহের কারণে দেশে ফিরে আনা নাজায়েয নয়। এ আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। কারণ যিনি মারা যান তার সাথে তার প্রিয়তমদের দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। তাই কবরে রাখার আগে এক নজর দেখার আগ্রহ সবারই থাকে। এ আগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করে মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য সদকায়ে জারিয়ার কোন প্রজেক্টে যদি সে অর্থ দান করা হয়, তাহলে অনেক সওয়াব হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ ধরনের অর্থ গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্য কোন ফান্ডে জমা দিলে তা দিয়ে অনেক গরিব মুমূর্ষু মানুষের চিকিৎসা সেবা করা সম্ভব। আমি মনে করি এতে মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণ বেশি হবে।

মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ

মৃত ব্যক্তি যদি কারো কাছে দেনা থাকে আর তার যদি সম্পদ থাকে তাহলে তার দেনা পরিশোধ করা ওয়ারিসগণের উপর কর্তব্য। তার যদি সম্পদ না থাকে তার পক্ষ থেকে কেউ আদায় করলেও হয়ে যাবে। যিনি এ ধরনের দেনা পরিশোধ করবেন তিনি এটার জন্য সওয়াব পাবেন।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো জানাযার নামায পড়ার আগে জিজ্ঞেস করতেন, তার কোন দেনা আছে কিনা? যদি দেনা থাকত তাহলে তিনি ওয়ারিসগণকে পরিশোধ করতে বলতেন। যদি মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ করার মত পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকতো, তাহলে তিনি দেনা পরিশোধের দায়িত্ব নিয়ে নিতেন।

www.pathagar.com

ধৈর্য ধারণ করা; বিলাপ না করা

বর্তমানে আমরা দেখি, কারো মৃত্যুর পর তার নিকটজনেরা বা ভক্তরা হাউ মাউ করে কাঁদে। আল্লাহর শানে নাশোকরীমূলক কথা বলে। এমনও বলতে শুনা যায়, আল্লাহ বুঝি আর কাউকে দেখেনি, আমার বাপ-মা বা ছেলে-সন্তানকে দেখেছে। অনেকে হট্টগোল করে। জামা ছিঁড়ে ফেলে। মুখে থাপ্পড় মারে। এভাবে চিৎকার করে কাঁদতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শোকে জামা ছিঁড়ে ফেলে, মুখে থাপ্পড় মারে এবং জাহিলিয়াতের মানুষের ন্যায় চিৎকার করে ও বিলাপ করে কাঁদে সে আমার উম্মত নয়। (তিরমিযী)

তবে চোখ থেকে যে পানি এমনিতেই ঝরে পড়ে, যার নিয়ন্ত্রণ কারো হাতে নেই; তা অবৈধ নয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে ইব্‌রাহীমের মৃত্যুর বিষাদময় মুহূর্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ দিয়ে অশ্রুর ফোঁটা ঝরতে লাগলো। সে সময় তিনি বেদনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, হে ইব্‌রাহীম! আমি তোমার শোকে শোকাহত। কিন্তু আমার মুখ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেকই কথা বেরুবে।

কারো মৃত্যুর সময় বুক চাপড়ানো বা হাউ মাউ করে কাঁদার চেয়ে ধৈর্য ধারণ করা ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করাই উত্তম। কেউ যদি হাউ মাউ করে কাঁদার পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ এটার পুরস্কার দিবেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তানের মৃত্যু হয় তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জান কবয করেছো? তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরোর জান কবয করেছো? তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ। তিনি আবার তাদেরকে প্রশ্ন করেন এ বিপদের সময় আমার বান্দা কি বলল? ফেরেশতারা জবাবে বলে এ বিপদের সময়ও সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তাদেরকে বলেন, আমার ঐ বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর। আর ঐ ঘরের নাম রাখ বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর)। (তিরমিযী)

শুধু মৃত্যু নয়, যে-কোন বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলার জ্বর আসার পর তাকে কাঁদতে দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? সে মহিলা জবাব দিলেন, আমার জ্বর এসেছে, আল্লাহ তাকে বুঝুক। তার কথা শুনার পর

www.pathagar.com

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জ্বরকে মন্দ বলো না। জ্বর মানুষের পাপরাশিকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দেয়, যেমন আগুন লোহার মরিচা দূর করে দেয়। (মুসলিম)

আত্মীয়-স্বজন বা সন্তানের মৃত্যুর পর শোকাহত হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত যাদের ছোট সন্তান মারা যায়, তারা বেশি শোকাহত হয়। এ সময় ধৈর্য ধারণ করা কঠিন হলেও তা অসম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ তালহা (রা)-এর স্ত্রীর ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবূ তালহা (রা)-এর ছেলে অসুস্থ ছিল। তিনি জরুরি কাজে ঘরের বাইরে গেলে ছেলে মারা যায়। আবূ তালহার স্ত্রী অন্যদের বলে রাখল আবূ তালহাকে যেন এ সংবাদ কেউ না বলে। আবূ তালহা সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, ছেলে কেমন আছে? স্ত্রী জবাব দিল, আগের চেয়ে শান্ত আছে। এ কথা বলে তিনি তার জন্য রাতের খাবার নিয়ে আসলেন। তিনি শান্তিমত খানা খেয়ে শুয়ে পড়লেন, ভোরে স্ত্রী তাঁকে হেকমতের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ যদি কাউকে কোন বস্তু ধার দিয়ে আবার ফেরত চায় তাহলে ঐ বস্তু আটকিয়ে রাখার কোন অধিকার কি কারো আছে? আবূ তালহা বললেন, না! ধার দেওয়া বস্তুতে মহাজনের হক প্রতিষ্ঠিত থাকে, তার এ হক কোনভাবে আটকিয়ে রাখা যাবে না। তখন স্ত্রী বলল, নিজের ছেলের উপর ধৈর্য ধারণ কর।

এ ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। কিভাবে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হয় এবং অপরের কাছে তা পেশ করতে হয়। আমার নিজের মায়ের মৃত্যুর পর আমার আব্বা বাড়ির সকলকে আমাদের রান্না ঘরে একত্রিত করে বললেন, আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? আমরা জবাব দিলাম আল্লাহ। তিনি আবার জানতে চাইলেন, কাউকে যদি আল্লাহ নিয়ে যায়, তাহলে আমাদের কি হাউ মাউ করে কাঁদা উচিত? আমরা এ কথা শুনার পর চুপ ছিলাম। সে সময় আমার বয়স ছিল আট বছর। আমার আম্মার তেমন অসুখ ছিল না। অসুখ ছিল আমার বড় বোনের। তাই আমরা ভেবেছিলাম বড় আপা মারা গেছেন। কে মারা গেছেন আব্বা এ কথা না বলে বড় ঘরে চলে গেলেন। আর আমি আমার এক ছোট ভাতিজাকে বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠার পর আমাকে ও আমার ভাতিজাকে কোলে করে বড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আব্বা ভাতিজাকে কোলে করে নেওয়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ইসমাঈল তোমার ঘোড়া চলে গেছে। আম্মা তাকে সবসময় কোলে রাখত বলে আব্বা আম্মাকে তার ঘোড়া বললেন। আমাকে বড় ভাইয়া কোলে করে নেওয়ার সময় তাঁর চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ল। আমি তখনও জানি না কে মারা গেছেন। যখন ঘরের মেঝে দেখি আমার মাকে কেবলামুখী করে শুইয়ে রাখা হল। বড় ভাইয়ারা মায়ের দু'পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত

www.pathagar.com

করছেন। তখন বুঝতে বাকি রইলো না আমার প্রিয় মা আর বেঁচে নেই। আমি ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হওয়ায় মা আমাকে খুব বেশি আদর করতেন। সাত-আট বছর বয়সী হওয়ার পরও মা কোলে রাখতেন। মায়ের মৃত্যুর পর দীনের জ্ঞান থাকার কারণেই আব্বা বা ভাইয়াদেরকে হাউ মাউ করে কাঁদতে দেখিনি। আজও মায়ের কথা মনে উঠলে মনের অজান্তেই চোখের পানি ঝরে পড়ে। মায়ের জন্য দোয়া করে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করি।

উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির চেহারা খোলা রাখা এবং তাকে চুমু দেওয়া বৈধ। তবে গায়রে মুহাররাম কেউ দেখা বা ধরা বৈধ নয়।

কারো মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা এবং তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কামনা করাও বৈধ। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবূ তালিব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ দেওয়ার জন্য মিম্বারে উঠেন। অতঃপর একের পর একজনের শাহাদাতের খবর দেন এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলেন।

মৃত মানুষ সম্পর্কে ভাল বা খারাপ মন্তব্য করা

কেউ মারা গেলে তার সম্পর্কে তার আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনেরা ভাল বা খারাপ যে মন্তব্য করে তা ফেরেশতারা রেকর্ড করেন। দুনিয়াতেও দেখা যায়, অনেক আসামী সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করতে গেলে এলাকাবাসী যখন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করে, তখন পুলিশ ভাল রিপোর্ট দেয় আর খারাপ মন্তব্য করলে খারাপ রিপোর্ট দেয়।

এক হাদীসে আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যখন কোন মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে বা মৃত মানুষের কাছে যাবে তখন তার সম্পর্কে ভাল কথাই বলবে। কেননা তোমরা যা বল ফেরেশতারা তা বিশ্বাস করে। (মুসলিম ও বায়হাকী)

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়ে একজনের লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে ভাল প্রশংসা করা হচ্ছিল তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওয়াজাবাত, ওয়াজাবাত, ওয়াজাবাত"। (অর্থাৎ তার সম্পর্কে যে সব ভাল কথা বলা হল তা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে)। আরেক জনের জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে লোকজন খারাপ মন্তব্য করছিল তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওয়াজাবাত, ওয়াজাবাত, ওয়াজাবাত" (অর্থাৎ তার সম্পর্কে যে সব খারাপ কথা বলা হল তা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে)।

www.pathagar.com

তারপর হযরত উমর (রা) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক (এটা আরবের এক ধরনের বাক্যরীতি) আপনি একজনের জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য শুনে বললেন, "ওয়াজাবাত, ওয়াজাবাত, ওয়াজাবাত" আবার আরেকজনের নিন্দাসূচক মন্তব্য শুনার পরও বললেন, "ওয়াজাবাত, ওয়াজাবাত, ওয়াজাবাত"এর কারণ কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা যখন মৃত কারো প্রশংসা কর, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যার নিন্দা কর তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়।

আরেক রেওয়ায়েতে এসেছে, এরপর রাসূলে করীম বলেন, ফেরেশতারা আসমানের সাক্ষী, তোমরা জমিনে একে অপরের জন্য সাক্ষী। তোমরা জমিনে একে অপরের জন্য সাক্ষী। তোমরা জমিনে একে অপরের জন্য সাক্ষী। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও নাসাঈ)

আরেক হাদীসে আছে, যখন কেউ মারা যায়, আর তার চারজন প্রতিবেশী তার সম্পর্কে ভাল কিছু ছাড়া খারাপ কিছু জানে না। তারা তার সম্পর্কে ভাল সাক্ষ্য দেয়। তখন আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের কথা কবুল করলাম। আরেক রেওয়ায়েতে এসেছে, আমি তোমাদের সাক্ষ্য কবুল করলাম এবং তোমরা যা জান না তা আমি মাফ করলাম।

আল্লামা নাসির উদ্দীন আলবানী লিখেন, এ হাদীসগুলো সাহাবাগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সাহাবাগণের পরবর্তীতেও যারা ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাদের জন্যও প্রযোজ্য।

উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোকে এ কথা মনে করার সুযোগ নেই যে, দুনিয়াতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার মত মৃত কারো সম্পর্কে না জেনে মিথ্যা সাক্ষ্য (তার প্রশংসাসূচক বা নিন্দাসূচক) দিলে তার লাভ বা ক্ষতি হবে। আল্লাহ ভাল করেই জানেন দুনিয়াতে কে কেমন ছিল। দুনিয়াতে নেক লোকদের সুনাম মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। আর যারা খারাপ লোক যেমন চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, হাইজ্যাকার, সন্ত্রাসী, মদ্যপ, যিনাকার তাদের খারাপ চরিত্রও মানুষের কাছে ফুটে ওঠে। তাই দেখা যায়, কেউ মারা গেলে মানুষের মুখ থেকে এমনিতেই বের হয়ে যায়, একজন ভাল মানুষ দুনিয়া থেকে চলে গেছে। তিনি অনেক সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। অনেক মানুষের উপকার করেছেন। আর কারো মৃত্যুর পর মানুষ বলে ওঠে, একজন দুষ্ট লোক মারা গেল। এবার যদি সমাজে চুরি-ডাকাতি একটু কমে।

প্রত্যেকেরই পরিচিত মানুষের কাছে তার ভাল বা মন্দ দিক কম-বেশি পরিষ্কার থাকে। এর ভিত্তিতে তার মৃত্যুর পর যে মন্তব্য আপনা আপনিই চলে আসে

www.pathagar.com

তাই আসল মন্তব্য। কোথাও কোথাও দেখা যায়, কেউ মারা গেলে জানাযার নামাযের আগে জিজ্ঞেস করা হয় অমুক কেমন ছিল? তিনি একজন ভাল লোক ছিলেন, তাই না? তখন উপস্থিত সবাই জবাব দেয় 'হ্যাঁ'। তিনি একজন ভাল লোক ছিলেন। এভাবে জিজ্ঞেস করা বিদআত। জানাযার নামাযে এমন অনেকেই শরীক হন যারা তাঁকে চিনে না। তাঁর সম্পর্কে জানেন না। তাঁরা না জেনে ভাল বলছেন মৃত মানুষের উপকার হবে ভেবে। অথচ এ ধরনের সাক্ষ্য দেওয়াতে মৃত মানুষের কোন লাভ হয় না।

মুসলমানদের কাউকে কাউকে মৃত মুসলিম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে শুনা যায়। এটা করা উচিত নয়।

হাদীসে আছে, মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল কথা বলা উত্তম। কারণ ফেরেশতারা তার সম্পর্কে কে কি বলে তা শুনে।

কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করলেও তা তার মৃত্যুর পর বলাবলি করা ঠিক নয়। এ ধরনের বলাবলি গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর গীবত (কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ আলোচনা করা) মস্ত বড় গোনাহ। এক হাদীসে আছে, "তোমরা মৃত ব্যক্তিদের শুধু গুণাবলি বর্ণনা কর এবং দোষ বর্ণনা থেকে বিরত থাক। কেননা সে তার কর্মফলের জায়গায় পৌঁছে গেছে।"

মাইয়েতের গোসল

মৃত ব্যক্তিকে যতদূর সম্ভব দ্রুত গোসল দেওয়া উত্তম। আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যে ব্যক্তি মাইয়েতকে গোসল দেবে সে অনেক সওয়াব পাবে। মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে একবার গোসল দেওয়া ফরযে কিফায়া। এমনকি কেউ পানিতে পড়ে মারা গেলেও তাকে গোসল দিতে হবে। অবশ্য যদি মৃত ব্যক্তি এত বেশি ফুলে যায় যে তাকে গোসল দেওয়ার জন্য নাড়াচাড়া করলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে শুধু গায়ে পানি ঢালতে হবে। যেসব ছোট বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়েই মৃত্যুবরণ করে বা মৃত ভূমিষ্ঠ হয়, তাদেরও গোসল দিতে হয়। গোসল দেওয়ার জন্য পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করানো যাবে। তবে তায়াম্মুম করানোর পর পানি পাওয়া গেলে আবার গোসল দিতে হবে।

ইমাম আবূ হানিফার মতে, তিনবার গোসল দেওয়া সুন্নাত। অন্যান্য ইমামগণের মতে, তিনবার দেওয়া মুস্তাহাব। প্রয়োজনে এর চেয়ে বেশিও গোসল দেওয়া যায়। কিন্তু বেজোড় সংখ্যক গোসল দেওয়া সুন্নাত। তবে যারা শহীদে হাকীকী তাদের গোসল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা শহীদদের রক্তাক্ত অবস্থায় দাফন কর এবং তাদের গোসল দিও না। (বুখারী)

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, শহীদে হাকীকী তাঁরা, যারা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের ময়দানে মারা যান। অবশ্য আহত হয়ে কিছু সময় বেঁচে থেকে পরে মারা গেলে তারাও শহীদ। তবে এ ধরনের শহীদের গোসল দিতে হবে। শুধু তাদেরই গোসল দিতে হয় না যারা জিহাদের ময়দানে শক্রর হামলার শিকার হয়ে সাথে সাথে মারা যান। কিয়ামতের দিন শহীদরা রক্তাক্ত অবস্থায় উঠবেন। আর তাদের রক্তের ফোঁটা থেকে মেশকের গন্ধ বের হবে। এ কারণে তাদের গোসল দিতে নেই।

আর যারা কাফির তাদেরকেও গোসল দিতে হয় না। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে, তারা পুরো জীবন আল্লাহর সাথে কুফরী করে অপবিত্র জীবন-যাপন করেছে। আল্লাহ দুনিয়াতে তাদের কুফরীর শাস্তি দেননি। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের সাথে একজন অপরাধী বন্দির মত শাস্তি শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ চান না একজন অপরাধী বান্দা আরেকজন অনুগত মুসলিম ব্যক্তির ন্যায় আল্লাহর মেহমান হিসেবে আল্লাহর কাছে সুন্দরভাবে সেজে যাক। আমরা দুনিয়াতেও দেখি কেউ কোন বাড়িতে বেড়াতে গেলে সুন্দরভাবে সেজে যায়। আর কোন চোর ডাকাতকে ধরার পর তাকে সাজ সজ্জার সুযোগ দেওয়া হয় না। পাকড়াও করে তাকে হেনস্তা করে নিয়ে যাওয়া হয়। আর শহীদদের গোসল দিতে হয় না; কারণ হল আল্লাহ চান, যেসব অপরাধী অন্যায়ভাবে কাউকে মেরেছে, হাশরের ময়দানে তারা মযলুম ব্যক্তিকে দেখুক কেমনরূপে তাকে রক্তাক্ত করা হয়েছিল। তারা প্রত্যক্ষ করুক কিভাবে তারা দীনের বিরোধিতা করেছিল আর একদল মানুষ দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছিল। কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। হাশরের ময়দানে একজন শহীদ যখন রক্তাক্ত অবস্থায় উঠবে তখন তাকে আঘাতকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যয়ন করে বলবে, আমার হাত দিয়ে আমি মারণাস্ত্র ছুঁড়েছি। পা বলবে তাকে মারার পর আমাকে তার বুকে লাথি দিতে ব্যবহার করা হয়েছে। অপরাধীর চোখ বলবে আমি এসব প্রত্যক্ষ করেছি। নিহত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে পানি পানি করে আর্তনাদ করছে এমতাবস্থায় তাকে পেশাব দেওয়া হয়েছে। করুণভাবে হত্যা করার বিবরণ এভাবে দেওয়া হবে। তখন অপরাধী বুঝতে পারবে, সে দুনিয়াতে আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে কত নির্মমভাবে মেরেছে। আল্লাহ আজকে তার জন্য শাস্তি দিয়ে ইনসাফই করছেন। দুনিয়াতেও দেখা যায়, কেউ কাউকে আঘাত করলে বা মেরে ফেললে আঘাতের নিদর্শনসহ সুরতহাল রিপোর্ট করার পর নিহত ব্যক্তিকে গোসল দিতে দেয়। সুরতহাল রিপোর্টের গুরুত্ব দুনিয়াতেও অনেক বেশি। শহীদদের সুরতহাল রিপোর্ট অপরাধীর সামনে পেশ করার জন্য তাদের গোসল দিতে হয় না। উল্লিখিত ব্যাখ্যা আমার ধারণা প্রসূত। প্রকৃত রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন।

মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার জন্য ইমাম আবূ হানিফার মতে শর্ত হল তার শরীরের অধিকাংশ অংশ পেতে হবে অথবা মাথাসহ অর্ধেক পেতে হবে।

www.pathagar.com

আর ইমাম মালেকের মতে এক তৃতীয়াংশ পাওয়া গেলেও গোসল দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে শরীরের কিছু অংশ পাওয়া গেলেই গোসল দিতে হবে। জানাবাতের গোসল অর্থাৎ নাপাকি থেকে পবিত্রতা হাসিলের জন্য যে পদ্ধতিতে গোসল করতে হয় মাইয়েতকেও ঠিক সে পদ্ধতিতে গোসল দিতে হবে। তবে মাইয়েতকে গোসল করানোর জন্য যে পানি নেওয়া হবে তাতে কপূর মিশানো উত্তম। বিশেষ প্রয়োজনে মাইয়েতের শরীরে সাবান, শ্যাম্পু মাখা জায়েয আছে।

মাইয়েতকে কিভাবে গোসল দিতে হবে এ সম্পর্কে উম্মে আতিয়া (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যাকে গোসল করাচ্ছিলাম, এমন সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, তাকে পানি এবং বরই পাতা দিয়ে তিনবার, পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশিবার গোসল করাও। শেষে তাকে কর্পূর দিয়ে ধৌত কর। যখন গোসল শেষ হল আমরা তাঁকে জানালে তিনি (স) কাপড় দিয়ে বললেন, তাকে কাপড় দ্বারা আবৃত কর। (বুখারী ও মুসলিম)

উম্মে আতিয়া (রা) আরো বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যার গোসলের সময় বললেন, তার ডান দিক থেকে এবং ওযুর স্থান থেকে গোসল করানো শুরু কর। (মুসলিম)

মৃতকে গোসল করানোর সময় খারাপ কোন কিছু দেখলে তা গোপন করার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর গোসল শেষে মাইয়েতের মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। কিন্তু কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তাকে সুগন্ধি লাগানো যাবে না।

মাইয়েতকে নেক বান্দার মাধ্যমে গোসল দেওয়া ভাল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আলী (রা) গোসল দিয়েছিলেন। মৃত ব্যক্তির বয়স যদি সাত বছরের চেয়ে বেশি হয় তাহলে পুরুষকে পুরুষ আর নারীকে নারী দ্বারা গোসল দিতে হবে। তবে স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবেন কিনা এ সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানিফার মতে, স্বামীর জন্য স্ত্রীকে গোসল দেওয়া বৈধ নয়। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন শেষ হয়ে যায়। তবে স্ত্রীর জন্য বৈধ। কেননা সে ইদ্দতের ভেতর থাকায় তার বিবাহের বন্ধন শেষ হয়ে যায়নি।[১৩] ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর মতে এটা বৈধ। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, স্ত্রীকে গোসল দেওয়ার জন্য তার স্বামীই হল সবচেয়ে বেশি হকদার। যারা বলেন এটা বৈধ নয় তাদের বক্তব্য হল স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ হচ্ছে একটি চুক্তি। আর এ চুক্তি জীবিত অবস্থায় হয় এবং জীবিত অবস্থায় টিকে থাকে। মৃত্যুর পর এ চুক্তি আর বহাল থাকে না।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হল কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যাবার পর পুরুষকে গোসল দেওয়ার জন্য কোন পুরুষ আর মহিলাকে গোসল দেওয়ার জন্য কোন মহিলা না থাকলে এমনকি তাদের কোন মুহাররামও যদি না থাকে সে অবস্থায় কিভাবে গোসল দেওয়া হবে? এর জবাবে ইমামগণ বলেন, তাকে গোসল দেওয়ার পরিবর্তে কোন একজন হাতে কাপড় নিয়ে মাটি দ্বারা হাত মুখ মাসহে করে দিবে। হাসান বসরী (র) বলেন, তার কাফনের কাপড়ের উপর পানির ছিটা দিতে হবে।

এখানে মাইয়েতের গোসল সংক্রান্ত ফিকহী মাসায়েল আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। ফিকহী মাসায়েল ফকীহ্গণ ফিকহ-এর কিতাবে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আমি শুধু উল্লেখ করতে চাই, আমাদের একটু ভাবা দরকার আজকে আমরা নিজের শরীর নিজে কি চমৎকারভাবে পরিষ্কার করি। সাবান, শ্যাম্পু লাগাই। আতর, সুরমা আরো কত প্রসাধনী শরীরে মাখি। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যেদিন আমি আমার নিজের গোসল নিজে করতে পারব না। আমার শরীর আমি পরিষ্কার করতে পারব না। আমি জানি না কে আমাকে গোসল দেবে। আমি জানি না কোথায় আমাকে গোসল দেওয়া হবে। আমি জানি না কেউ আমার গোসল দেওয়ার আদৌ সুযোগ পাবে কিনা

সেদিন আমার গোসল দেওয়ার জন্য যখন উঁচু কোন স্থানে রাখা হবে, আমার রূহ শুধু দেখবে কিভাবে আমাকে রাখা হল এবং গোসল দেওয়া হল। কিভাবে আমার গায়ে পানি ঢালা হল। কিভাবে আমার শরীর পরিষ্কার করা হল। কিভাবে আমার দাঁতে এক প্রস্থ কাপড় দিয়ে মাসহে করা হল।

আমাকে গোসল দেওয়ার সময় আমার রূহ বলবে আস্তে আস্তে গোসল দাও। কিন্তু তার এ কথা দুনিয়ার কেউ শুনবে না। সেদিন গোসল শেষে আমাকে কিভাবে কাফনের কাপড় পরিধান করানো হল তাও আমার রূহ দেখবে। কিন্তু তার পছন্দসই কাপড় আর পরিধান করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, কেউ মারা যাবার পর দাফনের আগে তার নিকটজনেরা কি করছে তার রূহ তা দেখে।[১৪] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, জান কবয করার পর রূহ ফেরেশতার কাছে থাকে এবং মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কে কি বলে ফেরেশতা তা শুনার জন্য রূহকে বলে শোন! তোমার সম্পর্কে কে কি বলছে? রূহ তা শুনে এবং দেখে কিভাবে গোসল দেওয়া হল কাফন পরিধান করানো হল এবং কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরেকটি বিষয় তুলে ধরা প্রয়োজন, আর তা হল, আমাদের সমাজে কোথাও কোথাও মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার স্থানে তিনরাত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। এটা সম্পূর্ণরূপে বিদআত।

www.pathagar.com

কাফন

আজ আমরা কত রঙ বেরঙয়ের পোষাক পরিধান করি। একটা পোষাক থাকতে আরেকটা পোশাক তৈরি করি। আমার জামা-কাপড় কেনার জন্য আমি নিজে মার্কেটে যাই। আমার পোশাক আমার পছন্দ অনুযায়ী ক্রয় করি। আমার প্রিয়ভাজন যারা তারা আমাকে অনেক সময় অনেক দামি কাপড় উপহার দেয়। কিন্তু আমি কি ভাবি, এমন একদিন আসবে যেদিন আমার পোশাক কেনার জন্য আমি মার্কেটে যেতে পারব না? যে দিন আমার পোশাক সেলাই ছাড়াই আমাকে পরিধান করানো হবে। আমি জানি না কে আমার জন্য পোশাক কিনতে যাবে। আমি জানি না কে আমাকে সেই পোশাক পরিধান করাবে। আমি জানি না আমি কি আদৌ কোন পোশাক পরিধান করতে পারব কিনা। কারণ আমার চোখের সামনে অনেকে দুর্ঘটনায় মারা যায়, যাদের লাশের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আজকে আমার অনেক কাপড় আছে। অনেক পোশাক আছে। সেদিন আমাকে শুধু তিন খণ্ড বা পাঁচ খণ্ড কাপড় পরিধান করানো হবে। হয়তবা আমার অর্থনৈতিক সামর্থ্য বিচার করে কাপড় দেওয়া হবে। কিন্তু সে কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় সাথে নিতে পারব না। লেপ, তোশক, মখমলের বিছানা, সুন্দর কার্পেট সবই ছেড়ে যেতে হবে। আমার সাথে রঙ বেরঙয়ের কোন পোশাক থাকবে না। যথাসম্ভব সাদা রঙয়ের কাফনের কাপড়ই দেওয়া হবে। কেননা, সাদা রঙয়ের কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া আল্লাহর রাসূল পছন্দ করেছেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাফন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি ইয়ামেনী সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এতে জামা ও পাগড়ি ছিল না। (বুখারী ও মুসলিম)

কাফনের কাপড় পুরুষের জন্য তিন খণ্ড ও মহিলার জন্য পাঁচ খণ্ড দেওয়া উত্তম। তবে অভাবগ্রস্তদের বেলায় কম দেওয়াতেও কোন দোষ নেই। অভাবী পুরুষের কাফন এক কাপড়ে আর মহিলার কাফন দুকাপড়েও দেওয়া যায়। পুরুষ মহিলা উভয়কেই কাফন দেওয়া ফরযে কিফায়াহ। তাদের সম্পদ থেকে কাফন দেওয়ার মত অর্থ না থাকলে যার উপর তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাকেই কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। সে অপারগ হলে মুসলমানদের উপর ফরয তাদের কাফনের ব্যবস্থা করা। কোন মুসলমানই যদি কাফনের ব্যবস্থা না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

কাফনের কাপড় যদি কম হয় আর মৃত মানুষের সংখ্যা যদি বেশি হয়, তাহলে এক কাপড়ে একাধিক মাইয়েতকে কাফন দেওয়া যাবে। হযরত আনাস (রা)

www.pathagar.com

বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন এক কাপড়ে দু-তিনজনকেও কাফন দেওয়া হয়েছে এবং এক কবরে দু-তিনজনকে রাখা হয়েছে। কাফনের কাপড় যদি পরিমাণে কম হয় তাহলে মাথার দিক থেকে দিতে হবে। উহুদের দিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামজা (রা)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন তাঁর কাফন এত ছোট যে মাথার দিক থেকে দিলে পায়ের দিক খালি থাকে আর পায়ের দিক থেকে দিলে মাথার দিক খালি থাকে। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাথার দিক থেকেই কাফন দাও। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) বলেন, হযরত হামজার জন্য তাঁর বোন সুফিয়া দুইটি কাফনের কাপড় এনেছিলেন। যখন দেখলেন হযরত হামজার পাশে আরেক আনসার শহীদেরও কাফনের কাপড় নেই। তখন একটি কাপড় তাঁকে দেওয়ার জন্য মনস্থ করেন। দুইটি কপড়ের মধ্যে একটি ছিল বড় আরেকটি ছিল ছোট। তখন লটারি করা হয়। লটারিতে যার ভাগে যে কাপড় পড়ল তাঁকে সেই কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়।[১৫]

উল্লেখ্য, শহীদরা যে কাপড় পরিধান করে শাহাদাতবরণ করেন তাঁদের শরীর থেকে সে কাপড় আলাদা করা ঠিক নয়। তাঁদেরকে রক্তাক্ত সেই কাপড়সহ কবর দিতে হয়। আর কাফনের কাপড়ে কিছু লিখা উচিত নয়। কোথাও কোথাও কাফনের কাপড়ে মৃত ব্যক্তিকে সালাম দিয়ে পরিবারের সদস্যদের নাম লিখে দেওয়া হয় এবং ধারণা করা হয় কবরে গিয়েও পরিবারের সদস্যদের নাম দেখবে। এটা বিদআত।

এখন একটু নিজের কাফনের কথা মনে মনে ভাবুন। মনের পর্দায় ভেসে উঠবে আপনার কাফন পরা মৃত লাশের দৃশ্য। আরেকটু ভাবুন, দুনিয়াতে আমরা নতুন পোশাক পরিধান করলে অনেককে দেখাই। অনেকেই মন্তব্য করেন, খুবই চমৎকার লাগছে! মৃত্যুর পর কাফনের কাপড় পরিধান করানোর পরও অনেকেই কাছে আসবে শেষবারের মত দেখার জন্য। কিন্তু আপনি বা আমি কারো কাছে যেতে পারব না। সেদিন কেউ বলবে না খুবই চমৎকার পোশাক! আপনাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। আজ নতুন পোশাক পরিধান করার পর অনেকেই কাছে এসে বসে। জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে কাপড় কিনেছেন? সেদিন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না। বেশিক্ষণ কেউ কাছে থাকবে না। এমনকি কাফন পরিধান করানোর পর সন্তান-সন্ততি, মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী, পরিবার-পরিজনও বেশি সময় কাছে থাকতে চাইবে না। বেশি সময় রাখলে শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হতে পারে তাই দ্রুত জানাযা দিয়ে দেবে। অবশ্য হাদীস অনুযায়ীও দ্রুত জানাযা ও কবর দেওয়া উত্তম।

www.pathagar.com

জানাযা

আজ আমাদের সাথে কতজনেই নামাযে যায়। কত পরিচিতজনকে দেখি নামায পড়তে। আমরা কতজনের জানাযা পড়ি, কিন্তু আমাদের জানাযা কে পড়বে আমরা জানি না। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর 'আহ্‌কাম আল জানায়েজ ওয়া বিদয়ুহা'[১৬] গ্রন্থে এ সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে নাবালেগ ছেলে ও শহীদদের জন্য জানাযার নামায পড়া ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছেলে ইব্‌রাহীম ও উহুদের শহীদদের নামায পড়েননি। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও শহীদদেরও জানাযার নামায পড়া উত্তম। কারণ অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ছোট ছেলেমেয়ের জানাযা নামায পড়েছেন এবং অনেক শহীদেরও নামাযে জানাযা আদায় করেছেন।

একজন মুসলমান একাকী কারো জানাযা পড়লেও সকলের পক্ষ থেকে জানাযা হয়ে যাবে। জানাযার নামায জামাতে পড়া সুন্নাত। তবে একাকী পড়লেও আদায় হয়ে যায়। সাধারণত নামাযের জন্য যেসব কিছু জরুরি, জানাযার বেলায়ও তা জরুরি। যেমন-পবিত্রতা, কেবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা; কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। যেমন-জানাযার নামাযে আযান, ইকামাত, রুকু, সেজদা, তাশাহহুদ, সহু সেজদাসহ অনেক কিছু নেই, যা সাধারণত নামাযে সম্পাদন করা হয়। জানাযার নামায চার তাকবীরে সমাপ্ত করতে হয়। প্রথম তাকবীরের পর ছানা (কারো কারো মতে ছানার সাথে সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা পড়া), দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ, তৃতীয় তাকবীরের পর জানাযার দোয়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরাতে হয়। কারো কারো মতে একদিকে সালাম ফিরাতে হয় আবার কারো মতে দুদিকেই সালাম ফিরাতে হয়।

জানাযার নামায পড়লে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়বে, সে এক কিরাত সওয়াব পাবে। আর কেউ জানাযার নামাযের পর দাফনেও অংশগ্রহণ করলে, সে দু'কীরাত সওয়াব পাবে। একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দু'কীরাত-এর পরিমাণ কি? তিনি জবাব দিলেন, দু'পাহাড়ের সমতুল্য। (বুখারী)

প্রত্যেক মুসলমানের চেষ্টা করা উচিত, অপর মুসলিম ভাই বা বোনের নামাযে জানাযা আদায় করা। মুসলিম কমিউনিটির কেউ যদি অপর কোন মুসলিম ভাই

www.pathagar.com

বা বোনের নামাযে জানাযা না পড়েন তাহলে সবাই গুনাহগার হবেন। তবে যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের জানাযা পড়া বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বে না এবং তার কবরে দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুত তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।" (তওবা ঃ ৮৪)

আল্লাহর যে-কোন বান্দা যে-কোন সময় নাফরমানী করতে পারে। তাই আমাদেরকে সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করেন। আর ঈমানের সাথে যাদের মৃত্যু হবে শুধু তাদেরই জানাযা হবে।

উল্লেখ্য, জানাযার নামায শেষে মাইয়েতকে কবরে নেওয়ার সময় পেছনে পেছনে যাওয়া উত্তম। এটা একজন মুসলমানের কাছে আরেকজন মুসলমানের হক। মাইয়েতকে নিয়ে কবরে যাওয়ার সময় জোরে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। সে সময় কালেমা পড়াই উত্তম। বিশেষ প্রয়োজনে জানাযার (খাটিয়া) আগে যাওয়া বৈধ হলেও মাইয়েতের আগে না যাওয়াই উত্তম। জানাযা (খাটিয়া) নিয়ে কবর দেওয়ার জন্য দ্রুত যাওয়া উত্তম। তবে এমনভাবে দৌড়ানো ঠিক নয় যে, মাইয়্যেতের শরীর ফেটে যায় বা হেলে দুলে উঠে। প্রয়োজনে কোন বাহনে করে মাইয়েতকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়াও বৈধ। যারা মাইয়েতকে বহন করবে তাদের প্রথমে কফিন হাতে নিয়ে তারপর কাঁধে নেওয়া সুন্নাত। এরপর কফিন ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম হাঁটার পর স্থান পরিবর্তন করে সামনের জন পেছনে যাবে। এভাবে প্রতি দশ কদম পর পর স্থান পরিবর্তন করে করে মাইয়েতকে কবরে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। এটা ইমাম আবূ হানিফার অভিমত। ছোট বাচ্চাকে হাতে করেও কবরে নিয়ে যাওয়া যায়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, একজন মুসলিম শিশু জন্মগ্রহণ করার পর তার কানে আযান দেওয়া হয়। সে সময় নামায পড়তে হয় না। আর মানুষ মারা যাবার পর জানাযার নামায পড়া হয়, সে সময় আযান দেওয়া হয় না। সম্ভবত এর কারণ হল, একজন শিশু জন্মের পরই আযানের আওয়াজের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনতে পায়। এর মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তুমি আল্লাহর বান্দা। দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম মেনে চলাই তোমার মূল কাজ। মানুষ আযানের পর যেমনিভাবে পবিত্র হয়ে নামায আদায় করে, তেমনিভাবে একজন শিশু বড় হলে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পূত-পবিত্র জীবন-যাপন করা প্রয়োজন। আল্লাহর অনুগত হয়ে যারা পূত-পবিত্র জীবন-যাপন করে, তাদের মৃত্যুর পর জানাযার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, জন্মের

www.pathagar.com

পর শুনা আযানের দাবি অনুযায়ীই সে জীবন-যাপন করেছে। আর যারা নাফরমান, আল্লাহর দুশমন, কাফির তাদের জন্মের পর আযান দেওয়া হয় না। আর তাদের মৃত্যুর পর জানাযা নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ঈমান কবুল করে তারাতো পূত-পবিত্র জীবন-যাপন করার জন্যই কুফরী ত্যাগ করে আল্লাহর পথে চলে। তাদের জানাযায় মুসলমানেরা অংশগ্রহণ করে প্রমাণ করে জন্ম কার কিভাবে হয়েছে তা বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে, মৃত্যুর সময় ঈমানদার হিসেবে মাওত হয়েছে কিনা? এ কারণে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে যাদের জন্মের পর আযান দেওয়া হয়েছিল তারা যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাদেরও জানাযা নেই। কারণ তারা আযানের দাবি অনুযায়ী জীবন-যাপন করেনি, আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে ভ্রান্ত পথে জীবন অতিবাহিত করেছে।

আফসোসের বিষয়, বর্তমানে দেখা যায় কেউ কেউ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ইসলামের বিরোধিতা করে। এভাবে যারা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও মুরতাদ হয়ে যায়, তাদের জানাযা পড়া ঠিক নয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো জানাযা পড়ার জন্য এলে তার সম্পর্কে খারাপ কথা শুনলে জানাযার নামায পড়তেন না।[১৭] হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একবার একজন লোকের জানাযা পড়ার জন্য তার প্রতিবেশী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলে আল্লাহর নবী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তার সম্পর্কে কি জান? সে বলল, আমি তাকে তীর দিয়ে আত্মহত্যা করতে দেখেছি। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, তুমি তাকে তীর দিয়ে আত্মহত্যা করতে দেখেছ! সে বলল, হ্যাঁ। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন তাহলে আমি তার জানাযার নামায পড়ব না।[১৮]

হাদীস থেকে জানা যায়, ঐ ব্যক্তি খুবই অসুস্থ ছিল। ভীষণ অসুখের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করেছিল। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েননি। আজকের সমাজেও অনেক সংবাদ শোনা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে বিষপান করে আত্মহত্যা করছে। কেউ পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না করতে পেরে আত্মহত্যা করছে। কেউ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করছে। কেউ প্রেম করে প্রেয়সীকে না পেয়ে বা প্রেমিককে না পেয়ে আত্মহত্যা করছে। কারো পিতা-মাতা জোর করে তার অমতে বিয়ে দিচ্ছে এ কারণে অভিমান করে আত্মহত্যা করছে। কখনও শোনা যায়, নিজের ফেভারিট টীম খেলায় জয়লাভ না করার কারণে ক্রীড়াপ্রেমিক যুবক-যুবতী আত্মহত্যা করছে। এমনকি প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যুর পরও তার অতিভক্ত কিছু তরুণ-তরুণীর আত্মহত্যা করার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এভাবে নানা কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে। যে

www.pathagar.com

কারণেই আত্মহত্যা করা হোক না কেন তা মস্তবড় গুনাহ্। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ এ ধরনের অপরাধ মুসলিম সমাজেও দেখা যায়।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার আগে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। আমাদের সমাজেও যদি এভাবে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় তাহলে সামাজিক অনেক অপরাধ কমে যাবে।

উল্লেখ্য, কাউকে যদি জানাযার নামায ছাড়া দাফন দেওয়া হয় তাহলে তাকে কবর দেওয়ার পরও নামায পড়া যাবে। কারো মতে যতদিন লাশ পচে যাওয়ার বা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই ততদিন পড়া যাবে। এর জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট না করাই ভাল। অবশ্য কোন কোন ফকীহ্র মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার তিন দিন পর পর্যন্ত আর কারো মতে দশ দিন আর কারো মতে একমাস পর্যন্ত নামায পড়া যাবে।

কেউ যদি নামাযে জানাযা মৃতকে দাফন করার আগে পড়তে না পারেন, তিনি ইচ্ছা করলে পরেও পড়তে পারেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, এক ব্যক্তি রাতে মারা যাবার পর তাকে কবর দিয়ে দেওয়া হয়। সকালবেলা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানার পর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন আমাকে জানাওনি? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, রাতে খুব অন্ধকার ছিল, আমরা অন্ধকার রাতে আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি। এরপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরের কাছে এলেন এবং জানাযার নামায পড়লেন।

অনুরূপ আরেকটি হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার এক মহিলা রাতে মারা যান। তিনি মসজিদের কাছেই বাস করতেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর কথা জানতেন না। বেশ কিছুদিন পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলা সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁকে বলা হল তিনি তো মারা গেছেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমাকে সংবাদ দাওনি কেন? তাঁরা বললেন, রাতে মারা যাওয়ার কারণে আমরা আপনাকে ঘুম থেকে জাগাতে চাইনি। তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কবর কোথায় আমাকে দেখাও। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরের কাছে এলেন এবং জানাযার নামায পড়লেন। তিনি বললেন, এই কবরসমূহ অন্ধকারে ভরপুর ছিল। তাদের জন্য আমার নামায পড়ার কারণে আল্লাহ্ পাক আলোকিত করেছেন। (বুখারী)

www.pathagar.com

কারো জানাযার নামায পড়ার জন্য মাইয়্যেতের উপস্থিতি শর্ত। গায়েবী জানাযা পড়া ঠিক নয়। তবে কেউ যদি এমন স্থানে মারা যায় যেখানে তার জানাযার নামায হয়নি, তাহলে গায়েবী জানাযাও পড়া যাবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাসীর গায়েবী নামাযে জানাযা আদায় করেছেন এবং তার জন্য দোয়া করতে সাহাবীদের বলেছেন। অবশ্য ইমাম মালেক ও ইমাম আবূ হানিফার মতে, নাজ্জাসীর জন্য গায়েবী নামায রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কারো জন্য এভাবে পড়া যাবে না। কেননা খোলাফায়ে রাশেদুন মারা যাবার পর কেউ গায়েবী নামায পড়েননি। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে উম্মতের যারই নামাযে জানাযা হয়নি বলে জানা যাবে তার গায়েবী নামায পড়া সুন্নাত। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে, যদি জানা যায় কেউ নামায পড়েনি, তখন গায়েবী নামায পড়া যাবে। কিন্তু যদি জানা যায় কেউ নামায পড়েছে, তাহলে গায়েবী নামায পড়া যাবে না। কেননা কেউ নামায পড়ার কারণে উম্মতের দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে।

একজন মাইয়্যেতের একাধিকবার জানাযার নামায পড়া যাবে। তবে যিনি একবার নামায আদায় করে ফেলেন তিনি দ্বিতীয়বার পড়তে পারবেন না।

মাইয়্যেতের অভিভাবক বা তার প্রতিনিধি জানাযার নামাযের ইমামতি করার অধিক হকদার। তা ছাড়া এমন ব্যক্তি ইমামতি করা উত্তম যার কিরাআত সবার চেয়ে ভাল এবং আল্লাহর কিতাবের অধিক জ্ঞান রাখেন। একই সাথে একাধিক নারী-পুরুষ ও শিশুর জানাযার নামায পড়া যায়। একসঙ্গে একাধিক নারী-পুরুষের জানাযা আদায় করার সময় ইমামের কাছে পুরুষ মাইয়্যেতের লাশ রাখতে হবে। যদিও মাইয়েত ছোট ছেলে হয়। একাধিক মাইয়েত একত্রিত করা হলে একসঙ্গে সবার জানাযার নামায না পড়ে পৃথক পৃথকভাবেও সবার জানাযার নামায পড়া যাবে। কারো কারো মতে পৃথক পৃথক পড়া উত্তম। আর কারো মতে একসঙ্গে পড়াই উত্তম। কেননা একসঙ্গে পড়লে তাড়াতাড়ি কবর দেওয়া সংক্রান্ত হাদীসের উপর আমল করতে সুবিধা হয়।

জানাযার নামায মসজিদের বাইরে পড়াই উত্তম। অবশ্য মসজিদের অভ্যন্তরে পড়াও জায়েয। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের জানাযার নামায মসজিদের অভ্যন্তরে পড়া হয়েছে। আবার অনেক সাহাবীর জানাযা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের বাইরে আদায় করেছেন।

জানাযার নামাযে তাকবীর বলা শর্ত। কারো কোন তাকবীর বাদ গেলে ইমাম সাহেব সব তাকবীর শেষ করার পর মনে মনে তাকবীর দিয়ে দিতে হবে।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হল তাকবীরের সময় হাত তোলা জরুরি কিনা? প্রথম তাকবীরের সময় হাত তোলার ক্ষেত্রে সব ইমামই একমত। পরের তাকবীরগুলোতে হাত তোলা বা না তোলা নিয়ে ইমামগণের বিভিন্ন মত রয়েছে।

উল্লেখ্য, ইমাম যদি চার তাকবীরের চেয়ে বেশি বা কম করেন সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানিফার মতে চার তাকবীরের বেশি করলে মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করবে না। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করবে এবং এক সাথে সালাম ফিরাবে। আর যদি স্বেচ্ছায় চার তাকবীরের চেয়ে কম করে তাহলে সবার নামায বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে ইমাম যদি চার তাকবীরের চেয়ে বেশি বলে তাহলে মুক্তাদী তার অনুসরণ করবে না। বরং ইমাম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নিয়ত করবে। মুক্তাদী ইচ্ছা করলে ইমামের আগেও সালাম ফিরাতে পারবে বা ইমামের জন্য অপেক্ষাও করতে পারবে। তবে অপেক্ষা করাটাই উত্তম। ইমাম মালেকের মতে ইমাম যদি চার তাকবীরের বেশি বলে তাহলে মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করবে না; বরং তার জন্য অপেক্ষা না করে সালাম ফিরাবে। আর যদি চার তাকবীরের কম ইচ্ছাকৃত করে তাহলে সবার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ভুলক্রমে করে এবং ভুল করার সাথে সাথেই বাকি তাকবীর দিয়ে দেয়, তাহলে সবার নামায হয়ে যাবে। আর যদি ইমাম ভুল সংশোধনে দেরি করে কিন্তু মুক্তাদীরা ইমাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকবীর দিয়ে দেয়, তাহলে ইমামের নামায বাতিল হবে কিন্তু মুক্তাদীদের নামায হয়ে যাবে। ইমাম আহমদের মতে ইমাম চার তাকবীরের চেয়ে বেশি তাকবীর দিলে সাত তাকবীর পর্যন্ত তার অনুসরণ করা যাবে। এর চেয়ে বেশি দিলে ইমামকে সতর্ক করতে হবে কিন্তু ইমামের আগে সালাম ফিরানো যাবে না।

দাফন বা কবর

মৃত সকলকেই দাফন করা ফরযে কিফায়াহ্। এমনকি কোন কাফির মারা গেলে তাকে জানাযা ছাড়া দাফন করতে হবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন ২৪জন কাফিরকে দাফন করার জন্য সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে ইসলামের কোন দুশমনের মৃত্যু হলেও মানুষ হিসেবে তার যে মর্যাদা তা দেওয়া উচিত। দুশমন বলে লাশের উপর অত্যাচার করা ঠিক নয়। তবে কাফিরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন মুসলমানকে কাফিরের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।

মাইয়েতকে কবরস্থানে নিয়ে দাফন করা সুন্নাত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করতেন। রাসূলে

www.pathagar.com

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বাসস্থানে দাফন করার বিষয়টি আল্লাহর নবীর জন্যই খাস ছিল। তবে শহীদদেরকে শাহাদাত বরণের স্থানে দাফন করা যায়।

মাইয়েতকে সূর্য উদিত হবার সময়, ঠিক দুপুরের সময় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় দাফন করা মাকরূহ। রাতের বেলায়ও জানাযার নামায পড়ে দাফন করা জায়েজ। হযরত হাসান বসরী বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রাতের বেলায় দাফন করাকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে এটা মাকরূহ নয়। কেননা হযরত আবূ বকরসহ অনেক সাহাবীকে রাতে দাফন করা হয়।

এক কবরে একাধিক মাইয়েতকে দাফন করা যায়। হযরত হিশাম ইবনে আমের (রা) বলেন, উহুদের দিন অনেক মুসলমানের শাহাদাতবরণের পর আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, প্রত্যেকের জন্য কবর খনন করা কঠিন। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কবর প্রশস্ত করে খনন কর এবং এক কবরে দুই তিনজনকে কবর দাও। যে কুরআন বেশি জানে তাকে কিবলার কাছে রাখবে (আবূ দাউদ, তিরিমিযী)। এ থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজনে অনেক মাইয়েতকেও এক কবরে দাফন করা যায়। .

মাইয়েতকে দাফন করার জন্য দুই ধরনের কবর খনন করা যায়। সুন্নাত হল লাহদ অর্থাৎ কবর খনন করার পর কিবলার পাশে কবর বরাবর লম্বা করে একটু গর্ত করা আর তাতেই মাইয়েতকে রাখা। তবে জমিন যদি নরম হয় সে অবস্থায় সিন্দুকি কবর অর্থাৎ কবর খনন করার পর কবরের মাঝে একটু গর্ত করা এবং সেখানেই মাইয়েতকে রাখা।

মাইয়েতকে কবরের পাশে নিয়ে তারপর কিবলামুখী করে তারপর কবরে রাখতে হয়। মাইয়েত মহিলা হলে কবরে পর্দা দিয়ে তারপর মোহাররম ব্যক্তিরাই তাকে কবরে রাখবে। কবরে রাখার সময় পড়া হয় 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ'। এরপর কাফনের বন্ধন খুলে দেওয়া হয়। তারপর মাটি দেওয়া শুরু হয়। প্রত্যেকেই তিনবার মাটি দেয়। প্রথমবার মাটি দেওয়ার সময় পড়া হয় কুরআনের বাণী, 'মিনহা খালাকনাকুম' অর্থাৎ এ থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। এরপর পড়া হয়, 'ওয়া ফীহা নুয়ীদুকুম' অর্থাৎ এখানেই আমি তোমাদের ফিরিয়ে নেই। এরপর পড়া হয় 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা' অর্থাৎ আর এ থেকেই আমি তোমাদের দ্বিতীয়বার উঠাবো।

এভাবে পরিচিতজনরা মাটি দিতে দিতে কবর পূর্ণ হয়ে যায়। কবর জমিন থেকে সামান্য পরিমাণ উঁচু হয়ে গেলে মাটি দেওয়া বন্ধ করে সবাই চলে

www.pathagar.com

যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। চলে যাওয়ার আগে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য ইস্‌তিগফার করার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কবরে শায়িত ব্যক্তির সে সময় এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা শেষে তার সঙ্গী-সাথীরা চলে যাবার সময় আল্লাহর নাফরমান বান্দারা চিৎকার করে বলতে থাকে, তোমরা আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ কোথায়? কিন্তু যতই চিৎকার করুক না কেন, মানুষ ও জিন সে আওয়াজ শুনতে পায় না। অন্য প্রাণীরা শুনতে পায়।

এবার একটু ভাবুন, আমরা প্রতিনিয়ত কতজনকে কবরে রাখি। অন্যদেরকে কবরে রাখার সময় কি ভেবে দেখি, আমাকেও এভাবে একদিন কবরে রাখা হবে? আমরা প্রতিনিয়ত অনেককে কবরে রেখে চলে আসি। আমরা কি ভেবে দেখি, এমন একদিন আসবে যে দিন আমাকে কবরে রেখে আমার পরিচিতজনরাও চলে যাবে? আমরা অনেকের কবর খনন করি। কিন্তু আমার কবর কে খনন করবে তার কথা কি চিন্তা করি? আজকের দুনিয়াতে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা নিয়ে কত ঝগড়া-বিবাদ দেখি। এসব নিয়ে খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু যখন এসব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা হয় তখন কি কেউ ভাবেন, মারা যাওয়ার পর এসব কিছু কবরে যাবে না। আফসোস, দুনিয়া নিয়ে মারামারি করে অনেকেই মারা যায়, কিন্তু মৃত্যুর পর কবরের কথা ভাবেন না। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য নেক আমল করার চেষ্টা করেন না। আমাদেরকে দুনিয়া পাওয়ার প্রতিযোগিতা বন্ধ করে আখিরাতে নাজাত পাওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাহলেই কবরে শান্তিতে থাকা যাবে। আর আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করা যাবে। কিন্তু আমরা যদি দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকি, তাহলে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে নাজাত দিন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

কবরের সওয়াল-জওয়াব ও বরযখের জগৎ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আখিরাতের পথিককে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এসব ধাপ অতিক্রম করেই বিচার-ফয়সালার সম্মুখীন হতে হবে। আর বিচারের রায়ের ভিত্তিতেই তার আবাসস্থল নির্ধারিত হবে। সে হয় জান্নাতী হবে, নতুবা জাহান্নামী হবে।

এখানে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই আল্লাহ বিচার করে মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামে দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ দুনিয়াতে একজন মানুষকে আল্লাহর হক (হুক্কুল্লাহ) পালনের সাথে সাথে হুক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক আদায়ের প্রতি যত্নশীল থাকতে হয়। আল্লাহর হক সম্পর্কে মৃত্যুর সাথে সাথে ফায়সালা করা সম্ভব কিন্তু বান্দার হক সম্পর্কে বিচার করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজন। তাই সবার মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে সকলকে একত্রিত করে-এসবের বিচার করা হবে। এরপরই জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে।[১৯] (এ বিষয়ের আসল রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন)

মানুষের মৃত্যু পরবর্তী সময়কে আলমে বরযখ বলা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত" (মুমিনূন ঃ ১০০)। এ জগৎকে বরযখের জগৎ বলার কারণ, এটা দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী পর্দা সদৃশ।

আল্লামা সুয়ূতী লিখেন, বরযখের জগতের সাথে তিনটি প্রশ্ন জড়িত। প্রথমতঃ বরযখের জগৎ কোথায়? দ্বিতীয়তঃ কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত বরযখের জগৎ নির্ধারিত হবে? তৃতীয়তঃ বরযখের জগতে কি অবস্থায় থাকে?

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ ও সংক্ষিপ্ত। বরযখ হল কবর থেকে শুরু করে ইল্লীন বা সিজ্জীনে রূহ অবস্থানের নাম। আর একজন মানুষের মৃত্যুর পর থেকেই এ জীবনের সূচনা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হবার পর পুনর্জীবন লাভ করার আগ পর্যন্ত সময়কে আলমে বরযখ বা বরযখের জগৎ বলা হয়। তৃতীয় প্রশ্ন হল, বরযখের জগতে কি অবস্থায় থাকে? এখানে কি অচেতন থাকে? না নিয়ামত বা শাস্তি ভোগ করে? এর জবাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকলেই একমত যে, এ সময় একজন মানুষ নিয়ামত বা আযাব ভোগ করে। মুতাযিলাসহ কিছু সম্প্রদায়ের মতে এ সময় মানুষ নিয়ামত বা আযাব ভোগ করে না। বরং অচেতন থাকে।

এখন আলোচনা করা দরকার এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কি আছে?

www.pathagar.com

কবর সম্পর্কে কিছু কথা

কবর হল প্রথম ঘর, প্রথম ঘাঁটি। আমরা অনেক সময় দুনিয়াতে আরাম-আয়েশে সময় কাটাই। কবরের কথা ভুলে দুনিয়ার মোহে পড়ে থাকি। কিন্তু কবর আমাদেরকে সবসময় ডেকে ডেকে বলে হে অমুক! আমি তোমার ঘর। আমার মধ্যে তোমাকে আসতে হবে। আমার মধ্যে তোমাকে একা থাকতে হবে। আমি আলোহীন, আমি অন্ধকার। তোমার নেক আমলই তোমার সঙ্গী হবে। তোমার নেক আমলই আমাকে আলোকিত করবে। এভাবে প্রতিদিন প্রত্যেকের কবর প্রত্যেককে ডেকে ডেকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা সবসময় কবরের কথা স্মরণে রেখে দুনিয়াতে কাজ করে তারা মৃত্যুর পর কবরে আরামেই থাকবে। আর যারা কবরের কথা ভুলে দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন থাকে, তাদেরকে কবরে অনেক যাতনা ভোগ করতে হবে।

মূলত মানুষের মৃত্যুর পর কবর হল তার প্রথম ঘর, প্রথম ঘাঁটি। কেউ যদি সেখানে মুক্তি লাভ করে, তাহলে তার পরবর্তী ঘাটসমূহ সহজ হয়ে যায়। আর কেউ যদি সেখানে আটকা পড়ে, তবে তার পরবর্তী ঘাটসমূহ তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

কবরের সওয়াল ও জওয়াব

মানুষের মৃত্যুর পর তার রূহ ইল্লীন বা সিজ্জীনে চলে যায় এবং তার দেহ কবরে রাখা হয়। কবরে রাখার পর দেহের সাথে রূহের সংযোগ হয়। এরপর তার সওয়াল-জওয়াব হয়। এ সওয়াল-জওয়াবের ভিত্তিতে কবর কারো জন্য হয় গেস্ট হাউজ আর কারো জন্য হয় জেলখানা।

এ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে[২০] এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কবরবাসীকে কবরে রাখার পর দু'জন কালো বর্ণের ফেরেশতা আসবে। তাদের একজনের নাম মুনকার অপর জনের নাম নাকীর। তারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করবে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? তদুত্তরে আল্লাহর নেক বান্দারা বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। তখন ফেরেশতারা বলবে আমরা জানতাম তুমি এ ধরনের জবাব দিবে। তারপর তার কবর আলোকিত করে দেওয়া হবে এবং এত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যে, তার চোখ যতটুকু যায় ততটুকু দেখতে পাবে। কবরবাসী সে সময় ফেরেশতাদের বলবে আমি কি আমার পরিবার পরিজনকে এ খবর দিয়ে আসার জন্য একটু যেতে পারব? তখন ফেরেশতাদ্বয়

www.pathagar.com

বলবে, তুমি নব বরের মত ঘুমাও। ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাও (যে বরকে একমাত্র তার প্রিয়তমা জাগায়) যতক্ষণ না আল্লাহ্ জাগায়।

আর কপট ব্যক্তিরা উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে সন্তোষজনক কিছুই বলতে পারবে না। সে বলবে এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তখন ফেরেশতারা বলবে, আমরা জানতাম তুমি এ ধরনের কথাই বলবে। তারপর জমিন তাকে প্রচণ্ডভাবে চাপ দেবে। যার ফলে তার একদিকের হাড় আরেকদিকে চলে যাবে।

উল্লেখ্য, যেসব ছোট ছেলে-মেয়ে মারা যায় তাদের কবরে সওয়াল-জওয়াব হয় কিনা? এর জবাবে ইমাম কুরতুবী বলেন তারাও বড়দের মত সওয়াল-জওয়াবের মুখোমুখি হবে। ইমাম আহমদ এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত পেশ করেছেন। তাঁর এক মত অনুযায়ী সওয়াল-জওয়াব শুধু প্রাপ্তবয়স্ক বা বয়স্কাদের হবে। আরেক মত অনুযায়ী সবারই সওয়াল-জওয়াব হবে। কারণ অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটদের জন্যও কবরের ফিতনা থেকে পরিত্রাণের দোয়া করেছেন।[২১]

জান্নাতীদের জান্নাতের পোশাক ও জাহান্নামীদের জাহান্নামের পোশাক দেওয়া হবে

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, কবরবাসীকে কবরে রাখার পর দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসাবে এবং প্রশ্ন করবে তোমার রব কে? তদুত্তরে ঈমানদার ব্যক্তি বলবে, আমার রব আল্লাহ্। তারপর প্রশ্ন করা হবে তোমার দীন কি? তদুত্তরে বলবে, আমার দীন ইসলাম। তারপর প্রশ্ন করা হবে ইনি কে যাঁকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল? তদুত্তরে বলবে ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল। এরপর গায়েবী আওয়াজ আসবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে, তাকে জান্নাতের বিছানা দাও, তাকে জান্নাতের পোষাক দাও। তার কবরের সাথে জান্নাতের কানেকশান করে দাও। এরপর সে কবরে থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে। তার চোখ যতদূর যায় ততদূর দেখতে পাবে।

উল্লিখিত সকল প্রশ্নের জবাবে কাফির ব্যক্তি বলবে হায় আফসোস হায় আফসোস! এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এরপর আসমান থেকে গায়েবী আওয়াজ আসবে সে মিথ্যা বলেছে। তাকে জাহান্নামের বিছানা দাও, জাহান্নামের পোষাক দাও, জাহান্নামের সাথে দরজা করে দাও। এরপর সে জাহান্নামের আগুনের তাপ পেতে থাকবে। তার কবর সংকুচিত করে দেওয়া হবে। যার ফলে একদিকের হাড় আরেকদিকে চলে যাবে। অতঃপর অন্ধ,

www.pathagar.com

বধির এক ফেরেশতা লোহার হাতুড়ি দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকবে। ঐ হাতুড়ি দিয়ে যদি পাহাড়কে আঘাত করা হত তাহলে পাহাড় মাটি হয়ে যেতো। ঐ হাতুড়ি দিয়ে আঘাতের ফলে সে এমন চিৎকার দিবে যা মাশরিক (পূর্ব) থেকে মাগারিব (পশ্চিম)-এর মধ্যবর্তী সকলেই শুনবে- একমাত্র জিন ও ইনসান ছাড়া।

জান্নাতীরা কবরেও নামায পড়তে চাইবে

কবরে রাখার পর থেকেই জান্নাতী ও জাহান্নামীদের আচরণ এবং তাদের সাথে কৃত আচরণ দু'ধরনের হবে। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, জান্নাতীকে কবরে রাখার পর সে ফেরেশতাদের বলবে সওয়াল-জওয়াব পরে হবে আগে আমাকে নামায পড়তে দাও। জান্নাতীরা কবরেও তাসবীহ-তাহলিল ও নামাযে সময় কাটাতে চাইবে। কিন্তু তাদেরকে বলা হবে নব বরের মত ঘুমাও। আর জাহান্নামীদের অবস্থা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা নানা ধরনের আযাব ভোগ করবে।

কবর আযাব

কবরে আযাব বা নিয়ামত ভোগ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কবরের আযাব হক। এটা বিশ্বাস করা ওয়াজিব। একমাত্র মুতাযিলা সম্প্রদায় কবরের আযাবকে অস্বীকার করে। তারা কুরআন ও হাদীসের চেয়ে যুক্তি নির্ভর হয়েই ভ্রান্ত দর্শনে বিশ্বাসী হয়েছে। তাদের প্রধান যুক্তি হল ঃ

১. কবরে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি সরাসরি কুরআনে নেই। হাদীস যতই সহীহ হোক না কেন তার দ্বারা কুরআনে নেই এমন কিছু প্রমাণ করা যায় না।

২. বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবার আগে কবরে শাস্তি দিলে হাশরের প্রয়োজন কি? দুনিয়ার আদালতেও বিচারের আগে শাস্তি দেওয়া অন্যায়। যদি অপরাধ প্রমাণের আগে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তাআলাকে (নাউযুবিল্লাহ) যালিম অত্যাচারী সাব্যস্ত করা হয়।

৩. কবরে যদি শাস্তিই দেওয়া হয় তাহলে যাদের লাশ খুঁজে পাওয়া যায় না তাদেরকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হয়?

৪. কবরের সওয়াল-জওয়াব হবার প্রয়োজন কি? মানুষ মারা যাবার পর কবরের সওয়াল-জওয়াব এর মাধ্যমে যদি পরীক্ষা করা হয় তাহলে ইনসাফ হয় না। কারণ পরীক্ষার জন্য স্বাধীনতা দরকার। মানুষকে আল্লাহ জন্মগত যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এখন আসুন, উল্লিখিত যুক্তিগুলো কতটা অন্তঃসারশূন্য তা নিয়ে আলোচনা করি। যারা বলে, কবরের শাস্তি দানের বিষয়টি কুরআনে নেই, তাদের একথা ঠিক নয়। কুরআনের অনেক আয়াতে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল্লাহ তাআলা বলেন, "তাদেরকে ছেড়ে দিন সে দিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের মাথায় বজ্রাঘাত পতিত হবে। সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। গুনাহগারদের জন্য রয়েছে এ ছাড়াও শাস্তি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।" (আত-তূর ঃ ৪৫-৪৭) তাফসীরকারকদের মতে এ আয়াতে "এ ছাড়াও শাস্তি রয়েছে" বলে কবরের আযাব বুঝানো হয়েছে। (আকীদা তুত তাহাবিয়্যা ঃ পৃষ্ঠা-১৩৩)

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "যদি আপনি দেখেন যখন রা মৃত্যুযন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।" (আনআম ঃ ৯৩)

৩. আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম তাঁর 'আর রূহ' গ্রন্থে লিখেন, যালিম লোকদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা তাদের এ কথাগুলো বলবে। এখানে 'আল ইয়াওম' শব্দ আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ হল আজ। যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত শাস্তি প্রদানের বিষয়টি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে আজ শব্দ প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল না। এ শব্দ দ্বারা মৃত্যুর পর থেকে যে বরযখের জীবনের সূচনা হয় তা বুঝানো হয়েছে। (আহওয়াল আল কুবুর ঃ পৃ-৭৯)

৪. আল্লাহ তাআলা ফিরাউনের ব্যাপারে বলেছেন, "ফিরাউন ও তার অনুচরদেরকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করে ফেলল। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফিরাউন ও তার দলবলকে কঠিনতর আযাবে দাখিল করো।" (মুমিন ঃ ৪৫-৪৬)

এ আয়াতে কঠিনতর আযাব বলতে বিচার-ফয়সালার পর জাহান্নামের চূড়ান্ত শাস্তির কথা বুঝানো হয়েছে। আর সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে পেশ করার ব্যাপারটি বরযখের জীবনে সংঘটিত হবে বলে তাফসীরকারকগণ অভিমত পেশ করেছেন। এ আয়াতের তাফসীরে

www.pathagar.com

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, ফিরাউন গোত্রের আত্মাসমূহকে কাল পাখির আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দু'বার জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয় এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয় এটা তোমাদের আবাসস্থল (তাফসীরে মাযহারী)। এ আয়াতের তাফসীরে মুফতী শফী (র) লিখেন, কবরের আযাব যে সত্য, উপরিউক্ত আয়াত তার প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতির হাদীস এবং উম্মতের ইজমা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। (তাফসীর মা'আরেফ আল কুরআন ঃ সূরা আল মুমিনের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

৫. আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।" (তাকাসুর ঃ ১-২) তাফসীরে ইবনে কাসীরে এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে। নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর না। এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায় এবং মৃত্যুর পর আযাবে গ্রেপ্তার হও। তিরমিযী ও বায়হাকীতে এ আয়াতটি কবরের আযাব প্রমাণ করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, "যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" (তোয়াহা ঃ ১২৪-১২৫)

এ আয়াতে "জীবিকা সংকীর্ণ হবে" দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে মুফাসসিরদের একাধিক মত আছে। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, কাফিরদেরকে কবরে রাখার পর যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তোমার রব কে? তোমার দীন কি? তখন তারা বলবে আমরা কিছু জানি না। এরপর তাদের কবর সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইবনে হাব্বান এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং 'মা'ঈশাতান দানকা' (সংকীর্ণ জীবিকা)-এর তাফসীরে বলেছেন, এখানে কবর জগৎ বুঝানো হয়েছে। (আহওয়াল আল ঃ কুবুর পৃষ্ঠা-৮০, তাফসীর মাআরেফ আল কুরআন ঃ সূরা তোয়াহার তাফসীর)

৭. আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সেজদা ঃ ২১) এ আয়াতে লঘু শাস্তি বলতে দুনিয়ার শাস্তি আর কঠিন শাস্তি বলতে পারলৌকিক শাস্তি বুঝানো হয়েছে বলে অনেক তাফসীরকারকের

www.pathagar.com

অভিমত। ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর তাফসীরে উল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করার পাশাপাশি আয়াতে 'শাস্তির দ্বারা' কবরের শাস্তি বুঝানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন। (দেখুন তানবীর আল মিকইয়াস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস ঃ পৃষ্ঠা-৪৩৮)

৮. আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের শাস্তি প্রসঙ্গে বলেন, "আর তোমাদের আশেপাশে যেসব বেদুঈন থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও রয়েছে এমন কিছু মুনাফিক, যারা মুনাফিকীতে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। তোমরা তাদেরকে চিন না, আমি তাদেরকে চিনি। শীঘ্রই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব। তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে আরো বড় আযাবের দিকে।" (তওবাহ ঃ ১০১)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতে উল্লিখিত দু'বার শাস্তির তাফসীরে বলেন, এর দ্বারা একবার জান কবয করার সময় এবং দ্বিতীয়বার কবরে আযাব দেওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। এরপর তাদেরকে আখিরাতে কঠিন আযাব দেওয়া হবে। (তানবীর আল মিকয়াস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস ঃ পৃষ্ঠা-২১২; সূরা তওবার ১০১ নম্বর আয়াতের তাফসীর দেখুন)

৯. কাফিরদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতঃপর এখনও নিষ্কৃতির উপায় আছে কি?" (মুমিন ঃ ১১) এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা কুরতুবী বলেন, এখানে দু'মৃত্যু দ্বারা বুঝানো হয়েছে দুনিয়ার জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার মৃত্যু এবং ইস্রাফীলের শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পরের মৃত্যু। আর দুই জীবন বলতে বুঝানো হয়েছে মৃত্যুর পর কবরের সওয়াল ও জওয়াবের জন্য জীবন দান ও হাশরের ময়দানে পুনর্জীবন।

১০. কবরের সওয়াল-জওয়াবের দিকে ইংগিত দিয়ে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ যালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (ইব্রাহীম ঃ ২৭)

এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেন, মুমিনের কালেমায়ে তাইয়েবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত। যারা খাঁটি ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে কালেমা তাইয়েবার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস থেকে প্রমাণিত, এখানে পরকাল বলতে কবর জগৎকে বুঝানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, মুমিনকে কবরে যখন প্রশ্ন করা হবে সে নিখুঁতভাবে জবাব দেবে। ফলে

www.pathagar.com

কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। আর কাফির মুশরিক, মুনাফিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে না। ফলে কবর থেকেই এক প্রকার আযাবে পতিত হয়। (তাফসীর মাআরেফ আল কুরআন)

এভাবে আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে মৃত্যুর পর কবরের সওয়াল-জওয়াব ও নিয়ামত বা শাস্তিভোগের বিষয়টি প্রমাণিত। কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যে আয়াতে কবর আযাব হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এখন কথা হল কুরআন থেকে সরাসরি কোন বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য জানা না গেলে সহীহ্ হাদীস-এর ভিত্তিতে কি আমল করা যায়?

এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব জীবন ও তাঁর বাণী হল কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআনে সংক্ষিপ্তাকারে অনেক বিষয়ের আলোচনা এসেছে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদীস থেকেই জানা যায়। এমনকি আমরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে সতের রাকাআত ফরয নামায আদায় করি। কুরআন দ্বারা নামায ফরয হবার পর কিভাবে নামায পড়তে হবে তা আল্লাহর রাসূলের হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনের কোন শব্দের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে মনগড়া কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনের যে ব্যাখ্যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যে তাফসীর করেছেন তার ভিত্তিতে যে ব্যাখ্যা করা হবে তাই গ্রহণযোগ্য। কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর প্রসঙ্গে যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা হাদীসের ভিত্তিতেই দেওয়া হয়েছে। আর কোন বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা না থাকলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে আমল করা ওয়াজিব।

এখন একটু আলোচনা করা যাক, কবরের আযাব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন? এ সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। প্রায় সত্তরটির মত হাদীস এ প্রসঙ্গে থাকায় কবর আযাব সংক্রান্ত হাদীস মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নিচে এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস তুলে ধরা হল ঃ

১. হযরত উসমান (রা) বলেন, আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি কবর অপেক্ষা অধিক ভয়ংকর আর কিছু হবে না। (তিরমিযী)

২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর কবরের আযাব হতে পানাহ চাইতেন।

www.pathagar.com

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ দোয়াটি শিখিয়েছিলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি, কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিৎনা-ফাসাদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সাথে সাথে জন্ম ও মৃত্যুর ফিৎনা থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি কবর দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার আশঙ্কা না করতাম তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম তিনি যেন তোমাদেরকে সরাসরি কবরের আযাব শুনার ব্যবস্থা করে দেন, যা আমাকে শুনানো হয়েছে।"(মুসলিম)

কবরে আযাবের ধরন বা প্রকৃতি

কবরে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিভোগ করার কথা হাদীসে উল্লেখ আছে।

সাপে দংশন

আমরা দুনিয়াতে সাপকে ভয় পাই। সাপ দেখলে অনেকেই চিৎকার দিয়ে উঠি। দুনিয়াতে বিষাক্ত সাপের ছোবলে অনেকে মারা যায়। কবরে এ সাপই পাপীদের নিত্যসঙ্গী হবে। প্রতিনিয়তই তাকে দংশন করবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, "কাফির ব্যক্তির কবরে নিরানব্বইটি সাপ তাকে দংশন করবে।" সাপ এত বিষাক্ত হবে যে, একটি সাপ যদি দুনিয়াতে শুধুমাত্র একবার নিঃশ্বাস ফেলতো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে কিছুই উৎপন্ন হত না। উল্লেখ্য, এখানে সাপের সংখ্যা বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং আযাবের ভয়াবহতা বুঝানোই উদ্দেশ্য। সাপের সংখ্যা যাই হোক না কেন মনের পর্দায় বিষাক্ত সাপের ছবি অংকন করে একসাথে কিছুক্ষণ থাকার কথা একটু ভাবুন। দেখুন কেমন ভয় লাগে?

লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে

দুনিয়াতে লোহার হাতুড়ি সাধারণত শক্ত কোন কিছুকে ভাঙার কাজে ব্যবহার করা হয়। মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বেত ব্যবহার করা হলেও লোহার হাতুড়ি কখনও ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু কবরে অপরাধীদেরকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে। ফেরেশতাদের পেটানোর সময় ব্যক্তি এত জোরে চিৎকার করতে থাকে যে, দুনিয়াতে মানুষ ও জিন ছাড়া আর সবাই শুনতে পায়। সম্ভবত মানুষ ও জিনকে শুনার বাইরে রাখার কারণ হল আল্লাহ চান না দুনিয়াবাসী কারো নিকট আখিরাতের কারো প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যাক।

www.pathagar.com

কারণ কবরের আযাব, জান্নাত ও জাহান্নামসহ আখিরাতের প্রতি ঈমান গায়েবের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যদি কোন কবরবাসীর কবরের শাস্তি শুনতে পায় তাহলে তার কাছে এটা আর গায়েব থাকে না।

জাহান্নামের স্থান প্রদর্শন

এটা এক ধরনের মানসিক শাস্তি। কোন মানুষকে যদি প্রতিনিয়ত ভয়ংকর কোন কিছু দেখানো হয়, তার মন ভয়ে কাঁপতে থাকে। জাহান্নামীদেরকে কবরে তাদের স্থায়ী আবাস দেখানোর মধ্য দিয়ে কবরে তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা হয়। কবরে জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয়কেই জান্নাত বা জাহান্নামের নিজ নিজ আসন দেখানো হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তাকে কবরে সকাল-সন্ধ্যায় তার স্থায়ী নিবাস দেখানো হয়। জান্নাতীকে জান্নাত আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম দেখিয়ে বলা হয় এটাই তোমার চিরস্থায়ী আবাসস্থল। যতদিন কিয়ামত না হয় ততদিন অপেক্ষা কর। কিয়ামতের পরই সেখানে তোমাকে দেওয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

কবর সংকুচিত করে দেওয়া

জাহান্নামীদের কবর সংকুচিত করে দেওয়া হয়। কবর এত সংকুচিত হয়ে যাবে যে, এদিকের হাড় ওদিকে চলে যাবে। দুনিয়াতেও দেখা যায়, দাগী আসামীদেরকে জেলখানায় খুবই কষ্টকর স্থানে রাখা হয়। আর কোন সম্মানিত মেহমান এলে তাঁকে রাজকীয় ভবনে রাখা হয়। কবর মুমিন ও কাফির সবাইকে চাপ দেবে। কাফিরদের চাপে কষ্ট অনুভব হবে। আর এ ধরনের চাপ সবসময় অব্যাহত থাকবে। মুমিনদের চাপ প্রসঙ্গে কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, এটা হবে এক বন্ধুর সাথে আরেক বন্ধুর কোলাকুলির মত।

এভাবে বিভিন্ন পদ্ধিতিতে জাহান্নামীদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়। আর জান্নাতীরা আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করে।

কবর আযাবের কারণ সম্পর্কে হাদীস

চোগলখুরী করা ও পেশাব থেকে সতর্ক না থাকাও কবরে শাস্তির কারণ হবে

পেশাব-পায়খানা মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়। এ পেশাব-পায়খানার সময়ও সতর্ক থাকতে হবে, পেশাবের ফোঁটা কাপড়ে যেন না পড়ে এবং সতর যেন উন্মুক্ত হয়ে না যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলে

www.pathagar.com

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটো কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেন, এ উভয় কবরবাসী আযাব ভোগ করছে। আর তাদের একজনের আযাব ভোগের কারণ হল, পেশাবের সময় সতর ঠিক রাখতো না আর অপরজন একজনের কথা আরেকজনের কাছে গিয়ে লাগাতো। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "তোমরা পেশাব থেকে সতর্ক থাকো। কেননা কবরে পেশাব সম্পর্কে প্রথম হিসাব নেওয়া হবে।" এ কারণে পেশাব করার সময় খুব বেশি সতর্ক থাকা দরকার।

উল্লেখ্য, বিচার দিবসে হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক)-এর মধ্যে প্রথম নামায আর হাক্কুল ইবাদের মধ্যে রক্তপাত তথা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন করা হবে। পেশাব ও চোগলখুরীর কারণে কবরে শাস্তি দেওয়ার সাথে বিচার দিবসের প্রথম প্রশ্নের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। বিচার দিবসে নামাযের প্রশ্ন করা হবে। আর নামাযের জন্য তাহারাত শর্ত। তাহারাতের জন্য পেশাবসহ অনেক কিছু থেকে পবিত্র থাকা জরুরি। চোগলখুরী মানব সমাজে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর ফিৎনা-ফাসাদের কারণেই মানুষে মানুষে মারামারি-রক্তপাত হয়। এ জন্যেই চোগলখুরীর কারণে কবরে শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

কুফর, শির্ক ও নিফাকসহ আরো অনেক কারণে কবরের আযাব ভোগ করার কথা অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে।

এক হাদীসে এসেছে যারা সম্পদ আত্মসাৎ করে তাদেরকে কবরে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। আরেক হাদীসে মিথ্যা কথা বলা, যিনা করা ও সুদ খাওয়ার কারণে কবরের আযাবের কথা উল্লেখ আছে। আরেক হাদীসে দেনা পরিশোধ না করার কারণে কবরে আযাব ভোগ করার কথা বলা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন কারণে কবরে আযাব ভোগের বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

যাদের লাশ পাওয়া যায় না

অনেকেই প্রশ্ন করেন, কবরের শাস্তি কি রূহের উপর হবে, না দেহের উপর? আর যারা বিমান দুর্ঘটনা বা সমুদ্রে মারা যায় অর্থাৎ যাদের কবর দেওয়া সম্ভব হয় না তাদের কবরের সওয়াল-জওয়াব বা কবরের শাস্তি কিভাবে দেওয়া হয়? এর উত্তরে কয়েকটি অভিমত আল্লামা ইবনে কায়্যিম তাঁর 'আররূহ' গ্রন্থে[২২] উল্লেখ করেন।

১. তাদের কবরের শাস্তি বা পুরস্কার রূহের উপর হয়। মূলত মাটির শরীরের উপর শাস্তি হয় না, শাস্তি হয় রূহের উপর। তাই মাটির শরীর মাটিতে

www.pathagar.com

মিশে গেলে কিংবা কোন কারণে পাওয়া না গেলে কোন সমস্যা নেই। কারণ, রূহ ও দেহের সমন্বয়ে একজন মানুষ। আর মানুষের মধ্যে কিছু জিনিস আছে যা দেখা যায়। যেমন হাত, পা, নাক, কান প্রভৃতি। আর কিছু জিনিস আছে যা দেখা যায় না। যেমন আনন্দ, ঘৃণা, ভালোবাসা, নিঃশ্বাস, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি। এসব জিনিস রূহের সাথে সম্পৃক্ত। আর রূহের নিয়ন্ত্রণেই দৃশ্য অঙ্গগুলো পরিচালিত হয়। তাই শাস্তি হবে রূহের উপর। ইবনে হাযম, ইবনে মুররাহ্সহ আরো অনেকে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২. আল্লাহ্ পাক তাদের রূহ্ ও দেহ্কে একত্রিত করে শাস্তি দেবেন। কিন্তু এই একত্রীতকরণের প্রক্রিয়া দুনিয়ার মত হবে না। আল্লাহ্পাক অন্যভাবে একত্রিত করবেন।

৩. কারো কারো মতে কবরের শাস্তি শুধু রূহের উপর হয়। হাশরের দিন পুনরায় সৃষ্টি করার পর বিচার-ফয়সালার ভিত্তিতে রূহ্ ও দেহ্ পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে রূহ্ ও দেহ্ উভয়েই নিয়ামত বা শাস্তি উপভোগ করবে। আল্লাহর কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। যারা দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে কিংবা কোন চতুষ্পদ জন্তু যাদের খেয়ে ফেলে তারাও কবরের শাস্তি উপভোগ করবে। মূলত কবরের শাস্তি বলতে বরযখের জগতের শাস্তিকেই বুঝানো হয়। কাউকে কবর দেওয়া হোক বা না হোক সবাই মরণের সাথে সাথেই বরযখের জগতে পদার্পণ করে। এ কারণে বরযখের শাস্তি বা নিয়ামত ভোগ করার জন্য কবর দেওয়া শর্ত নয়।

মুতাযিলাসহ একটি দলের মতে, কবরের শাস্তি মানুষ আলমে বরযখে থাকা অবস্থায় উপলব্ধি করবে না। যেমন কোন বেহুঁশ ব্যক্তি আঘাত এর ব্যথা হুঁশ ফিরে এলে উপলব্ধি করে তেমনি কবরের শাস্তি হাশরের ময়দানে পুনরায় উত্থানের পর উপলব্ধি করবে। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে এটা ভ্রান্ত মতবাদ।

অনেকগুলো সহীহ্ হাদীস দ্বারা কবরে নিয়ামত বা শাস্তি ভোগের বিষয়টি প্রমাণিত। তবে দুনিয়ার জগতে অবস্থান করে বরযখের জগতের শাস্তির ধরন বা প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপলব্ধি বা উপস্থাপন করা কঠিন। কারণ দুনিয়ার মানুষের জ্ঞান সীমিত, সে সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে আখিরাতের বিভিন্ন বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আখিরাতের বিভিন্ন স্তরের যে বিবরণ কুরআন ও হাদীসে আছে তার উপর ঈমান রাখা ফরয। এটা গায়েবের উপর ঈমান আনার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তিতে বুঝে আসুক বা না আসুক গায়েব সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় পোষণের কোন সুযোগ নেই। আর

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে কারো মনে সন্দেহ থাকলে তিনি ঈমানদার নন। তিনি হবেন মুনাফিক। আর ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য হল, তিনি আল্লাহর রাসূলের সব কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবেন। যেমন হযরত আবূ বকর (রা) মিরাজের ঘটনা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিলেন। মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তির বিপরীত মনে হলেও তা বিশ্বাস করতে হবে। কারণ, মানুষ স্বীয় বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে জগতের সবকিছু যেখানে বুঝতে পারে না, সেখানে আখিরাতের সবকিছু বুঝা আর পক্ষে দুরূহ বটে।

আর যে কথা বলা হয়, হাশরের ময়দানে বিচারের আগে কবরে শাস্তি দিলে আল্লাহ যালিম হবেন, নাউযুবিল্লাহ। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহ আলিমুল গায়েব। কোন মানুষ কখন কি করে আল্লাহ সবই জানেন। আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন নেই। আল্লাহ হাশরের ময়দানে সবাইকে একত্রিত করার মাধ্যমে বিচার করার অর্থ এ নয় যে, এর পূর্বে আল্লাহ ঐ মানুষ এর রেকর্ড সম্পর্কে অবহিত নন। ফেরেশতাদের রিপোর্ট, যালিম-এর সামনে মাযলুমকে দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করার পরই আল্লাহ জানবেন কোন বান্দা কি করেছে। এ ধরনের ধারণার অর্থ হল আল্লাহকে আলিমুল গায়েব হিসেবে মানতে অস্বীকার করা। আর এটা সুস্পষ্ট কুফরী। আল্লাহ অতীতে আদ, সামুদসহ অনেক জাতিকে দুনিয়াতেও আযাব দিয়েছিলেন। যদি বলা হয়, শেষ বিচারের আগে কবরে শাস্তি দেওয়া অন্যায়, তাহলে আল্লাহ অতীতে যেসব জাতিকে দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের আযাব দিয়েছিলেন তা কি অন্যায় হয়েছে ? (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ তাআলা ইনসাফের সাথে বিচার-ফয়সালা করবেন। এটা ঠিক। কারো প্রতি সামান্যতম যুলুম করবেন না। যারা দুনিয়াতে বাড়াবাড়ি করেছে, দীনের বিরোধিতা করেছে, যুলুম করেছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়াতো যুলুম নয়, বরং ইনসাফেরই দাবি। আর তাদের শাস্তি শুধু কবরে নয়, মরণের মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়। কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত আল্লাহর নেক বান্দাদের মৃত্যু আর অপরাধীদের মৃত্যুযন্ত্রণা এক ধরনের হয় না। যারা সারাজীবন আল্লাহর দীন পালন ও দীন কায়েমের জন্য নানা কষ্ট করেছে আর যারা সারাজীবন আল্লাহর নাফরমানী করেছে বা দীনের বিরোধিতা করেছে, দীনের পথের পথিকদের নির্যাতন করেছে, এ দু'শ্রেণীকে মরণের পর সমানভাবে রাখা কি ইনসাফ হয়?

যারা কবরের আযাবকে অস্বীকার করেন তারা কি প্রকারান্তরে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করছেন না? আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর সাথে সাথে নেককারদের আমলনামা ইল্লীনে আর বদকারদের আমলনামা সিজ্জীনে ফেরেশতারা নিয়ে যায়। যদি বিচারের আগে নেককারদের নিয়ামত আর বদকারদের সাজা দেওয়া অন্যায় হয় তাহলে মরণের পর নেককার ও বদকারদের আমলনামা এভাবে দু'ভাগে ভাগ করার রহস্য কি?

www.pathagar.com

মূলত আল্লাহ মানব সৃষ্টির সাথে সাথেই অবগত আছেন যে, কে কোন ধরনের আমল করবে। কার স্থান কি হবে। মানুষের সাথে শুধু যদি আল্লাহর হকের সম্পর্ক থাকতো তাহলে আল্লাহ মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নাম দিয়ে দিতেন। কিন্তু একজন মানুষের সাথে বান্দার হকেরও সম্পর্ক আছে। যদিও আল্লাহ জানেন, কোন বান্দার হক কে কতটুকু নষ্ট করেছে, কে কাকে ক্ষমা করবে এবং কে কাকে ক্ষমা করবে না। তারপরও ইনসাফের দাবি হল বাদী-বিবাদীকে একত্রিত করে বিচার করা। এ জন্যই হাশরের প্রয়োজন (প্রকৃত রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন)। হাশরের ময়দানে বিচার-ফয়সালার আগে আল্লাহ কাউকে আযাব বা নিয়ামত দিবেন না এমন কোন ঘোষণা তিনি প্রদান করেননি।

এখানে যে বিষয়টি সমস্যা বলে আমি মনে করি তা হল, আল্লাহর ক্ষমতাকে দুনিয়ার মানুষের ক্ষমতার মত মনে করা। আল্লাহ তো তাঁর বান্দাকে অযথা আযাব দিচ্ছেন না। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে কিতাব পাঠিয়ে সতর্ক করার পরও যারা সতর্কবাণী উপেক্ষা করে নাফরমানী করবে এবং এ অবস্থায় মরণ হবে, আল্লাহ তাদেরকেই আলমে বরযখে আযাব দেবেন। অবশ্য এ আযাব জাহান্নামের আযাবের চেয়ে হালকা হবে।

আর যে যুক্তি দেওয়া হয়, মানুষের মরণের পর স্বাধীনতা থাকে না। তাই কবরে সওয়াল-জওয়াব করলে ইনসাফ হবে না। কারণ মানুষ সে সময় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকে। স্বাধীনভাবে জবাব দেওয়ার সুযোগ থাকে না। এ ধরনের যুক্তিতে কবর আযাবকে অস্বীকার করা হাস্যকর। কেননা, মরণের পর মানুষের স্বাধীনতা দুনিয়ার জীবনের মত না থাকার কারণে যদি কবরের সওয়াল-জওয়াব করা অযৌক্তিক হয় তাহলে হাশরের ময়দানেও তো মানুষ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সেখানে হিসাব-নিকাশ নেওয়া কি অযৌক্তিক হবে না? মূলত কবরের আযাবকে অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই।

আলমে বরযখের আরো কতিপয় প্রসঙ্গ

আলমে বরযখের আরো কতিপয় প্রসঙ্গ আছে যে সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অভিমত রয়েছে। যেমন ঃ

সওয়াল জওয়াব কি শুধু উম্মতে মুহাম্মদী-এর জন্য?

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন কবরের সওয়াল-জওয়াব কি শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে সম্পৃক্ত না সকল নবী-রাসূলের উম্মাতেরও হয়েছিল? এর জবাবে 'আহওয়ালুল কুবুর ওয়া আহওয়ালু আহলিহা ইলান নুসুর' গ্রন্থে[২৩] উলামায়ে কেরাম-এর তিন ধরনের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১. কবরের সওয়াল-জওয়াব শুধু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের রিসালাতকে যারা অস্বীকার করত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতেই শাস্তি দিতেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর দাওয়াত যারা অস্বীকার করে তাদেরকে দুনিয়াতে অন্যান্য কওমের মত শাস্তি দেওয়া হয় না। এ অভিমতের প্রবক্তারা দলীল হিসেবে আল্লাহর রাসূলের বাণী উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ এ উম্মতকে কবরের ফিতনায় নিমজ্জিত করেছেন।" এখানে এ উম্মত দ্বারা শুধু তাঁর উম্মতকে বুঝানো হয়েছে।

২. সকল উম্মতেরই কবরে সওয়াল ও জওয়াব হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোল্লিখিত হাদীসে উম্মত বলতে সমস্ত মানব সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলের উম্মতকেই সওয়াল-জওয়াবের পর কবরের আযাব বা নিয়ামত ভোগ করতে হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়িম বলেন, "কবরের সওয়াল-জওয়াব মুসলিম-অমুসলিম সকলেরই হবে।" যারা বলেন, কবরের সওয়াল-জওয়াব শুধু মুসলমান ও মুনাফিকের হবে তা ঠিক নয়। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সকলেরই সওয়াল-জওয়াব হবে[২৪] এবং এর ভিত্তিতে নিয়ামত বা শাস্তিভোগ করবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কয়েকজন ইহুদীর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "এ ইহুদীদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। জীব-জন্তু শাস্তির আওয়াজ শ্রবণ করছে।" রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য কোন দোয়া করেননি।

৩ উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ পূর্ববর্তী উম্মতদের কবরের সওয়াল-জওয়াব সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের সওয়াল-জওয়াব এবং কবরে নিয়ামত বা শাস্তি ভোগ হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত। পূর্ববর্তী উম্মতদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু নেই। তাই এ ব্যাপারে নীরব থাকাই ভাল।

কবরের সওয়াল-জওয়াব ও আযাব সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করার পর আমার কাছে মনে হয়, কবরের সওয়াল-জওয়াব সবার জন্য-এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা অনেক আয়াতে ও হাদীসে পূর্ববর্তী জাতিদের আযাবের কথা উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

কবরবাসী কি শুনে

যারা কবর যিয়ারত করতে যান এবং সালাম দেন কবরবাসী কি তা শুনেন? একটি হাদীস থেকে জানা যায়, দুনিয়ার পরিচিতজনরা যখন কারো কবর যিয়ারত করতে যায়, কবরবাসী তাকে চিনতে পারে এবং তার সালাম শুনতে পায়; কিন্তু জবাব দিতে পারে না।[২৫]

এ প্রসঙ্গে মুফতী শফী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেন, "সাহাবায়ে কেরাম যেসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) মৃতদের শ্রবণ সাব্যস্ত করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর বিপরীতে বলেন, মৃতরা শুনতে পায় না। এ কারণে অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কুরআন পাকে সূরা নমলে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, আপনি মৃতদেরকে আহ্বান শুনাতে পারবেন না। (নমল ঃ ৮০)

অনুরূপভাবে সূরা ফাতিরে ইরশাদ হয়েছে, "যারা কবরস্থ হয়ে গেছে তাদেরকে আপনি শুনাতে পারবেন না।" যারা মৃতদের শুনার পক্ষে অভিমত পেশ করেছেন তাঁদের মতে এসব আয়াত থেকে বুঝা যায়, মৃতদের মধ্যে শুনার যোগ্যতা আছে; কিন্তু আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদের শুনাতে পারি না।"

মুফতী শফী (র) আরো লিখেন, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শুনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ্ সে সময় তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। ১. মৃতরা শুনতে পারে। ২. তাদের শুনা এবং আমাদের শুনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন শুনিয়ে দেন। সালাম ছাড়া অন্যান্য কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফায়সালা করা যায় না যে, মৃতরা শুনে। আল্লামা সুবকী ও ইমাম গাযালীর অভিমত হল, সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মৃতরা মাঝে-মধ্যে জীবিতদের কথাবার্তা শুনে। কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা শুনে।[২৬]

যারা বলেন, মৃতরা শুনেন তাঁরা উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মৃতরা জীবিতদের মত শুনে না। অথবা মৃতরা এক সময় জীবিতদের কথাবার্তা শুনে, অন্য সময় শুনে না। বা কতক লোকের কথা শুনে কতক লোকের কথা শুনে না। বা কতক মৃত শুনে কতক মৃত শুনে না। বা সালাম শুনে অন্য কথা শুনে না।

তাফসীরে কুরতুবীতে মৃতরা না শুনার দলীল হিসেবে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক উপস্থাপিত উল্লিখিত আয়াত উল্লেখ করার পর বদরের শহীদদের

www.pathagar.com

সম্পর্কিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সে হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের কবরের পাশে গিয়ে তাদের নাম ধরে ধরে জিজ্ঞেস করেছেন, আল্লাহ্ আমার সাথে যা ওয়াদা করেছেন তা আমি সঠিক পেয়েছি, তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করেছেন তা কি তোমরা ঠিক ঠিক পেয়েছো? তখন হযরত উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি নিষ্প্রাণ দেহের সাথে কথা বলছেন? তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা তা শুনতে পারবে না আমি তাদের সাথে যে কথা বলেছি। ইবনে আতিয়া বলেন, বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের সাথে কথোপকথন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি মুজিযা।

কিন্তু আল্লামা কুরতুবী বলেন, আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে ফিরে আসার সময় জুতার যে শব্দ হয় তা কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। এ হাদীস এবং মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম করা সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায়। যদি তারা শুনতে না পেত তাহলে তাদেরকে সালাম করা হত না।[২৭]

মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর তাফসীরে "তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না"-এর ব্যাখ্যায় লিখেন, এখানে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের বিবেক মরে গেছে এবং প্রবৃত্তি পূজা যাদের মধ্যে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য উপলব্ধি করার কোন প্রকার যোগ্যতাই বাকি রাখেনি।[২৮]

আল্লামা রাজিও তাঁর তাফসীরে অনুরূপ ব্যাখ্যা করে বলেন, এখানে মৃত বলতে এমন লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে যাদের সম্পর্কে এ আশা পোষণ করা যায় না যে, তারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থাপিত আদর্শের কথা শুনবে।[২৯]

তাফসীরে উল্লিখিত আয়াতের এ ধরনের ব্যাখ্যার কারণে আমার কাছে মৃতদের শুনা সম্পর্কিত এই ব্যাখ্যায় অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় যে, মানুষের সেসব কথা মৃতরা শুনতে পায় আল্লাহ্ যেসব কথা মৃতদের শুনান। এর সমর্থন কুরআনেও আছে। যেমন সূরা নমলের পূর্বোক্ত আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "কিন্তু আল্লাহ্ করববাসীকে শুনান"।

কোন কোন কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যারা জুমআবার বা শনিবার সূর্যোদয়ের আগে কবর যিয়ারত করে কবরবাসী তাদেরকে চিনতে পারে। তবে আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ এ ধরনের হাদীসের সনদ দুর্বল বলে তাঁর আহওয়াল আল কুবুর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

আলমে বরযখে রূহ কোথায় থাকে

সকল মানুষের রূহ আল্লাহ এক সাথে সৃষ্টি করেছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বংশানুক্রমিক ধারায় দুনিয়াতে আসে। দুনিয়ার জগতে পদার্পণের আগে প্রত্যেকের রূহ মায়ের পেটে আসে। নির্দিষ্ট সময় মায়ের পেটে থাকার পর দুনিয়ার জগতে আসে। আর দুনিয়াতে নির্ধারিত হায়াত শেষে পরপারের পথিক হয়। পরপারে যাত্রার প্রথমেই আলমে বারযাখ। কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মৃত মানুষ নেককার হলে এ সময় তার রূহ ইল্লীনে থাকে আর বদকার হলে তার রূহ সিজ্জীনে থাকে। এ সম্পর্কে আহওয়াল আল কুবুর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নিচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল ঃ

নবী ও রাসূলগণের রূহ

অনেকগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের আরওয়াহ আলা ইল্লীনে আছে। আর এটা জান্নাতে অবস্থিত। তাছাড়া আম্বিয়াগণের শরীর মাটিতে নষ্ট হয় না।

শহীদদের রূহ

কুরআন থেকে প্রমাণিত যে, শহীদরা জীবিত। আল্লাহ বলেন, যারা অল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। (আলে ইমরান ঃ ১৬৯)

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াতের তাফসীরে অনেকগুলো অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে।[৩০]

কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্যই নির্দিষ্ট। কারো কারো মতে, এটা বদরের শহীদদের জন্য নির্দিষ্ট। আর কারো কারো মতে, এটা বীরে মাউনা নামীয় একটি কূপের নিকট নিহত শহীদদের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারকই বলেছেন, এটা সকল শহীদদের জন্য। যারাই আল্লাহর পথে শহীদ হন তারাই জান্নাতে বিশেষ রিযিকপ্রাপ্ত হন।

শহীদদের জীবিত হওয়ার ধরন সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের অনেক অভিমত বিদ্যমান। অনেকের মতে শহীদরা বাস্তবিকভাবেই জীবিত। তাঁদের রূহ তাঁদের কবরে ফিরিয়ে দেওয়া হয় আর তাঁরা নিয়ামত ভোগ করেন। মুজাহিদ বলেন, তাঁদেরকে জান্নাতের ফল দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁরা জান্নাতে থাকেন না। কিন্তু অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, শহীদদের রূহ জান্নাতে সবুজ এক ধরনের পাখির পেটের ভেতর অবস্থান করে জান্নাতে বিচরণ করে এবং জান্নাতের ফল-ফলাদি ভক্ষণ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জাফরকে দেখেছি, জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ শহীদ হয় আল্লাহ তাকে উত্তম এক শারীরিক অবয়ব দান করেন এবং তার রূহকে বলেন এটার ভেতর প্রবেশ করে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহীদগণ জান্নাতের একটি নহরের ধারে অবস্থান করেন, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁদেরকে খাবার দেওয়া হয়।

কারো কারো মতে শহীদেরা আল্লাহর আরশের নিচে রুকূ ও সেজদারত অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

মাওলানা মওদূদী (র) 'শহীদগণ মৃত নয়' এর তাফসীরে লিখেন, মৃত্যু শব্দটি এবং এর ধারণা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুর কথা শুনে সে সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহর পথে শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদেরকে মৃত বললে ইসলামী দলের লোকদের জিহাদ, সংঘর্ষ ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা স্তব্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। এর পরিবর্তে ঈমানদারদের মনে এ চিন্তা বদ্ধমূল করতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরন্তন জীবন লাভ করে। এই চিন্তাটি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে সামঞ্জস্যশীলও। এ চিন্তা পোষণের ফলে সাহস ও হিম্মত তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকে।[৩১]

তাফসীরে ইবনে আব্বাসে উল্লেখ আছে যে, শহীদগণ জীবিতদের মত। এর অর্থ হচ্ছে তাঁরা দুনিয়ার জীবিত মানুষদের মত জীবিত নয়। আল্লাহ তাঁদেরকে অন্য ধরনের এক সুখকর জীবন দান করেছেন।

শহীদ ছাড়া সাধারণ মুমিনদের রূহ

সাধারণ মুমিনদের মধ্যে যারা শিশু অবস্থায় মারা যায় তাদের রূহ জান্নাতে থাকে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, শহীদদের রূহ জান্নাতে সবুজ পাখির পেটের ভেতর থাকে আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের রূহ জান্নাতে চড়ুই পাখির পেটের ভেতরে থেকে বিচরণ করে। আর তাদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আ) দেখাশুনা করেন।[৩২]

এ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন, আল্লাহই অধিক অবহিত। অবশ্য তাঁর কোন কোন বর্ণনায় প্রথম অভিমতের অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

অন্যান্য সাধারণ মুমিনদের রূহও জান্নাতে আর কাফিরদের রূহ জাহান্নামে থাকে বলে কেউ কেউ অভিমত পেশ করেন। তারা যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারেন। এমনকি দুনিয়ার মত একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎও করেন।

www.pathagar.com

আবার কারো কারো অভিমত হচ্ছে, সাধারণ নেককার মুমিনদের রূহ ইল্লীনে থাকে ঠিকই কিন্তু তারা জান্নাতে থাকে না। এ মতের প্রবক্তারা যুক্তি দিয়ে বলেন, হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, কবরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত বা জাহান্নাম দেখানো হয়। যদি রূহ জান্নাতে থাকে তাহলে জান্নাত দেখানোর প্রশ্নই উঠে না। এ মতের প্রবক্তাদের মতে শহীদদের রূহই জান্নাতে থাকে। অন্যান্য মুমিনদের রূহ কবরের সাথে থাকে। মুজাহিদ বলেন, মুমিনদের রূহ দাফন করার পর থেকে সাত দিন কবরে দেহের সাথে থাকে।

কারো কারো মতে মুমিনদের রূহ হযরত আদম (আ)-এর রূহ এর ডানপাশে আর কাফিরদের রূহ বামপাশে থাকে। তিনি যখন ডানদিকে তাকিয়ে মুমিনদের রূহ দেখেন তখন হাসেন। আর যখন বামদিকে তাকিয়ে কাফিরদের রূহ দেখেন তখন কাঁদেন। এ মতের প্রবক্তারা সহীহাইন থেকে দলীল হিসেবে হযরত আবূ যর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেন।

স্বপ্নে রূহের সাথে সাক্ষাৎ

মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার রূহ বিচরণ করে। আল্লাহ্ এ সময় রূহ নিয়ে যান। এরপর কারো রূহ ফেরত দেন আবার কারো রূহ আর ফেরত দেন না। যাদের রূহ ফেরত দেন না তাদের সম্পর্কে আমরা বলি, "অমুকে ঘুমের ভেতর মারা গেছে।"

ঘুম যাওয়ার পর মানুষ অনেক কিছু দেখে। এটাকে আমরা স্বপ্ন বলি। এ ধরনের স্বপ্নে ঘুমের মধ্যে মানুষের রূহের সাথে মৃত মানুষের রূহের সাক্ষাৎ হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। হযরত আব্বাস (রা) বলতেন, আমি উমর (রা)-কে স্বপ্নে দেখতে আগ্রহী ছিলাম। একবার তাঁর সাথে দেখা হয়।[৩৩]

এ সম্পর্কে এ ধরনের কিছু বর্ণনা ছাড়া বেশি কিছু জানা যায় না।

একসঙ্গে অনেকেই মারা যায় কিন্তু কিভাবে রাসূলকে সবার কবরে দেখা যায়

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, দুনিয়াতে একসঙ্গে অনেকেই মারা যায়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর হল মদীনায়। তাঁকে একসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কিভাবে দেখানো সম্ভব? এর উত্তরে বলা যায়, আধুনিক যুগে টেলিভিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্তের কোন কিছু আরেক প্রান্ত থেকে দেখা যায়। আল্লাহ যিনি সকল শক্তির উৎস তাঁর পক্ষে বিশেষ কুদরতে তাঁর হাবিবকে প্রত্যেকের কবরে একসঙ্গে দেখানো কঠিন কোন বিষয় নয়।

সওয়াল-জওয়াব মুখস্থ করলে ফায়দা নেই

এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার, কেউ যদি কবরের সওয়াল-জওয়াব দুনিয়াতে আরবীতে মুখস্থ করে রাখল, কিন্তু আল্লাহর হুকুম ও রাসূলে

www.pathagar.com

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা অনুযায়ী চলল না, তার পক্ষে কবরে জওয়াব দেওয়া সম্ভব হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরীকা অনুযায়ী জীবন-যাপন করেছে, সে আরবী না জানলেও সহজেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। তাই কবরের সওয়াল-জওয়াব সুন্দরভাবে দেওয়ার জন্য সবসময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে চলা প্রয়োজন।

কবর পাকাকরণ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ প্রসঙ্গ

কোন ব্যক্তি মারা যাবার পর তার কবর পাকা করা নিষেধ। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং বাড়িঘর বানাতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

কবর মাটির চেয়ে বেশি উঁচু করা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত সুমামা ইবনে শফী থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমরা একবার রোমের রওদাস নামক স্থানে ফুদালা ইবনে উবায়েদের সাথে ছিলাম। সে সময় আমাদের এক সাথী মৃত্যুবরণ করলেন। তখন ফুদালা আমাদের সাথীর কবরকে মাটির সাথে সমান করে দিতে আদেশ দিলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবর সমান করার আদেশ দিতে শুনেছি। (মুসলিম)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কবর মাটি থেকে উঁচু না করা সুন্নাত। তবে সামান্য পরিমাণ উঁচু করাতে দোষ নেই।

কবরকে পাকা করা, চুনকাম করে সৌন্দর্য বর্ধন করা নিষেধ। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কোন কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

এ ধরনের কোন কিছু করলে তা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। জাহিলী যুগে লোকেরা কবর পাকাকরণ এবং কবর সৌন্দর্যমণ্ডিত করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। এটাকে গর্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক মনে করা হত। কবরের উপর চমৎকার গম্বুজ নির্মাণ করা হত। ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

তবে কোথাও কোন সময় যদি মনে করা হয়, কবরের সংরক্ষণের জন্য পাকা করা দরকার, তখন সৌন্দর্যের নিয়ত ছাড়া কেবল ততটুকু পাকা করা বৈধ যতটুকু কবর সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন।[৩৪]

এখন প্রশ্ন হল, মৃত কারো জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা যাবে কিনা? এর জবাব পরিষ্কার। হাদীসে মৃত কারো কবরে সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তাই মৃত কারো স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য কোন স্থানে স্মৃতিসৌধ করা বিদআত। আল্লাহ্ মুসলিম জাতিকে এ ধরনের বিদআত থেকে হেফাযত করুন। মৃত কারো স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এভাবে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ না করে সে অর্থ দিয়ে কোন ফান্ড করে সদকায়ে জারিয়ার কোন কাজে ব্যয় করলে তা মৃত মানুষের জন্য উপকারে আসবে। যেমন এ ধরনের অর্থ দিয়ে অসহায় মানুষের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

কবর যিয়ারত

আমাদের সমাজে কারো কারো ধারণা, মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে হলে তার কবরের কাছে যেতে হবে। এ ধারণা ঠিক নয়। বিশ্বের যে-কোন স্থান থেকে, যে-কোন সময় মৃত যে-কোন ব্যক্তির জন্য দোয়া করা যায়।

পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কেননা, এর মাধ্যমে কবরের কথা স্মরণে আসে। আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। তবে শুধু কবর যিয়ারতের জন্য কোথাও ভ্রমণ করা উচিত নয়। অনেককেই দেখা যায়, শুধু কবর যিয়ারতের জন্য আজমীর শরীফ বা অন্য কোথাও যান। এ ধরনের কবর যিয়ারতে সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ্ হবে। তবে কোন কাজে কোথাও গেলে কারো কবর যিয়ারত করা দূষণীয় নয়। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, জুমআর দিন এবং তার একদিন আগে ও পরে কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী (র) বলেন, কবর যিয়ারতকে এভাবে কোন দিনের সাথে নির্দিষ্টকরণ ঠিক নয়।

ইমাম আবূ হানিফা ও মালেক (র)-এর মতে মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত নিষেধ। তারা যে-কোন স্থান থেকে মৃত মানুষের জন্য দোয়া করতে পারে। কিন্তু ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী-এর (র) মতে, যদি ফিতনায় লিপ্ত হবার ভয় না থাকে তাহলে মহিলারাও কবর যিয়ারত করতে পারে।[৩৫]

তাদের বক্তব্য হল, কবর যিয়ারত প্রথমে সবার জন্যই নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে যখন অনুমতি দেওয়া হয়, তখন সবার জন্যই সাধারণভাবে অনুমতি দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রা) কোন এক কবর যিয়ারত করে আসলেন। তখন আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি কোথা থেকে এলেন, তিনি জবাব দিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকরের কবর যিয়ারত করে। তারপর আমি বললাম, রাসূলে করীম কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয় (হাকেম)।[৩৬]

মহিলাদের মন নরম হওয়ায় তারা ধৈর্য ধারণ না করে কবরের পাশে চিৎকার করতে পারে। এ কারণে যারা মনে করেন মহিলাদের জন্যও কবর যিয়ারত বৈধ তাদের মতেও মহিলাদের কবরের পাশে বেশি যাওয়া ঠিক নয়।[৩৭]

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, কবর যিয়ারতের সময় এমন কিছু করা যাবে না যার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। কবরের পাশে মাতম করা, মৃতের কাছে কিছু চাওয়া হারাম।

ইসলাম কবুল করেনি এমন কোন আত্মীয় বা অন্য কারো কবর দেখতে যাওয়া বৈধ। তবে তাদের জন্য দোয়া করা যাবে না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করতে গিয়েছিলেন। তিনি চোখের পানি ফেলেছেন। আল্লাহ্‌র কাছে মায়ের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করার অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ অনুমতি দান করেননি। আল্লাহ্ শুধু কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম)[৩৮]

কবর যিয়ারত করতে যাওয়ার পিছনে মৌলিকভাবে দুটি উদ্দেশ্য থাকতে হবে। মৃতের কথা স্মরণ করে যিয়ারতকারী নসীহত হাসিল করা এবং মৃতের জন্য দোয়া করা। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় গভীর রাতে জান্নাতুল বাকীতে চলে যেতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।

জুতা পায়ে দিয়ে কোন কবরের উপর চলাফেরা করা মাকরূহ। আর কবর যিয়ারতের সময় কবর ছোঁয়া, পুণ্যবান কারো কবরে হাত লাগানোকে বরকতময় মনে করা গোনাহ্। এমনকি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মুবারকে সওয়াবের নিয়তে হাত লাগানোও গোনাহ্।

উল্লেখ্য, কারো কবরের দিকে মুখ করে কবরের পাশে নামায পড়া হারাম। অনেক অজ্ঞ মানুষকে দেখা যায়, কোন বুযুর্গ মানুষের কবরের পাশে গিয়ে কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়তে। এটা যদি কবরবাসী থেকে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে হারাম। আর যদি কবরবাসীকে মর্যাদাবান মনে করে সম্মান দেওয়ার জন্য করা হয় তাহলে এটা সুস্পষ্ট শির্ক। আফসোসের বিষয় কোথাও কোথাও কিছু সংখ্যক মুসলমান এ ধরনের অপরাধে নিমজ্জিত। আর কেউ কেউ কবরকে ব্যবসার হাতিয়ার বানিয়ে 'পুঁজি ছাড়া' মুনাফা অর্জন করছে। সাধারণ মানুষ সওয়াবের আশায় সেখানে অর্থ দিয়ে গোনাহ্ উপার্জন করছে। কেউ কেউ মাজারে মোমবাতি মানত করে, প্রদীপ জ্বালায়। অভাবী অনেক মানুষকেও দেখা যায়, নিজের ঘরে প্রদীপ জ্বালাবার অর্থ জোগাড় করতে হিমশিম খায়, অথচ মানত করে মাজারে মোমবাতি দেয়। এ ধরনের মানত পূরণ করা গোনাহ্।

মৃতের জন্য শোক প্রকাশ

মৃত ব্যক্তির জন্য শোক জ্ঞাপন করা নাজায়েয নয়। তবে তা হতে হবে ইসলামের সীমারেখার ভেতর। যেমন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন

www.pathagar.com

পর্যন্ত শোক জ্ঞাপন করতে পারে। এ কারণে স্বামীর মৃত্যুর পর এ সময়ের ভেতর অন্যত্র বিয়ে তার জন্য বৈধ নয়। এ ছাড়া অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশি শোক জ্ঞাপন করা বৈধ নয়। এ শোকের সময় বিলাপ করা, গাল চাপড়ে কাঁদা বৈধ নয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো মৃত্যুর পর গালে হাত চাপড়ে বিলাপ করে, কাঁদতে কাঁদতে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং অজ্ঞ যুগের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের দিকে আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে এখনও জাহিলী যুগের চারটি রীতি-নীতি প্রচলিত আছে- যা তারা ত্যাগ করছে না। সেগুলো হল ঃ ১. বংশ নিয়ে গর্ব করা, ২. অন্যের বংশের প্রতি দোষারোপ করা, ৩. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি চাওয়া এবং ৪. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। তিনি বলেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন দুর্গন্ধযুক্ত চামড়া ও পুঁজরক্ত মিশ্রিত কাপড় পরিয়ে উত্তোলন করা হবে। (মুসলিম)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, লোকদের মাঝে এমন দুটি কাজ প্রচলিত আছে, যা তাদেরকে কুফরীর দিকে ধাবিত করছে। তা হল অন্যের বংশের খুঁত ধরা এবং কারো মৃত্যুকালে বিলাপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে তার জন্য বিলাপ করার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। (বুখারী)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেন, সাধারণত একজনের অপরাধের জন্য অপরকে শাস্তি দেওয়া হবে না। তাহলে মৃত ব্যক্তিকে তার উপর বিলাপের কারণে শাস্তি দেওয়ার কারণ কি? এর জবাব হল, মৃত ব্যক্তিকে তখনই শাস্তি দেওয়া হবে যদি সে অনুরূপ করার জন্য অসিয়ত করে যায়। অথবা মৃত ব্যক্তি জানত তার পরিবারে এমন একটা প্রথা আছে। কিন্তু সে বিলাপ করতে নিষেধ করে যায়নি।

স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক

মৃত ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর শোক প্রকাশ কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্ তাআলা মৃত ব্যক্তির জন্য স্ত্রীর শোক প্রকাশ সম্পর্কে বলেন, "আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হল নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিগত কোন সিদ্ধান্ত নিলে কোন পাপ নেই। তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারে আল্লাহ

www.pathagar.com

অবহিত রয়েছেন। আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে কোন নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজের মনে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ জানেন তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীআত নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নিবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছা কর না। আর এ কথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহ্র তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রাখো আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও দয়াময়।" (বাকারা ঃ ২৩৪-২৩৫)

জাহিলী যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর জন্য এক বছর ইদ্দত পালন অপরিহার্য ছিল। ইসলাম তা কমিয়ে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করে। এ ইদ্দত নির্ধারণের কারণ হল স্বামীর বিচ্ছেদে শোক প্রকাশ ও স্ত্রীর রেহমে স্বামীর কোন সন্তান আছে কিনা তা পরিষ্কার হওয়া। কেননা ইসলাম সন্তানের বংশ পরিচয়ে সংমিশ্রণ পছন্দ করে না।

উল্লেখ্য, যদি কোন স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় মারা যায় বা স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভবতী হবার বিষয় পরিষ্কার হয় তাহলে তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" (তালাক ঃ ৪)

এ সময়ের ভেতর সে অন্য কারো সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। বিশেষ প্রয়োজন (যেমন চাকরি, পড়াশুনা, চিকিৎসা ইত্যাদি) ছাড়া স্বামীর ঘরের বাইরে যাওয়া ভাল নয়। এ সময় সুরমাসহ যে-কোন ধরনের অলংকারাদি ব্যবহার করা ঠিক নয়। স্বামীর শোকে বেশি কান্নাকাটি না করে আল্লাহ্র ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উত্তম। তবে আপনা-আপনি চোখ থেকে যে পানি গড়িয়ে পড়ে তাতে কোন দোষ নেই।

আমাদের সমাজে এ ব্যাপারে কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতপালনকালীন উঁচু কোন ভবনে উঠা ঠিক নয়। কেউ কেউ চাঁদ, তারা দেখার সময় কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে রাখেন। কারো ধারণা, এ সময় নখ কাটা যায় না এবং যে সব স্থানের লোম পরিষ্কার করতে হয় তা পরিষ্কার করা ভাল নয়। কারো ধারণা, চল্লিশ দিন এভাবে থেকে তারপর মিষ্টি জাতীয় জিনিস বণ্টন করে স্বামীর চল্লিশা পালন করতে হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, স্বামীর মৃত্যুর পর সারাজীবন বিধবা থাকতে হয়। এ ধরনের যেসব ধারণা সমাজে প্রচলিত আছে তা সামাজিক কুসংস্কার বৈ কিছুই নয়।

www.pathagar.com

মৃতের জন্য শোকসভা ও কুলখানি করা

মৃত মানুষের জন্য শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন শোকসভা করা মাকরূহ। আরবে এ ধরনের শোকসভার প্রচলন ছিল। মৃতের পরিবার কোন ঘরে একত্রিত হয়ে শোক প্রকাশ করত এবং কবিতা পাঠ করত। নারী পুরুষ এক সাথে মিলিত হয়ে মাতম করত।

আজকের সমাজে মৃতের জন্য কালো পতাকা উত্তোলন, শোকসভা করার প্রচলন আছে। বহু জায়গায় দেখা যায়, কেউ মারা যাবার চল্লিশ দিন পর মৃতের পরিবার খাবারের আয়োজন করে। বিশেষত যারা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করেছে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়। এভাবে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে কুলখানির আয়োজন করা বিদআত। এ কথা ঠিক যে, কেউ মারা গেলে তার জন্য দান-সদকা করা, ফকির-মিসকীনকে খাওয়ানো যায়। তবে এটা কোন নির্দিষ্ট দিনে করা বা বিশেষ আয়োজন করে কুলখানি করা বিদআত। আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পর বা আসহাবে রাসূলের কারো মৃত্যুর পর এ ধরনের শোকসভা বা কুলখানির কোন প্রমাণ নেই।

মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা দান

মৃত মানুষের পরিবার পরিজনকে সান্ত্বনা দান সুন্নাত। একজন ব্যক্তির ছোট ছেলে মারা যাবার পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শুধু কারো মৃত্যুর পর নয়; যে-কোন বিপদ-মুসীবতে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত। অনেক সময় দেখা যায়, যখন কেউ কাউকে সমবেদনা জ্ঞাপন করে তখন ব্যথিত ব্যক্তির মনোবেদনা একটু হালকা হয়।

সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য কোন নির্দিষ্ট শব্দ নেই। যে-কোন ভাষায় সান্ত্বনা দেওয়া যায়। তবে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত বলতেন, "যা দিয়েছেন এবং যা নিয়েছেন সবই আল্লাহর। আর সকল কিছুরই নির্দিষ্ট সময় শেষে তাঁর কাছে যেতে হবে। তাই ধৈর্য ধারণ কর"।[৩৯]

তিনি আবূ সালমার মৃত্যুর পর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের মৃত্যুর পর তাদের নাম ধরে তাদের জন্য এবং তাদের পরিবারের জন্য দোয়া করেছেন।

কেউ মারা যাবার পর তার পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের জন্য খাবার পাঠানোও সুন্নাত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁর পিতা জাফর শাহাদাতবরণ করার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য খাবার পাকাতে অন্যদের বলেছেন।

www.pathagar.com

মৃতের ছেলে-মেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে সোহাগ করাও সান্ত্বনা দেওয়া মুস্তাহাব। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীম সন্তানদের মাথায় মাসেহ্ করতেন। এ সময় মৃতের পরিবারের সাথে মুয়ানাকা না করা ভাল। কেননা মুয়ানাকা করার সময় অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। কেউ যখন কারো সাথে মুয়ানাকা করে তখন মুহাব্বাত বেশি অনুভূত হয়। সে সময় মৃতের কথা স্মরণ করে অনেকের পক্ষে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে কোন হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত নয় যে, মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ানাকা করেছেন। সাধারণত মুয়ানাকা করা হয় কারো সুসংবাদ শুনলে বা অনেকদিন পর দেখা সাক্ষাৎ হলে।

মৃত মানুষের কাছে কিছু চাওয়ার পরিবর্তে দোয়া করা

আমাদের সমাজে কেউ কেউ মৃত মানুষের কবরের পাশে গিয়ে খাজা বাবা বলে চিৎকার করে মনের বাসনা পূরণের আরজু জানায়। ছেলে-সন্তান কামনা করে। এটা সম্পূর্ণরূপে শির্ক। কারণ মৃত ব্যক্তির পক্ষে কারো উপকার বা অপকার করা সম্ভব নয়। কোন মানুষ দুনিয়ার জীবনে যতই পরহেজগার বলে পরিচিত হোন না কেন মৃত্যুবরণ করার পর তার কোন ক্ষমতা থাকবে না। এমনকি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মুবারকের কাছে গিয়েও কোন কিছু তাঁর কাছে চাওয়া ঠিক নয়। কারণ তাঁর পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নয়। আফসোসের বিষয়, অনেককে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। মানুষ প্রার্থনা করবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। কোন মানুষের কাছে কিছু চাওয়ার অর্থ হল, সে সেই জিনিস দিতে সক্ষম। অথচ মৃত মানুষ কাউকে কোন কিছু দিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

মৃত ব্যক্তির কাছে কোন কিছু চাওয়া জঘন্য গোনাহ্। মূলত যিনি মারা যান দোয়ার সবচেয়ে বেশি তাঁরই প্রয়োজন। তাই মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা উচিত। কেননা কেউ মারা গেলে তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি তার জন্য দোয়া করে, এ দোয়া তার কাজে আসে।

মাইয়্যেতের জন্য যা উপকারী

কেউ মারা গেলে তার জন্য যা উপকারী তাই করা দরকার। আফসোসের বিষয় হল, মুসলমানদের কেউ কেউ মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়ে ফুল দেয়। তাদের মৃত্যু বার্ষিকীতে খালি পায়ে পথ চলে, নীরবতা পালন করে, ওরশ করে, এটা সম্পূর্ণভাবে বিদআত। মৃতের জন্য যা উপকারী তা না করে এমন কিছু করা হয় যার জন্য নিজের মৃত্যুর পর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারী বিষয় হচ্ছে ঃ

১. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রবর্তী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা আপনি দয়ালু, পরম করুণাময় (হাশর ঃ ১০) এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা আগে মারা যায় তাদের জন্য পরবর্তীদের দোয়া কাজে আসে।

২. মৃতের নামায রোযা বাকি থাকলে তার কাজা বা কাফফারা আদায় করা। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার রোযা বাকি আছে (ফরয রোযা বা মানতের রোযা), তাহলে তার পক্ষ থেকে তা তার অভিভাবকরা আদায় করবে। (বুখারী) এ হাদীসের আলোকে ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ীর এক মত অনুযায়ী মাইয়্যেতের পক্ষে রোযার কাজা করা যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর আরেক মত অনুযায়ী রোযার কাজা মাইয়্যেতের পক্ষে অন্য কেউ করবে না, বরং মাইয়েত যদি অসিয়ত করে যায়, তাহলে তার জন্য মিসকীনকে খাবার দিবে। তাঁরা দলীল হিসেবে ইবনে উমরের হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কেউ যদি মারা যায় আর যদি তার এক মাসের রোযা বাকি থাকে তাহলে প্রত্যেকদিনের জন্য একজন করে মিসকীন খাওয়াবে।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করা হয় একজনের পক্ষে আরেকজন রোযা বা নামায আদায় করতে পারবে কিনা? তিনি জবাব দেন একজনের পক্ষে আরেকজন রোযা রাখতে পারবে না এবং নামায পড়তে পারবে না।[৪০]

ইমাম মাওরেদী হযরত আয়েশার হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "মৃতের পক্ষে রোযা রাখবে।" অর্থাৎ এমন কাজ করবে যা রোযার স্থলাভিষিক্ত হয়। এর মানে হল তার পক্ষে মিসকীনকে খাবার দিবে। কারো কারো মতে, মানতের রোযা মৃতের পক্ষে অন্য কেউ আদায় করতে পারবে, কিন্তু ফরয রোযা আদায় করতে পারবে না। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, কোন রোযাই মৃতের পক্ষে অন্য কেউ আদায় করতে পারবে না। সকল ধরনের রোযার জন্যই মিসকীনকে খানা দিতে হবে।[৪১]

৩. মৃতের দেনা থাকলে তা পরিশোধ করা। এ সম্পর্কে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪. মৃতের জন্য দান-সদকা ও যে-কোন ধরনের নেক কাজ করা। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একজন ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমার মা মৃত্যুর আগে কুণ্ডলী পাকিয়েছিলেন। তিনি কোন অসিয়ত করতে পারেননি। আমার ধারণা তিনি কথা বলতে পারলে সদকা করতেন। এখন আমি যদি তাঁর জন্য কোন সদকা করি, তিনি কি তার প্রতিদান পাবেন? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ'। (এরপর সে ব্যক্তি তার মায়ের জন্য সদকা করে) (বুখারী)। অনুরূপভাবে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমার পিতা মারা গেছেন। তিনি সম্পদ রেখে গেছেন, কিন্তু কোন অসিয়ত করে যাননি। আমি কি তার পক্ষে সদকা করলে তাঁর গুনাহের কাফফারা হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন 'হ্যাঁ'। (মুসলিম)

এ ধরনের আরো অনেক হাদীস আছে যা এ কথারই প্রমাণ করে যে, মৃত মানুষের পক্ষে দান-সদকা করলে তা তার আমলনামায় যোগ হয়। অবশ্য আলেমগণের কারো কারো মতে, শুধু সন্তানের সদকাই তার পিতা বা মাতার সওয়াবের সাথে যোগ হবে। তাঁরা দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন, আল্লাহর বাণী, "মানুষ তাই পায় যা সে করে।" (নাজম ঃ ৩৯)

এ আয়াতের আলোকে তাঁরা বলেন, সন্তান-সন্ততি মৃত ব্যক্তির জন্য যাই সদকা করে তাও তার আমলের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া অন্য মানুষের দান-সদকা করা তার আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু ইমাম নববী বলেন, দান-সদকা ও নেক আমল যে-কেউ যে-কোন মাইয়্যেতের জন্য করতে পারে। এটাকে সন্তানের সাথে নির্দিষ্ট করা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোন দলীল নেই।

মৃত্যুর পরও সওয়াব পেতে হলে

মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমল করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তার পক্ষে মসজিদে যাওয়া, হজ্জ করা, দান-খয়রাত করা সম্ভব হয় না। দুনিয়ার জীবনে যে আমল করেছে তার ভিত্তিতে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে। দুনিয়ার জীবনে কেউ কোন সমস্যায় থাকলে একে অপরকে সাহায্য করা যায়। কারো কিছুর দরকার হলে একে অপরের কাছ থেকে নেওয়া যায়। মৃত্যুর পর আর এ সুযোগ থাকবে না। কিন্তু সে সময়ই মানুষের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা দরকার।

মানুষ মারা যাবার পর তার সরাসরি আমল করার সুযোগ না থাকলেও কয়েকভাবে তার আমলনামায় ভাল বা মন্দ কাজ যোগ হয়। কেউ যদি দুনিয়াতে

www.pathagar.com

কোন নেক কাজ করে যায়, যেমন কোন মাদ্রাসা বা মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে মৃত্যুর পরও সে সওয়াব পাবে। আর যদি কোন খারাপ কাজ করে, যেমন সিনেমা হল বা মদের দোকান-কারখানা করে তাহলে মৃত্যুর পরও তার আমলনামায় গোনাহ্ যোগ হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আমি মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি।" (ইয়াসীন ঃ ১২)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, মানুষ যে কীর্তি রেখে যায় তার প্রতিফল মরণের পরও আমলনামায় যোগ হয়। খারাপ কীর্তি রেখে গেলে খারাপ প্রতিফল আর ভাল কীর্তি রেখে গেলে ভাল প্রতিফল পায়। কেউ যদি কোন ভাল কাজের প্রচলন করে তাহলে তার পরবর্তীতে যারা ঐ ভাল পথের অনুসরণ করবে প্রথম প্রচলনকারী ব্যক্তি তার সওয়াব পাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন খারাপ কিছুর প্রচলন করে তাহলে যতজনই সেই খারাপ পথে চলবে প্রথম প্রচলনকারী তার জন্য গোনাহ্ পাবে। এ কারণে বলা হয় হযরত আদম (আ)-এর ছেলে কাবিল পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকারী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড হবে তার গোনাহের একটা ভাগ তার আমলনামায় যোগ হবে। তাই জীবিত অবস্থায় এমন কোন খারাপ কাজ করা উচিত নয় যার খারাপ প্রতিফল মরণের পরও ভোগ করতে হবে। কেউ যদি কখনও এমন কোন কিছু করে থাকে পরবর্তীতে তার কাছে সত্য পরিস্ফুটিত হলে খারাপ কাজটি বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রত্যেক মানুষেরই এমন কিছু রেখে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত যা তার মরণের পরও তার জন্য উপকারী হবে। যার জন্য তার আমলনামায় সওয়াব যোগ হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায়, তখন আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনভাবে মানুষের আমলের সাথে সওয়াব যোগ হয়। সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম আর নেক সন্তান যে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে। (বুখারী ও মুসলিম)

সদকায়ে জারিয়া

আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে জনগণের কল্যাণে কোন নেক কাজ করা। যেমন ইয়াতীমখানা, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট করা, পুল, কালভার্ট স্থাপন, রাস্তার পাশে গাছ লাগানো, ইসলামী সংগঠন বা সংস্থা কায়েম ইত্যাদি। এসব কাজ যারা করবে তারা মৃত্যুর পরও সওয়াব পাবে। আর এ সওয়াব ততদিন যোগ হতে থাকবে যতদিন এসব কিছু অবশিষ্ট থাকবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকে অনেকেই অঢেল সম্পদ রেখে মারা যান। কিন্তু জনকল্যাণে নেক কোন কাজই করে যান না। তাই তাদের এ অঢেল সম্পদ

www.pathagar.com

মরণের পর কোন কাজে আসে না। বরং অনেক সময় দেখা যায়, তার রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়ারিশরা পাপ কাজে লাগায়। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত অবস্থায় বেশি বেশি সদকা করতে বলেছেন।

আমরা যারা বেঁচে আছি প্রত্যেকেরই প্রতিদিন আত্মসমালোচনা করা উচিত। আমি আখিরাতের জন্য সদকায়ে জারিয়ার কোন কাজ করছি কিনা? আখিরাতের জন্য কি পুঁজি প্রেরণ করছি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করে তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তাআলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্ তাআলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য-ফাসিক।" (হাশর ঃ ১৮-১৯)

নেক সন্তান

যেসব সন্তান মাতা-পিতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে তাদের দোয়া মাতা-পিতার গুনাহ মাফের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কোন কোন নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উঁচু করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে, পরওয়ারদেগার! আমাকে এই মর্তবা কিভাবে দেওয়া হল? আমার আমল তো এ পর্যায়ের ছিল না। উত্তরে আল্লাহ্ বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য দোয়া করেছে এটা তারই ফল।" (মুসনাদে আহমদ)। যারা নেক সন্তান রেখে মারা যান তাদের সন্তানরা সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করে, "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি ছাগীরা" (হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতার উপর রহম কর, যেমনিভাবে তাঁরা ছোট বেলায় আমাদের উপর রহম করেছেন)।

আফসোসের বিষয় হল, মুসলমানদের কেউ কেউ এমন সন্তান রেখে মারা যান, যারা পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার মানসিকতাও রাখে না। কিংবা কুরআনের এতটুকু জ্ঞান নেই যে, দু'একটি সূরা পড়ে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে পারে। দুনিয়ার অনেক কিছু তারা জানে, কিন্তু কুরআনের দু'চারটি সূরা পর্যন্ত বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করতে জানে না। তারা সারাবছর মৃত পিতা-মাতার জন্য নিজেরা কিছুই করে না। কিন্তু পিতা-মাতার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ভাড়া করা পাঠকদের দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করিয়ে হাদিয়া পাঠানোকেই নেকীর কাজ মনে করে। অথচ মৃত্যুবার্ষিকী পালন কিংবা ভাড়া করে দোয়া দরূদ করা সম্পূর্ণভাবে বিদআত।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, যে কেউ কোন মুসলিম ভাই বা বোনের জন্য স্বেচ্ছায় দোয়া করতে পারেন। এ দোয়াও মৃতব্যক্তির জন্য কল্যাণকর। কিন্তু টাকা পয়সার বিনিময়ে দোয়া করানো ঠিক নয়। আর ছেলে সন্তান মৃত্যুবার্ষিকীর পরিবর্তে প্রতিদিনই অন্তত দু'একটি সূরা তিলাওয়াত করে যদি দোয়া করে, তা কবরবাসী পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের রূহের মাগফিরাতের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এ কারণে প্রত্যেকেরই উচিত, আপন ছেলে সন্তানকে ভালভাবে গড়ে তোলা। আল্লামা আলবানী বলেন, নেক সন্তান যেই নেক আমলই করবে তার সওয়াব তার পিতা-মাতা পাবে। যদিও সন্তান পিতা-মাতার জন্য সওয়াবের নিয়ত না করে। যেমন কেউ কোন ফল গাছ রোপণ করল। সে মারা যাবার পর তার ফল যারাই খাবে, যিনি গাছ লাগিয়েছেন তিনি সওয়াব পাবেন। যারা ফল খেল তারা দোয়া না করলেও গাছ লাগানোর সওয়াব আমলনামায় আল্লাহ যোগ করে দিবেন। অনুরূপভাবে নেক সন্তান যাই নেক আমল করবে তার সওয়াব পিতা-মাতা পাবে। এতে ছেলে-সন্তানের নেকীর কোন কমতি হবে না।

আমরা যারা বেঁচে আছি, আমাদের সকলকে ভাবা দরকার, আজ যদি আমার মা বা বাপ বেঁচে থাকতো, তাঁর সাথে কত কথাই বলতাম। তাঁর জন্য কত কিছুই কিনতাম। তাঁরা মারা যাবার কারণে তাঁদের সাথে কথা বলার সুযোগ নেই। কিন্তু দোয়া করার সুযোগ আছে। তাঁদের জন্য কোন কিছু কেনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দান-সদকা করে তাঁদের জন্য হাদিয়া পাঠানোর প্রয়োজন আছে।

উপকারী ইলম

ইলম দু'প্রকার। এক প্রকারের ইলম, যা অর্জনকারীর জন্য আখিরাতে উপকারী হবে। আরেক ধরনের ইলম, যা আখিরাতে কোন কাজে আসবে না। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার যে, অনেকেই মনে করেন দীনী ইলম তথা কুরআন হাদীস পড়াই উপকারী ইলম। আর সাধারণ বিষয়াদি পড়াতে সওয়াব নেই। বিষয়টি পুরোপুরি ঠিক নয়। হ্যাঁ, কুরআন পড়া সওয়াবের কাজ। কুরআনের প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতে কম-সেকম দশ নেকী আছে। অন্য বিষয়াদির ভাষাগত দিক থেকে কোন সওয়াব নেই। আবার এ কথাও মনে রাখতে হবে, কেউ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে কুরআন শেখে তাহলে সে সওয়াব পাবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি দীনের প্রয়োজন পূরণের জন্য সাধারণ বিষয়াদি পড়াশুনা করে সেও সওয়াব পাবে।

দীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন সকলের জন্য ফরয। এরপর মুসলমানদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগে পারদর্শী হতে হবে। এটা ফরজে কিফায়াহ। এ

www.pathagar.com

পারদর্শী হবার জন্য যে বিষয়েই পড়াশুনা করা হোক না কেন আল্লাহ্ তাআলা সওয়াব দান করবেন। সকলকে খেয়াল রাখতে হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পড়াশুনা আর দীনের প্রয়োজন পূরণের জন্য পড়াশুনার মধ্যে পার্থক্য আছে। দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হলে, সে জ্ঞান চর্চায় যিনি যতটুকু সময় দিবেন আল্লাহ্ তার জন্য নেকী দান করবেন। এ ধরনের জ্ঞান চর্চাকারী সমাজে যে অবদান রাখেন তা তার মরণের পরও কাজে আসবে।

মূলত সে ইলমই উত্তম যা মরণের পরও কাজে আসে। কেউ যদি আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে দীন শেখায়, সে সওয়াব পাবে। যাকে ইলমে দীন শেখালো সে যদি অন্য কাউকে শেখায় এটার জন্যও সে সওয়াবের একটা অংশ পাবে। আবার কেউ যদি কোন কিতাব বা বই রচনা করে যান তাহলে তিনি এটার জন্য সওয়াব পাবেন। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ এ বই পড়ে হেদায়াতের পথে চলার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা লাভ করলে, লেখক এর জন্য সওয়াব পাবেন। অনুরূপভাবে কেউ যদি ইসলামের স্বার্থে কোন প্রযুক্তি আবিষ্কার করে যান, তিনি এটার জন্য মৃত্যুর পরও সওয়াব পাবেন। আর যারা অডিও-ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে দীনের বয়ান বা ইসলামী গান বা অন্যকিছু রেখে যান তাঁরাও মৃত্যুর পর সওয়াব পাবেন। ক্যাসেট শুনে কেউ উপকৃত হলে এটার জন্য আল্লাহ্ তাআলা সওয়াব দান করবেন।

এভাবে অর্জিত জ্ঞান যদি নেক কাজে ব্যয় হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা সওয়াব দান করবেন। আর যদি খারাপ কাজে ব্যয় হয়, তাহলে আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি দান করবেন। মূলত পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য এ ধরনের জ্ঞানপাপীরাই দায়ী। এ কথা ঠিক, জ্ঞানীরাই পৃথিবীকে গড়ার জন্য অনেক অবদান রাখেন। আবার পৃথিবী ধ্বংস করার ক্ষেত্রেও এক শ্রেণীর জ্ঞানপাপীরাই দায়ী। যেসব জ্ঞানীরা মানব সমাজের কল্যাণে অবদান রেখে যান তাঁরা মৃত্যুর পরও এর প্রতিফল পাবেন। আর যাদের জ্ঞান, আবিষ্কৃত প্রযুক্তি মানব সমাজের অকল্যাণে ব্যয় হয় তারা এর খারাপ প্রতিফল মৃত্যুর পরও লাভ করবে। এ কারণে যারা জ্ঞান চর্চা করছেন তাদেরকে সবসময় চেষ্টা করতে হবে তাদের জ্ঞান যেন আল্লাহ্র দীনের কাজে লাগে। লব্ধ জ্ঞান দ্বারা মানব কল্যাণ, দীনের প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখা দরকার। এভাবে যারাই লব্ধ জ্ঞান দ্বারা স্থায়ী অবদান রেখে যান, তাঁরাই মৃত্যুর পর সওয়াব পাবে। আর এ ধরনের উপকারী জ্ঞান লাভের জন্যই সবাইকে চেষ্টা করতে হবে।

এখন আমাদের ভাবা দরকার, আমরা দুনিয়ার একটু সুখের জন্য কত কিছু করি। বাড়ি, গাড়ি, দালানকোঠা সবই তো একটু আরামে থাকার জন্য। যে দুনিয়াতে সুখের জন্য মানুষ এত কিছু করে তারপরও অনেকেই সুখ পায় না।

www.pathagar.com

এমন অনেকেই আছেন যাদের অঢেল সম্পদ আছে। কিন্তু তিনি কিছুই খেতে পারেন না। স্যালাইনের মাধ্যমেই খাবার দিতে হয়। আবার কেউ কেউ আছেন, সুন্দর খাট, নরম তোশক, আরামদায়ক বিছানা থাকা সত্ত্বেও ঘুম আসে না। তারা দুনিয়ার সুখের জন্য যত অর্থ ব্যয় করেন সে তুলনায় আখিরাতের সুখের জন্য কিছুই ব্যয় করেন না। অথচ দুনিয়ার জন্য যা ব্যয় করে তা মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। আর আখিরাতের জন্য যা ব্যয় করে তা মৃত্যুর পর সঙ্গী হয়। এমনকি কঠিন বিপদ সংকুল মুহূর্তে তার নাজাতের উসিলা হতে পারে। তাই আমাদেরকে বেশি বেশি সদকায়ে জারিয়ার কাজ করা দরকার। আর সন্তান-সন্ততিকে দীনের পাবন্দ বানানোর চেষ্টা করা উচিত। অর্জিত জ্ঞান পার্থিব স্বার্থে যেন ব্যয় না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। দুনিয়াতে দুনিয়া লাভের জন্য নয়, দুনিয়াতে বসে আখিরাতের সুখের জন্যই কাজ করতে হবে।

মূলত বুদ্ধিমান মানুষেরা দুনিয়াতে যতটুকু সময় পান তা আখিরাতের সুখের জন্যই কাজে লাগান। এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সেই বুদ্ধিমান যে নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সাফল্যের জন্য আমল করে।" দুঃখের বিষয়, আজকে আমরা তাকেই বুদ্ধিমান মনে করি যে ছল-চাতুরি করে, অপরকে ঠকিয়ে বেশি উপার্জন করতে পারে। আর তাকে বোকা মনে করা হয়, যে দুনিয়াতে খুব বেশি সম্পদ করতে পারে না, চালাকি করে মাল-দৌলত করতে সক্ষম হয় না। অথচ হাদীসে রাসূলের আলোকে সেই বুদ্ধিমান, যে আখিরাতের জন্য বেশি বেশি নেক আমল করে।

কবরে লাশ পচে যাওয়া

কবরে প্রায় সবারই লাশ পচে যায়। একমাত্র নবী ও রাসূল ছাড়া সবার লাশ মাটির সাথে মিশে যায়। কিন্তু পিঠের একটি হাড় আছে যা মাটি খেতে পারে না। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, "মানুষের শরীরে এমন একটি হাড় আছে যা মাটি কখনও খেতে পারবে না।"[৪২]

আরেক হাদীস থেকে জানা যায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই হাড়ের সাথে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়ে আবার মানুষকে সৃষ্টি করবেন। অবশ্য অনেক শহীদের লাশ এমনকি অন্য কোন মানুষের লাশও মৃত্যুর অনেক বছর পর অবিকল পাওয়া যাবার অনেক ঘটনা বিদ্যমান। এ ধরনের ব্যতিক্রম ছাড়া সবারই লাশ পচে যায়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

কিয়ামত বা মহাপ্রলয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দুনিয়ার সকল কিছু একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার ভেতর পরিচালিত হল।[৪৩] চাঁদ, সুরুজ, গ্রহ-নক্ষত্র সবই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের আওতায় চলছে। যেদিন এসব কিছু বর্তমান নিয়মে পরিচালিত হবে না, সেদিনই কিয়ামত হবে। কিয়ামত সংঘটিত হবে মুহূর্তের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না, শুধু এতটুকু সময় মাত্র লাগবে যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে। অথবা তার চেয়েও কম। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (নাহল ঃ ৭৭)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীর সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে। বর্তমানেও আমরা ভূমিকম্পে অনেক শহর মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখি। আমাদের চোখের সামনে অনেক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। এসব কিছু প্রত্যক্ষ করার পর আমাদের বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয় যে, যিনি ভূমিকম্পের মাধ্যমে বিরাট শহর ধ্বংস করতে পারেন, তাঁর পক্ষে সারা পৃথিবী মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করা কঠিন বিষয় নয়।

ইস্‌রাফীলের শিঙ্গা ফুঁক

কেয়ামতের দিন ইস্রাফিলের শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবীর সবকিছু উলট পালট হয়ে যাবে। আর সে শিঙ্গা ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে কিয়ামত সংঘটিত হবে। শিঙ্গা কিসের তৈরি এবং কিভাবে এর শব্দ এক মুহূর্তে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাবে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। যদিও আলোর গতি ও শব্দের গতি হিসাব করলে শিঙ্গা ধ্বনি মহাবিশ্বের সর্বত্র পৌঁছতে কোটি কোটি বছরের প্রয়োজন হওয়ার কথা, কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাৎক্ষণিকভাবে এ আওয়াজ সর্বত্রই পৌঁছে যাবে।

এ শিঙ্গা ফুঁক তিনবার হবে। প্রথম শিঙ্গা ফুঁকে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই মারা যাবে, এমনকি আযরাঈল ও ইস্‌রাফীল (আ) ও এ ফুঁক দেওয়া অবস্থায় মারা যাবে এবং ইস্‌রাফীল সবার আগে পুনরুজ্জীবিত হয়ে তৃতীয় ফুঁক দিবে। এ শিঙ্গা ধ্বনি শুনার পর সবাই হাশরের মাঠের দিকে দৌড়াতে থাকবে।[৪৪]

কারো কারো মতে শিঙ্গা ধ্বনি দু'বার দেওয়া হবে। প্রথমবার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সকল প্রাণী মারা যাবে আর দ্বিতীয়বার পুনরুজ্জীবিত হবে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

www.pathagar.com

১. 'নাফাখাত আল ফাযা'-ভয়াল অবস্থাজনক ফুৎকার

এ শিঙ্গা ধ্বনি শুনে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে সূরা আল মুদ্দাস্‌সিরের ৮-৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন হবে কঠিন দিন।" সত্যি কিয়ামতের দিন হবে কঠিন। এ দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সে দিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা দিবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারো মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালক বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে। (মাআরেফুল কুরআন ঃ সূরা আল মুয্‌যাম্মিলের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

এ দিন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে আসমান-জমিনে যারাই আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।" (যুমার ঃ ৬৮)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, এ শিঙ্গার আওয়াজ শুনার পর সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়লেও কেউ কেউ মূর্ছিত হবেন না। তবে কারা মূর্ছিত হবেন না এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। হাদীস থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মানুষ শিঙ্গায় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে যাবে। অতঃপর আমি প্রথম চেতনা লাভ করে দেখব যে, মুসা (আ) আরশের এক প্রান্ত ধরে আছেন। আমি এটা অবগত নই যে, তিনি অচেতন হয়ে পুনরায় আমার আগে চেতনা লাভ করবেন; না আল্লাহ্ যাদেরকে অচেতন হওয়া থেকে রক্ষা করবেন তিনি তাদের মধ্যে একজন।" (বুখারী ও মুসলিম)

২. নাফাখাত আস সা'আক-প্রলয়-ফুৎকার

এ শিঙ্গার পর সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব থাকবে। এ প্রসঙ্গে সূরা আর রাহমানে এভাবে ইরশাদ হয়েছে, "বিশ্বে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর একমাত্র তোমার প্রতিপালকই অবশিষ্ট থাকবেন, যিনি মহীয়ান ও গরীয়ান।" (রাহমান ঃ ২৬-২৭)

এ প্রসঙ্গে সূরা ইয়াসীনের ২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "বস্তুত এ ছিল এক মহানাদ। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।" এ শিঙ্গা ফুঁক দেওয়ার পর মহাবিশ্ব, সৌরজগতের বর্তমান নিয়ম-শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কথাই আল্লাহ্ কুরআনে এভাবে ইরশাদ করেছেন, "যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। একটিমাত্র ফুৎকার। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষীপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।"[৪৫]

অর্থাৎ এ শিঙ্গা ধ্বনির সাথে সাথেই পৃথিবী তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

৩. নাফাখাত আল কিয়াম উত্থান-ফুৎকার

এ শিঙ্গা ধ্বনির পর ফেরেশতাদের আহ্বানে সকলে হাশরের ময়দানের প্রতি দৌড়াতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে সূরা আন নাবার ১৮-২০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে। এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। অনুরূপ কথা সূরা আন নাযেয়াতে ইরশাদ হয়েছে, এটা তো কেবল এক মহানাদ -তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে।" (নাযিয়াত ঃ ১৩-১৪)

সূরা ইয়াসীনে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল। রহ্মান আল্লাহ্ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন।" (ইয়াসীন ঃ ৫১-৫২)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল কিয়ামাতের, ভয়াবহতা অবলোকন করে আল্লাহ্র নাফরমান বান্দারা বলতে থাকবে কবরে তো ভালই ছিলাম, কে আমাদের জাগাল? যদিও কাফিরদেরকে কবরেও আযাব দেওয়া হবে তবু কিয়ামতের তুলনায় কবরের আযাব কিছুই মনে হবে না। সে সময় আল্লাহ্র নেক বান্দারা বলবে, আল্লাহ তো এ কিয়ামতের কথা আগেই জানিয়েছিলেন। রাসূলগণ এ সত্য সংবাদই আমাদের দিয়েছেন। কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অনেক বর্ণনা এসেছে।

কিয়ামতের কতিপয় চিত্র

পৃথিবী হঠাৎ করেই প্রকম্পিত হবে

আমরা দুনিয়াতে স্থিরভাবে বসবাস করার জন্য আল্লাহ্ দুনিয়াকে টলটলায়মান করে রাখেননি। পৃথিবী যদি সবসময় কাঁপতো তাহলে মানুষ চলাফেরা করার সময় পড়ে যেতো। যেমন মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হলে মানুষ পড়ে যায়। আহত হয় কিংবা অনেকে মারা যায়। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যেদিন পৃথিবী এত আরামদায়ক থাকবে না। পৃথিবী হঠাৎ করেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেবে। যেমন সূরা যিলযালে উল্লেখ আছে' "যখন পৃথিবীকে ঝাঁকুনি দিয়ে তার প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে। (তখনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে) এবং পৃথিবী (তার ভেতরে লুকিয়ে রাখা রেকর্ডপত্র ও গচ্ছিত সম্পদসহ) তার সবকিছু বের করে দিবে। তখন মানুষেরা (হতভম্ব হয়ে) বলতে থাকবে, এর হয়েছোটা কি? (সে তার অভ্যন্তরের সবকিছুকে উগলে দিচ্ছে কেন?) সেদিন (জমিন তার ভেতরে

www.pathagar.com

লুকিয়ে রাখা সব তথ্য এক এক করে) খুলে বর্ণনা করবে। (কেননা) তাকে তার সৃষ্টিকর্তাই এ (কাজের) আদেশ দিবেন। সেদিন সমগ্র মানবসন্তান দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে, যাতে করে তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের নথিপত্র (ভাগে ভাগে) দেখানো যায়।" (যিলযাল ঃ ১-৫)

এ আয়াতসমূহের আলোকে বুঝা যায়, আমরা দুনিয়াতে যা কিছু করি না কেন আখিরাতে কোন কিছুই লুকিয়ে রাখার সুযোগ নেই। কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, ভিডিও ক্যামেরাতে যেমনিভাবে সব কিছু হুবহু উঠে যায়, তেমনিভাবে দুনিয়াতে যা কিছু করা হয় তা ভিডিও হয়ে যাচ্ছে। আর জমিন হল টেপ রেকর্ডারের মত। আমরা যে সব কথা বলি, সবই টেপের মত জমিন ধারণ করে।

পাহাড়-পর্বত তুলার মত উড়তে থাকবে

দুনিয়াতে পাহাড় পর্বতকে বেশ শক্ত মনে হয়। সমতল ভূমিতে মাটি খনন করা যত সহজ সে তুলনায় পাহাড় খনন করা সহজ নয়। এ পাহাড়কে আল্লাহ পেরেক স্বরূপ দিয়েছেন। এ কারণে দেখা যায়, পৃথিবীর যেসব এলাকায় ভূমিকম্প বেশি হয় সেসব স্থানে পাহাড়-পর্বত তুলনামূলকভাবে বেশি। দুনিয়াতে পাহাড় বেশ শক্ত মনে হলেও কিয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বত সবকিছু তুলার মত উড়তে থাকবে। কোন কিছুর অস্তিত্ব বাকি থাকবে না।

এ প্রসঙ্গে সূরা আল কারিয়াতে এভাবে বিবরণ এসেছে, "এক মহাবিপর্যয় সৃষ্টিকারী দুর্যোগ। কি সে মহাদুর্যোগ? তুমি কি জানো সে মহাদুর্যোগটা কি? এ (এমন এক দুর্ঘটনার দিন), যেদিন মানুষগুলো পতঙ্গের মত (ইতস্তত) বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। পাহাড়গুলো রঙ-বেরঙের ধুনিত তুলার মত (চারদিকে) উড়তে থাকবে। (কারিয়া ঃ ১-৫)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেল, আমাদের চোখের সামনে আমরা যা কিছু দেখছি তা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু ধ্বংসই হবে না, তুলার মত অকাশে উড়তে থাকবে।

সাইয়েদ কুতুব এ সূরার তাফসীরে লিখেন, এখানে যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তা একটা ভয়াল দৃশ্য। তার লক্ষণ ও প্রক্রিয়া মানুষ ও পাহাড়-পর্বতের উপর বিস্তৃত। মানুষ যত বেশিই হোক, এ ঘটনার পটভূমিতে তাদেরকে ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে হয়। তারা বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়। পতঙ্গ যেমন দায়িত্বহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে ভয়ে দিশাহারা হয়ে নিজের ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়, কোন্‌দিকে সে যাবে এবং কোথায় তার গন্তব্য তা সে জানে না, কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। আর যে পাহাড়-পর্বত একদিন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা হবে ধুনা পশমের ন্যায়। বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে এবং তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে।

www.pathagar.com

কিয়ামত সম্পর্কে অনুরূপ কথা সূরা আল মুয্‌যাম্মিলের ১৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে। আল্লাহ্‌ বলেন, "যেদিন পৃথিবী, পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ।"

সূরা আল ওয়াকিয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "আর পাহাড়গুলোকে এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেওয়া হবে যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।" (ওয়াকিয়া ঃ ৫-৬)

সূরা হাক্কাহতে সেদিনের বর্ণনা এভাবে এসেছে, "এবং পৃথিবী ও পর্বতমালাকে উপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। সেদিন সেই সংঘটিতব্য ঘটনাটি ঘটবে।" (হাক্কাহ্‌ ঃ ১৪-১৫)

আসমান ও জমিন টুকরো টুকরো হবে এবং লুক্কায়িত সব রেকর্ড বাইরে ফেলে দেবে

আজকে আমরা বিশাল আকাশ ও বিস্তৃত জমিন দেখতে পাই। এ আসমান ও জমিন একদিন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আর জমিন তার ভেতরে লুক্কায়িত সবকিছু বাইরে ফেলে দেবে।

সূরা আল ইনশিকাকে এ প্রসঙ্গে এভাবে উল্লেখ আছে, "যখন আসমান ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আসমান তার মালিকের আদেশটুকু পালন করবে। (আর আনুগত্যের) এই কাজটিই তো তার মালিকের জন্য করা উচিত। যখন এই ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে। (তার মধ্যে যত মানব দেহ ও তাদের কার্যাবলির রেকর্ড লুকিয়ে ছিল মুহূর্তের মধ্যেই) সে সবকিছুকে (বাইরে) ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে।" (ইনশিকাক ঃ ১-৪)

এ সূরা থেকে জানা গেল, পৃথিবীর সূচনা থেকে যত কিছু পৃথিবীর উদরে লুপ্ত ছিল, যার অনেকগুলোর হাদিস মানুষ কোন দিনই পায়নি। সে সবগুলো বের হয়ে আসবে। পৃথিবীতে অনেক ধাতব পদার্থ আছে যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করতে পারবে না। কিয়ামতের দিন সেসব কিছু পৃথিবী ছুঁড়ে ফেলবে। এ আয়াত থেকে আরো বুঝা যায়, মানুষের গোপন সব রেকর্ডপত্র সেদিন উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। মানুষ জমিনে অনেক পাপ কাজ করে যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। জমিনে গোপন ও প্রকাশ্য, ভাল ও মন্দ সব কাজের রেকর্ড সংরক্ষিত হয়। তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়, এখানে আখবার বলতে সেসব আমল বুঝানো হয়েছে যা জমিনের উপর একজন মানুষ বা কোন জাতি করেছে।[৪৬]

আসমান কাঁপতে থাকবে ও বিগলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে

আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, কি বিশাল আসমান। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই আকাশের নীলিমা চোখে পড়ে। এ বিশাল আসমান সেদিন থর থর

www.pathagar.com

করে কাঁপতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "সেদিন আসমান থরথর করে কাঁপতে থাকবে। আর পর্বতসমূহ স্থানচ্যুত হবে।" (তূর ঃ ৯-১০)

এ বিশাল আসমান শুধু থর থর করে কাঁপবে না, বরং বিগলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "সেদিন আসমানসমূহ বিগলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে।" (মাআরিজ ঃ ৮)

চন্দ্র ও সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে

আমরা চাঁদের আলো ও সূর্যের কিরণ ভোগ করি। চাঁদ ও সূর্য পৃথিবী আলোকিত করে রাখে। কিন্তু একদিন চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ থাকবে না। সূর্যের প্রখর তাপ লোপ পাবে। যেদিন চাঁদ-সূর্যের আলো বিলীন হয়ে যাবে সেদিনই কিয়ামত হবে।

এ প্রসঙ্গে সূরা আল কিয়ামাতে আল্লাহ্ বলেন, "মানুষ কি মনে করে আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? পরন্তু আমি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। বরং মানুষ তার ভবিষ্যৎ জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়। সে প্রশ্ন করে কিয়ামত কবে হবে। যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, পলায়নের জায়গা কোথায়? না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। (কিয়ামাহ ঃ ৩-১২)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেল যে, চন্দ্র ও সূর্যের আলো আমরা লাভ করি তা একদিন থাকবে না। বিজ্ঞানীরাও এ তত্ত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, সূর্য ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে নিভে যাচ্ছে। তারকাদের অনেকেই এখন পোড়া কয়লা মাত্র। বিশ্বের সর্বত্রই তাপের মাত্রা কমে আসছে। পদার্থ বিকীর্ণ হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কর্মশক্তি মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে বিশ্ব এভাবে তাপ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হবে। অনেক কোটি বছর পরে বিশ্ব যখন এরূপ অবস্থায় পৌঁছবে, তখন প্রকৃতির সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। (মহাগ্রন্থ আল কুরআন কি ও কেন ঃ পৃষ্ঠ ৪১)

সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে

আমরা বর্তমানে সমুদ্রে পানি দেখতে পাই। এ সমুদ্রে হরেক রকমের মাছ থাকে। নানা ধরনের সুস্বাদু মাছ সমুদ্র থেকে ধরে আমরা খাই। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন সমুদ্রে পানি থাকবে না। সমুদ্রের পানি আগুনে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তাআলা সে দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "(তোমরা সে সময়কে স্মরণ কর) যখন নদী, সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে।" (তাকভীর ঃ ৬)

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, পানিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ আছে। এ পানি থেকেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বর্তমানে আমরা পানি পান করি। আগুন নিভানোর কাজে ব্যবহার করি। কিন্তু কিয়ামতের দিন এ পানিই আগুনে পরিণত হবে।

সেদিন প্রত্যেকে নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা স্মরণ করবে না

দুনিয়াতে মানুষ পরস্পর মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ। স্ত্রীর জন্য স্বামীর মহব্বত, ছেলে-সন্তানের জন্য মাতা-পিতার মহব্বত, আর মাতা-পিতার জন্য সন্তানের মহব্বত মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। দুনিয়াতে বিপদ-আপদে একে অপরকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করে। একে অপরের কথা স্মরণ রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন কেউ কারো কথা স্মরণ করবে না। প্রত্যেকে নিজের নফস নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

এ প্রসঙ্গে সূরা আবাসায় এভাবে বর্ণনা এসেছে, "অবশেষে যেদিন (সেই বিকট আওয়াজ আসবে। (সেদিন সে বুঝবে হিসাব-নিকাশের পালা শুরু) মানুষেরা সেদিন আপনজনদের কাছ থেকে পালাতে থাকবে। (পালাবে) নিজের ভাই থেকে। নিজের মা-বাপ থেকে। স্ত্রী (এমনকি) ছেলে-মেয়েদের থেকেও (মানুষ সেদিন পালাতে থাকবে।) (সেদিন মানুষ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যে, তারা তাদের নিজেদের কথা ছাড়া অন্য কারো কথাই ভাববে না)।" (আবাসা ঃ ৩৩-৩৭)

এ আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল, যে স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের মহব্বতে আমরা কিয়ামতের কথা ভুলে যাই, সেদিন তাদের কারো কথাই মনে থাকবে না। প্রত্যেকে ইয়া নফসী, ইয়া নফসী করবে। সেদিনের বিবরণ সূরা হাজ্জ এভাবে এসেছে, "সেদিনের অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদানকারিণী নিজের স্তন্যদানরত সন্তান রেখে পালিয়ে যাবে। ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে। তখন লোকদের তুমি মাতালের মত দেখতে পাবে, কিন্তু তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আল্লাহর আযাব এতদূর ভয়াবহ হবে। (হাজ্জ ঃ ২)

কিয়ামত কবে হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন

কিয়ামত কবে হবে কেউ বলতে পারবে না। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী সন্তান প্রসব ও গর্ভধারণ করে না।" (হা-মীম সাজদা ঃ ৪৭)

কিয়ামত কবে হবে এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ সম্পর্কে জানেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কবে হবে? বলে দিন এর

www.pathagar.com

খবর তো আপনার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে তিনি তা পরিষ্কারভাবে দেখাবেন।" (আরাফ ঃ ১৮৭)

তবে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, কিয়ামতের পূর্বে কিছু নিদর্শন দেখা যাবে।

কিয়ামতের নিদর্শন

কিয়ামত সংঘটিত হবার আগে কিছু নিদর্শন দেখা যাবে। এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ বলেন, "তারা কি শুধু এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, কিয়ামত তাদের কাছে হঠাৎ এসে পড়ুক। বস্তুত কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কিভাবে?" (মুহাম্মদ ঃ ১৮)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কিয়ামতের আগমন হঠাৎ হলেও তার আগে কিছু নিদর্শন দেখা যাবে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের আগে কিছু ছোট নিদর্শন এবং কিছু বড় নিদর্শন দেখা যাবে।

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, ইলমের ঘাটতি, নগ্নতা ও উলঙ্গপনা, ফিৎনা-ফাসাদের বিস্তার, অশ্লীলতার সয়লাব, হত্যাকাণ্ড, ভূমিকম্পের আধিক্য। এমনকি হত্যাকারী বলতে পারবে না কেন সে খুন করছে। মানুষ অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানুষ মৃত্যুকে বেশি পছন্দ করবে। ধন-সম্পদ এত বেড়ে যাবে যে, ধনী সদকা করার মত কাউকে পাবে না। দুটি বৃহৎ দল একই দাবিতে ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশ জন মিথ্যা নবুওতের দাবিদার হবে। মুসলমানরা ইহুদী ও নাসারার অনুসরণ করবে। মানুষ যালিমকে যালিম বলবে না, খারাপ কাজ থেকে কেউ কাউকে বারণ করবে না। নারীদের আধিক্য হবে, পঞ্চাশ জন নারীর দেখাশুনার ভার একজন পুরুষের উপর অর্পিত হবে। যিনা, ব্যভিচার ও শরাব-এর ছাড়াছড়ি হবে।

ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হবে এবং যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। অতঃপর তোমরাই তাদের উপর বিজয়ী হবে। এমনকি নির্বাক পাথরও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসে তোমাদের কাউকে বলবে, হে মুসলমান! দেখ, আমার পিছনে এক ইহুদী লুকিয়ে আছে। তাকে হত্যা কর। (বুখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের আগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যান্য জাতিসমূহের একতা গড়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

www.pathagar.com

এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবীর সকল জাতি একজোট হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমনভাবে পেয়ালার মধ্যে খাদ্যবস্তু একত্র হয়ে যায়। একজন সাহাবী তখন প্রশ্ন করলেন, তবে কি আমরা তখন সংখ্যায় কম থাকবো? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না তোমরা বরং সংখ্যায় বেশি থাকবে। কিন্তু তোমরা বন্যায় ভেসে যাওয়া খড়কুটার ন্যায় দুর্বল হয়ে যাবে এবং আল্লাহ শত্রুদের অন্তরে তোমাদের ব্যাপারে লালিত ভয়-ভীতি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিবেন।

অপর একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কি সেই দুর্বলতা? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, "তোমাদের সেই দুর্বলতা হল, দুনিয়াকে ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" (আহমদ, আবূ দাউদ)

কিয়ামতের বড় নিদর্শন

দাজ্জালের আবির্ভাব

দাজ্জালের নাম হবে মাসীহ। হযরত ঈসা (আ)-কেও মাসীহ বলা হয়। কেননা তিনি কোন অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে হাত মাসেহ করলে সে সুস্থ হয়ে যেত। কেউ বলেছেন, আল্লাহ তাকে সুন্দর চেহারা ও চরিত্র দান করেছেন। কেউ কারো চেহারার ময়লা মুছে দিলে যেমনিভাবে তাকে সুন্দর লাগে। হযরত ঈসাহর চেহারাও ছিল খুবই উজ্জ্বল। তাই তাঁকে মাসীহ নামে ডাকা হত। কিন্তু দাজ্জালকে কেন মাসীহ বলা হয়? এর কারণ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেন, দাজ্জাল পৃথিবীর একস্থান থেকে আরেকস্থানে ছুটে যাবে। এটা জমিন মাসেহ করার মত। এ কারণে তাকে মাসীহ বলা হয়। কারো মতে, সে হবে অন্ধ। তার চোখের উপর কোন ভ্রূ থাকবে না। কেউ চোখ মাসেহ করে ভ্রূ উপড়ে ফেলার মত তার চেহারা মনে হবে। তাই তাকে মাসীহ বলা হয়।

দাজ্জালের নামের সাথে অরেকটি উপাধি আছে, তা হল কায্যাব বা মিথ্যাবাদী। কেননা সে নিজেকে আল্লাহ বলে মিথ্যা দাবি করবে এবং ইহুদীরা তাকে মেনে নিবে। ইহুদীরা ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তার আবির্ভাবের অপেক্ষায় থাকবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে এবং তাদের মাথায় বড় টুপি থাকবে। দাজ্জাল পৃথিবীর সবখানে বিচরণ করবে; শুধু মক্কা ও মদীনায় যেতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর

www.pathagar.com

সকল ভূমিতেই দাজ্জাল অবতরণ করবে এবং মক্কা-মদীনার সমস্ত গিরিপথে আল্লাহর ফেরেশতাগণ পাহারারত থাকবেন।" (মুসলিম)

দাজ্জাল সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস আছে। আল্লামা শাওকানী লিখেন, দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তিনি সেসব হাদীস নিয়ে একটি কিতাবও লিখেন। কোন কোন চিন্তাবিদ লিখেন, দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার কারণে দাজ্জাল সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ওয়াজিব।

দাজ্জাল সম্পর্কে যেসব হাদীস এসেছে তার সারকথা হল, পৃথিবীর ধন-সম্পদ দাজ্জালের কুক্ষিগত থাকবে। তার আদেশে আকাশ হতে বৃষ্টি হবে এবং জমিন থেকে ফল, ফসল উৎপন্ন হবে। সে ইচ্ছা করলে কাউকে মেরে ফেলতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে জীবন দান করতে পারবে। তবে তার এ সব ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছায় পরিচালিত হবে। এক সময় আসবে আল্লাহ্ তাকে প্রদত্ত সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবেন। তখন সে আর কাউকে মেরে জীবন দান করতে পারবে না।

হাদীস থেকে জানা যায়, দাজ্জাল ঘন চুলের অধিকারী হবে। তার এক চোখ হবে কানা আর তার দু'চোখের মাঝখানে লিখা থাকবে কা + ফি + র। সকল মুমিন তা পড়তে পারবে। তবে খাঁটি ঈমানদার ছাড়া আর সবাই তার আহবানে সাড়া দিবে। যারা তার কথা মেনে চলবে তাদের সুখ শান্তি বেড়ে যাবে। এভাবে দ্রুতগতিতে তার মিথ্যা মতবাদ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে এটা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত হবে। কোন কোন বর্ণনায় খোরাসানের কথা উল্লেখ আছে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, সে কিয়ামতের পূর্বক্ষণে মানুষকে গোমরাহ্ করার জন্য বের হবে। দাজ্জালের আবির্ভাবের পর মানুষ দলে দলে গোমরাহ্ হয়ে যাবে। কিন্তু খালেছ ঈমানদাররা তার চেহারায় কাফির লিখা দেখে চিনতে পারবে। যেসব ঈমানদার লেখাপড়া জানে না তারাও তার চেহারায় লিখিত কাফির শব্দটি পড়তে পারবে। শয়তান দাজ্জালকে সার্বিক সহযোগিতা করবে। ফলে তার মতবাদ অল্প সময়েই বিস্তার লাভ করবে।

সে কতদিন দুনিয়াতে থাকবে এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দাজ্জালের অবস্থানের সময়কাল হবে চল্লিশ। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জানি না চল্লিশ দ্বারা কি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বুঝানো হয়েছে। তবে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) থেকে বর্ণিত

www.pathagar.com

একটি হাদীস থেকে জানা যায়, চল্লিশের প্রথম দিন হবে এক বছর, দ্বিতীয় দিন হবে এক মাস আর তৃতীয় দিন হবে এক জুমআ অর্থাৎ এক সপ্তাহ। আর বাকি দিন আমাদের দিনের মত হবে।

দাজ্জালের ফিতনা যখন বেড়ে যাবে সে সময় হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করবেন এবং তাঁর সাথে দাজ্জালের লড়াই হবে। এতে দাজ্জাল নিহত হবে। এরপর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

হযরত ঈসার আগমন

হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের আগে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী (উম্মত) হিসেবে আগমন করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "অচিরেই তোমাদের মাঝে মরিয়ম তনয় অবতরণ করবেন, যিনি তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। কাজেই তিনি ক্রুস ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া কর ধার্য করবেন এবং তখন ধন-সম্পদের এত ছড়াছড়ি হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন একটি সেজদা এতই মূল্যবান হবে যে, দুনিয়া এবং এর মধ্যবর্তী সকল কিছু হতে তা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এরপর বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করতে পার। আয়াতটির অর্থ হল, আহলে কিতাবদের সকলেই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ঈসার আগমনের পর মুমিনদের সে সময়কার নেতা তাঁকে ইমামতির জন্য আহ্বান জানাবেন। তখন তিনি বলবেন না তোমরা পরস্পর পরস্পরের নেতা। তাঁর আগমনের পর দুনিয়াতে ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর তাঁর ওফাত হবে এবং তাঁকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মুবারকের পাশে সমাহিত করা হবে।

ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব

কিয়ামতের আগে ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা উচ্চ ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।" (আম্বিয়া ঃ ৯৬)

ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অনেক হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে হযরত নূহের ছেলে ইয়াফেসের বংশধর বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

তারা বর্বর, নিষ্ঠুর ও যালিম প্রকৃতির। তাদেরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তারা আবদ্ধ থাকবে। ইমাম মাহদীর আবির্ভাব এবং ঈসা (আ) আগমন করে দাজ্জালকে নিধন করার পর যুলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতল ভূমির ন্যায় সমান হয়ে যাবে। সে সময় তারা একযোগে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়বে। তাদের সংখ্যা বিশ্বের সমস্ত জনসংখ্যার চেয়ে কমপক্ষে দশগুণ বেশি হবে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো থাকবে না। তারা মানব বসতি ধ্বংস করে দিবে। এমন কি নদীর পানি পর্যন্ত নিঃশেষ করে ফেলবে। হযরত ঈসা (আ) ঈমানদার মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তূর পাহাড়ে আশ্রয় নিবেন। এক পর্যায়ে তাঁরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবেন। আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজকে নিপাত করবেন। তারা পঙ্গপালের মত পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকবে। তাদের মৃত লাশের দুর্গন্ধে পৃথিবীতে বাস করা কঠিন হয়ে পড়বে। আল্লাহ্ সমস্ত মৃত লাশ অদৃশ্য করে দিবেন এবং বৃষ্টির মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বকে সাফ করে দিবেন। এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

কিয়ামতের দশ নিদর্শন– সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দশটি লক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দেখতে না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না। সেই দশটি বিষয় হল ঃ ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাহ, অস্ত যাওয়ার দিক থেকে সূর্যের উদয়, ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন, পূর্ব দিকের তিনটি ভূমিকম্প, পশ্চিম দিকের ভূমিকম্প, আরব উপদ্বীপের ভূমিকম্প, ইয়ামেন থেকে উত্থিত আগুন যা মানুষকে তাড়িয়ে সমাবেশের স্থানে নিয়ে যাবে। (বুখারী)

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য তার অস্ত যাওয়ার দিক থেকে উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যখন এভাবে সূর্য উদিত হবে, তখন সকলেই তা দেখবে এবং সমবেতভাবে তারা ঈমান আনবে। কিন্তু তাদের ঐ ঈমান কোন উপকারে আসবে না। (বুখারী)

হাশর বা মহাসমাবেশ

কিয়ামত সংঘটিত হবার পর সবাই হাশরের ময়দানে মিলিত হবে। হাশর শব্দের অর্থ হল একত্রিত করা, মিলিত হওয়া। আল্লাহ্ তাআলা হাশরের ময়দানে সবাইকে একত্রিত করবেন। পৃথিবীর সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সব

www.pathagar.com

মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "বলুন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই একটি নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হবে।" (ওয়াকিয়াহ ঃ ৪৯-৫০)

সেদিন কেউ বাকি থাকবে না। পৃথিবীর সকল মানুষই একসাথে মিলিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "যখন পাহাড়-পর্বতগুলোকে চালিত করব তখন তোমরা জমিনকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখতে পাবে। আর আমরা সমস্ত মানুষকে এমনভাবে ঘিরে একত্রিত করব যে, কেউ বাকি থাকবে না।" (কাহাফ ঃ ৪৭)

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ কি সেদিন নতুন শরীর ও রূহ দিয়ে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, না দুনিয়ার শরীর ও রূহ্ দিয়েই পুনর্জীবন দান করবেন? এর জবাবে আল্লামা ইবনে কায়্যিম বলেন, আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার শরীর ও একই রূহ দিয়ে পুনর্জীবন দান করবেন। কেননা বান্দা যে শরীর ও রূহ্ নিয়ে আল্লাহর ইবাদত বা নাফরমানী করেছে হুবহু সেই শরীরই নিয়ামত বা আযাব ভোগ করা ন্যায়সঙ্গত। এ মতের সমর্থনে কুরআনের অনেক আয়াত আছে। আল্লাহ্ কুরআনে পুনর্জীবনের কথা বলেছেন। তিনি নতুনভাবে সৃষ্টি করার কথা কোথাও বলেননি।[৪৭]

আরেকটি প্রশ্ন হল, হাশরের ময়দানে সবাই কিভাবে একত্রিত হবে? এর জবাবে বলা যায়, নেককার বান্দাদেরকে সম্মানের সাথে আর বদকার বান্দাদেরকে অপমানের সাথে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "সেদিন দয়াময়ের কাছে পুণ্যবান মানুষদেরকে অতিথিরূপে মিলিত করব এবং পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।" (মারিয়াম ঃ ৮৫-৮৬)

আল্লাহ্ সমস্ত মানুষকে হাশরের ময়দানে কিভাবে একত্রিত করবেন সে সম্পর্কে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। উক্ত হাদীসের সারকথা হল, হাশরের ময়দানে মানুষ তিনভাবে যাবে ঃ

১. পায়ে হেঁটে—সেসব মুমিন বান্দা যাদের নেক আমল ও বদ আমলের মধ্যে মিশ্রণ আছে।
২. বাহনে চড়ে—সেসব নেক বান্দারা যারা পূর্ণাঙ্গভাবে ঈমানের দাবি পূরণ করেছে।
৩. পায়ের পরিবর্তে মুখের মাধ্যমে হেঁটে যাবে—তারা হল সে সব বদকার বান্দা যারা দুনিয়াতে অহংকার বশত আল্লাহকে সেজদা করেনি। আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলেনি। আল্লাহর সাথে নাফরমানী করেছে। তবে তাদের মুখের আকৃতি বিকৃত করা থেকে হেফাযত রাখা হবে।

www.pathagar.com

হাশরের ময়দানে মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হওয়া সম্পর্কে সূরা আল ওয়াকিয়াতে এভাবে উল্লেখ আছে, "যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে। যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নাই। এটা (কিছু মানুষকে) নিচু করে দেবে (আর কিছুকে) সমুন্নত করে দেবে, যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা এবং তোমরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা ডানদিকে কত ভাগ্যবান তারা এবং যারা বামদিকে কত হতভাগ্য তারা। অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল।" (ওয়াকিয়া ঃ ১-১১)

হাশরের কতিপয় চিত্র

সবাই নগ্ন থাকবে

হাশরের ময়দানে সকলে নগ্নপদ, বিবস্ত্র এবং খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামত দিবসে মানুষকে খালি পায়ে, নগ্ন শরীরে এবং খতনাবিহীন অবস্থায় হাশরের ময়দানে আনা হবে। হযরত আয়েশা (রা) এ কথা শুনার পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, নারী-পুরুষ সকলে তখন কি একে অপরের দিকে তাকাবে? তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, সেদিন পরিস্থিতি এত কঠিন ও জটিল হবে যে, কেউ কারো দিকে তাকানোর অবকাশই পাবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য, আরেকটি হাদীসে আছে, যাকে যে কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়, সে সেই কাপড় পরিধান করে উঠবে। বাহ্যিকভাবে এ হাদীসের সাথে উপরের হাদীসের বৈপরীত্য দেখা যায়। এর ব্যাখ্যায় মেশকাতুল মাসাবীহর শরাহতে উল্লেখ করা হয়, মানুষ কবর থেকে কাফনের কাপড় পরিধান করা অবস্থায় উঠবে। আর হাশরের ময়দানের দিকে যখন ছুটে যাবে সে সময় নগ্ন হয়ে যাবে। কোন কোন আলেম বলেন, এ হাদীসে পোষাক বলতে আমল বুঝানো হয়েছে।[৪৮]

আল্লাহ্ সবাইকে পুনর্জীবন দান করবেন

মানুষ চোখের সামনে অনেককে মরতে দেখে, তাই মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। সবাই বিশ্বাস করে সকলকে মরতে হবে। কিন্তু মরণের পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধারণা বিদ্যমান।

কারো কারো ধারণা, পৃথিবীর স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। পৃথিবী একটা দুর্ঘটনার ফসল। মানুষের জীবন ও মৃত্যু সে দুর্ঘটনার ফল। পরকাল বলতে কিছুই

www.pathagar.com

নেই। তাই তারা মানুষের পুনর্জীবন লাভে বিশ্বাসী নয়। তাদের ধারণা কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে, "দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের মৃত্যু। কালের আবর্তন ছাড়া আর কোন জিনিসই আমাদের ধ্বংস করবে না।" (জাসিয়া ঃ ২৪)

কারো কারো ধারণা, মানুষ ভাল বা মন্দের ফল ভোগের জন্য দুনিয়ায় বারবার পুনর্জীবন লাভ করে। কখনও কুকুর হয়ে, কখনও বানর হয়ে আবার কখনও পাখি হয়ে। এভাবে নানা আকৃতিতে মানুষ দুনিয়াতে আসে।

আবার কারো কারো ধারণা, মানুষের পুনর্জীবন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। তাদের সম্পর্কে কুরআনে এভাবে বর্ণনা এসেছে, "(এ সম্পর্কে) আমরা ধারণা রাখি মাত্র। নিঃসন্দেহ প্রত্যয় আমাদের নেই।" (জাসিয়া ঃ ৩২)

কারো কারো ধারণা, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা অসম্ভব। তাদের ধারণা কুরআনে এভাবে উল্লেখ আছে, "পচাগলা অস্থিমজ্জা পুনর্জীবিত করবে এমন কে আছে?" (ইয়াসীন ঃ ৭৮)। তাদের বিশ্বাস হল, দুনিয়ার জীবনের পর আর পুনর্জীবিত হতে হবে না। এটা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তাদের কথা কুরআনে এভাবে এসেছে, "এই দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন এবং মৃত্যুর পর কখনও পুনর্জীবিত হব না।" (আনআম ঃ ২৯)

আমরা যারা ইসলামে বিশ্বাসী, আমাদের বিশ্বাস আল্লাহ আমাদেরকে আবার পুনর্জীবন দান করবেন। দুনিয়ার ভাল-মন্দের হিসাব নিবেন। আর এর ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন। এ প্রসঙ্গে সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ্ বলেন, "আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায়, বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হবার উপক্রম হবে তাদের জন্য অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব। এটাই তাদের শাস্তি। কারণ তারা বলেছে আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৯৭-৯৮)

এটা ঠিক যে, যে সব অবিশ্বাসী পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে বলে, মৃত্যুর পরই মানব জীবনের সব শেষ হয়ে যাবে, মানুষকে আর পুনর্জীবিত করা হবে না। যারা মনে করে, মানুষ মারা যাবার পর তাকে পুনরায় জীবিত করা সম্ভব নয়। তারা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। অথচ তারা দুনিয়াতে অহরহ দেখছে, যিনি যে জিনিস একবার আবিষ্কার করেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার তা বানানো কঠিন নয়। মূলত যে-কোন জিনিস প্রথম আবিষ্কার

www.pathagar.com

করাই কঠিন। কোন ধরনের স্যাম্পল ছাড়া আল্লাহ্ মানুষকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বশীল করেছেন। আল্লাহ্ মানুষকে একবার অস্তিত্ব দান করার পর তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন বিষয় নয়। আফসোসের বিষয় হল, এ সত্যটুকু বুঝার মত তাদের আকল নেই। যারা মনে করে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন, তাদের যুক্তি খণ্ডন করে আল্লাহ্ নিজেই বলেন, "মানুষ কি মনে করে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, এরপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর-নারী। তবু কি সেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?" (কিয়ামাহ ঃ ৩৬-৪০)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করেন। এটা তাঁর জন্য অধিক সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (রুম ঃ ২৭)

ফেরেশতারা হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে

দুনিয়াতে দেখা যায়, অপরাধী আসামীদেরকে জেল থেকে কোর্টে নেওয়ার সময় পুলিশ থাকে। যারা দাগী অপরাধী তাদেরকে পায়ে শিকল পরিয়ে নেওয়া হয়। হাশরের ময়দানেও সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র আদালতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের সাথে ফেরেশতা থাকবে। এ প্রসঙ্গে সূরা কাফে ইরশাদ হয়েছে, মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে, এ সম্পর্কে তুমি টালবাহানা করতে এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী 'শাহীদ'। তুমি তো এদিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। (কাফ ঃ ১৯-২২)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেল প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে, আরেকজন তার আমল বহন করবে। কেউ কেউ বলেন, 'শাহীদ' বলতে তার আমলনামাকেই বুঝানো হয়েছে। মূলত ফেরেশতা হবে একজন। (মাআরেফুল কুরআন)

নাফরমান লোকদের হাশর

দুনিয়াতে দেখা যায়, আদালতে আসামী দাঁড়ায় কাঠগড়ায় আর সাক্ষী দাঁড়ায় বিচারকের কাছাকাছি। মূলত যারা আল্লাহ্‌র ফরমাবরদার বান্দা তারা আখিরাতে আল্লাহ্‌র আদালতে হবে সাক্ষী। তারা দুনিয়াতে সত্যের সাক্ষী ছিল। এমনকি তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্‌র দীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়ে এ কথারই সাক্ষ্য দিয়েছে যে তাদের কাছে জীবনের চেয়ে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠায় মৃত্যুই ছিল অনেক উত্তম।

www.pathagar.com

হাশরের ময়দানে আল্লাহর অনুগত বান্দারা যেভাবে থাকবে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও খোদাদ্রোহীরা সেভাবে থাকবে না। আল্লাহপ্রেমিক বান্দারা আল্লাহর কাছে যেভাবে উপস্থিত হবে ঠিক একইভাবে যদি আল্লাহর সাথে যারা দুশমনী করেছে তারা উপস্থিত হয়, তাহলে দুনিয়াতে এত কষ্ট, নির্যাতন ভোগ করার সার্থকতা থাকে না। এ কারণে মৃত্যুর সময় থেকে শুরু করে হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই আল্লাহর নেক বান্দাদের সাথে অপরাধীদের পার্থক্য থাকবে। অপরাধীদের চোখ-মুখ দেখেই বুঝা যাবে যে, তারা নাফরমান। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়।" (ত্বাহা ঃ ১০২)

তিনি আরো বলেন, "যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হল।" (ত্বাহা ঃ ১২৪-১২৬)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে কিয়ামতের দিন আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবেন। বর্তমানে দুনিয়াতে যারা ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করে না, বরং কুরআনের বিরোধিতা করে, কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা হবে খুবই শোচনীয়।

অপরাধীদের অনুতাপ

সেদিন অপরাধীরা অনুতাপ করবে। তাদের সামনে যখন অন্যান্য প্রাণীকে মাটি করে দেওয়া হবে, তখন তারাও মাটি হয়ে যেতে চাইবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "সেদিন মানুষ সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রিম পাঠিয়েছে। তখন প্রতিটি কাফির চিৎকার করে বলে উঠবে, হায় আমি যদি মাটি হতাম!" (নাবা ঃ ৪০)

অপরাধীদেরকে যারা অপরাধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, সে উদ্বুদ্ধকারীদেরকে সেদিন তারা ধিক্কার দেবে। তারা সেদিন আফসোস করে বলবে, হায় কেন তাদের কথা শুনলাম! যদি তাদের কথা না শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শুনতাম তাহলে এ ধরনের পরিণতি হত না। সেদিন অপরাধীদের অপরাধবোধ জাগ্রত হবে। তারা তীব্র অনুশোচনায় বলতে থাকবে, হায়! আমরা যদি এ জীবনের জন্য কোন ভাল কিছু করতাম তাহলে আজ কতইনা

www.pathagar.com

ভাল থাকতাম। সেদিনের অনুতাপ ও আফসোস কোন কাজে আসবে না। তবু তারা আল্লাহর কাছে মিনতি করবে, হে রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকে আবার দুনিয়াতে পাঠান। আমরা এবার দুনিয়াতে গিয়ে আপনার হুকুম মেনে চলব। কোন ধরনের নাফরমানী করব না। কিন্তু সেদিন আর এ সুযোগ মিলবে না।

অপরাধীদের চেহারা দেখে চেনা যাবে

দুনিয়াতে অপরাধীদের চেহারা দেখেই চেনা যায় যে, তারা অপরাধী। অনুরূপভাবে হাশরের ময়দানেও অপরাধীদের চেহারা দেখেই তাদের চেনা যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "অপরাধীগণ সেখানে নিজ নিজ চেহারা দিয়েই পরিচিত হবে।" (আর রাহমান ঃ ৪১)

আল্লাহ্ আরো বলেন, "সেদিন তুমি পাপীদেরকে দেখবে, শিকলে হাত-পা শক্ত করে বাঁধা রয়েছে এবং গায়ে গন্ধকের পোশাক পরানো রয়েছে। আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে রেখেছে।" (ইব্‌রাহীম ঃ ৪৯-৫০)

নেককার লোকদের অযুর স্থানসমূহ চিকচিক করে চমকাবে

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হাশরের ময়দানে চিনতে কষ্ট হবে না। নেক বান্দাদের অযুর স্থানসমূহ উজ্জ্বল হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানে অযুর স্থানসমূহ ঝিলমিল করবে। এ নিদর্শন দেখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতদেরকে চিনবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অনেকগুলো ঘোড়ার মধ্যে কপালে সাদাদাগ বিশিষ্ট ঘোড়া চিনতে যেমন কষ্ট হয় না, তেমনিভাবে অনেক মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চিনতে কষ্ট হবে না। অযুর স্থানসমূহের ঔজ্জ্বল্য দেখেই তাদের চেনা যাবে।

সূর্য খুব কাছে থাকবে

বর্তমানে সূর্য অনেক দূরে। তারপরও কী প্রচণ্ড গরম। কিন্তু হাশরের দিন সূর্য খুবই কাছে থাকবে। সূর্যের তাপে নির্গত ঘামে কারো কাঁধ পর্যন্ত ডুবে যাবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত। আর কেউ সাঁতার কাটবে। প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী উত্তাপ ভোগ করবে। হাশরের ময়দানে সকলে একসাথে থাকলেও একেকজন একেক ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। দুনিয়াতেও দেখা যায় একই হোটেলে থাকার পরও কেউ এয়ারকন্ডিশন ভোগ করে। আর কেউ সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। দুনিয়াতে সুযোগ-সুবিধা ভোগের মানদণ্ড হল অর্থ। আর হাশরের ময়দানে সুযোগ-সুবিধা ভোগের মানদণ্ড হবে আমল।

www.pathagar.com

হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যারা

হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। সে দিন প্রচণ্ড গরম লাগবে। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ তার আপন অপরাধ অনুযায়ী ঘামের মধ্যে সাঁতরাবে। কারো ঘাম তার গলা পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার হাঁটু পর্যন্ত হবে। এভাবে একেকজনের ঘাম একেক ধরনের হবে।

সে কঠিন সময়ও সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়ায় আরামে থাকবে। তাঁরা হলেন ঃ

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক।
২. ঐ যুবক, যে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন-যাপন করে বড় হয়েছে।
৩. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর ঝুলে আছে মসজিদের সাথে।
৪. ঐ দুই ব্যক্তি, যারা একে-অপরকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসে। এ উদ্দেশ্যে তারা একত্রিত হয় আর এ উদ্দেশ্যে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।
৫. ঐ ব্যক্তি, যাকে পরমা সুন্দরী রমণী আহ্বান জানালে সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি।
৬. ঐ ব্যক্তি, যে গোপনে আল্লাহর পথে ব্যয় করে।
৭. ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করে।

এ থেকে বুঝা যায়, হাশরের ময়দানে সব স্থানের অবস্থা এক রকম হবে না। কোথাও খুবই উত্তপ্ত থাকবে আর কোথাও থাকবে আরশের শীতল ছায়া।

হিসাব, মীযান ও বিচার

হাশরের ময়দানে সব মানুষকে বিচারের অপেক্ষা করতে হবে। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সারমর্ম এই যে, কিয়ামতের দিন দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করতে হবে হাশরবাসীকে। সে সময় ঈমানদার ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে হযরত আদম (আ)-এর কাছে যাবে এবং আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য বলবে, যেন বিচার-ফয়সালা শুরু হয়। তিনি বলবেন, আমি লজ্জাবোধ করছি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে। তোমরা নূহের কাছে যাও। হাশরবাসী নূহের কাছে যাবে, কিন্তু তিনিও সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। এরপর পর্যায়ক্রমে হযরত ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-এর কাছে যাবে। কিন্তু সকলেই একই কথা বলবেন। অবশেষে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে সবাই আরজ করবে

www.pathagar.com

সুপারিশ করার জন্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন। আল্লাহ্ তখন বলবেন, হে হাবীব! আপনি মাথা তুলুন এবং সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। আল্লাহর রাসূলের সুপারিশের পর হিসাব-নিকাশ ও বিচার শুরু হবে।

সেদিন আল্লাহর সামনে দু'ধরনের হিসাব পেশ করা হবে।

প্রথমত, সাধারণ হিসাব-যা সকল সৃষ্টি পেশ করবে। কেউ কোন কিছু গোপন করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "সেদিন তোমাদের হিসাব-নিকাশ পেশ করা হবে এবং তোমাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকবে না।" (আল হাক্কাহ্ ঃ ১৮)

দ্বিতীয়ত, বিশেষ হিসাব যা মুমিনরা পেশ করবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিয়ামত দিবসে মুমিন ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সন্নিকটে বসে তাঁর সামনে হাত রাখবে। এরপর তিনি তাকে তার পাপ দেখিয়ে বলবেন, এ ব্যাপারে তোমার কিছু জানা আছে? মুমিন ব্যক্তি জবাবে বলবে, হ্যাঁ আমি জানি, আমি এ পাপ করেছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতে আমি তোমার এ পাপ গোপন রেখেছি এবং আজকের দিনেও তা ক্ষমা করছি। এরপর তার কাছে তার সৎ কাজের খতিয়ান দেওয়া হবে। আর কাফির ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে বলা হবে, এ সমস্ত হতভাগ্য তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাশরের ময়দানে আমল-এর ভিত্তিতে প্রত্যেকের বিচার-ফয়সালা হবে। যার নেক আমল বেশি হবে, সে সফলতা লাভ করবে। আর যার বদ আমল বেশি হবে, সে নাজাত পাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর ওজন হবে সেদিন যথার্থ সত্য। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই হবে নিজেদের ক্ষতি সাধনকারী। কারণ তারা আমার আয়াতের সাথে জালিমের ন্যায় আচরণ চালিয়ে গিয়েছিল।" (আরাফ ঃ ৮-৯)

আখিরাতে ভাল ও মন্দের পুরস্কার সকলকে ভোগ করতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে, নেক আমল বেশি হবার পরও সামান্য যে পাপ করেছে এ পাপের জন্য তাকে আযাব ভোগ করতে হবে। তারপর সে নাজাত পাবে। আর যে সারা জীবন নাফরমানী করার সাথে কিছু ভাল কাজ করেছে, সে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার পাবে আর খারাপ কাজের জন্য সাজা পাবে। বিষয়টি এ ধরনের হবে না। বরং মানুষের জীবনের যাতবীয় কাজের ভাল অংশ যদি মন্দ অংশের উপর বিজয় লাভ করে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক কিছু দেবার পরও তার হিসেবে কিছু না কিছু নেক আমল থাকে, তবেই আখিরাতে তার সাফল্য লাভ করা সম্ভব। আর যদি মন্দকাজ তার সমস্ত ভাল কাজকে মূল্যহীন করে দেয়

www.pathagar.com

তার অবস্থা হবে সেই দেউলিয়া ব্যবসায়ীর মত যার সমস্ত পুঁজি ক্ষতিপূরণ ও দাবি পূরণ করতে করতেই শেষ হয়ে যায় এবং এরপরও কিছু কিছু দাবি তার জিম্মায় অনাদায়ী থেকে যায়।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, আমল তো দেখা যায় না, কিভাবে তা পরিমাপ করা হবে? দাঁড়িপাল্লা কোন ধরনের হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা মওদূদী (র) লিখেন, "দাঁড়িপাল্লা কোন ধরনের হবে তা অনুধাবন করা আমাদের জন্য কঠিন। মোটকথা সেটি এমন কোন জিনিস হবে, যা বস্তু ওজন করার পরিবর্তে মানুষের নৈতিক কর্মকাণ্ড ও তার পাপ-পুণ্য ওজন করবে এবং যথাযথ ওজন করার পর কোন্ ব্যক্তি নৈতিক দিক থেকে কোন্ ধরনের মর্যাদার অধিকারী তা জানিয়ে দেবে পুণ্যবান হলে কি পরিমাণ পুণ্যবান আর পাপী হলে কি পরিমাণ পাপী তাও জানিয়ে দেবে। মহান আল্লাহ্ আমাদের ভাষার অন্যান্য শব্দ বাদ দিয়ে 'দাঁড়িপাল্লা' শব্দ এজন্য নির্বাচিত করেছেন যে, এর ধরনটি হবে দাঁড়িপাল্লার সাথে সামঞ্জস্যশীল অথবা এ শব্দ নির্বাচনের উদ্দেশ্য হল এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, একটি দাঁড়িপাল্লার পাল্লা যেমন দুটি জিনিসের ওজনের পার্থক্য সঠিকভাবে জানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি আল্লাহর ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লাও প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের কাজ-কর্ম যাচাই করে কোন প্রকার কম-বেশি না করে তার মধ্যে পুণ্যের বা পাপের কোন্ দিকটি প্রবল তা একদম হুবহু বলে দেবে।" (তাফহীম আল কুরআন, সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৮ নম্বর টীকা দেখুন)

মূলত আমল মানুষ দেখতে না পেলেও আল্লাহ্ দেখতে পান। মানুষ যখন জ্বরে আক্রান্ত হয় তখন তো শরীরের তাপ দেখা যায় না। থার্মোমিটারের সাহায্যে মানুষ শরীরের তাপ পরিমাপ করে। মানুষের পক্ষে যদি তাপ পরিমাপ করা সম্ভব হয়, তাহলে সকল শক্তির আধার আল্লাহর পক্ষে মানুষের আমল পরিমাপ করা কঠিন হবে কেন? মানুষ যখন কম্পিউটারে কোন ফাইল সেভ করে সে ফাইলে কতটি শব্দ, কতটি প্যারা, কতটি বর্ণ আছে তা বিশেষ কমান্ডের মাধ্যমে এক মুহূর্তেই জানা যায়। তাহলে আল্লাহ্ পাকের জন্যে মানুষের ভাল ও মন্দের পরিমাপ এক মুহূর্তে করা কঠিন হবে কেন? কম্পিউটারের ফন্ট ছোট-বড় করে দেখানো মানুষের পক্ষে সম্ভব। তাহলে আল্লাহ্‌র বিশেষ কুদরতে সবার আমল দেখানো সম্ভব হবে না কেন? কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, মানুষকে নিজের আমলনামা পড়তে দেওয়া হবে। এ থেকে বুঝা যায়, আমলের রিপোর্ট মানুষ দেখতে পাবে।

এখন প্রশ্ন হল, সব মানুষের বিচার-ফয়সালার জন্য কি একটি মীযান তথা দাঁড়িপাল্লা ব্যবহৃত হবে? এর জবাবে মুফতী শফী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেন,

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা কুরআনে 'মীযান' শব্দের পরিবর্তে 'মাওয়াযীন' বহুবচন ব্যবহার করায় কোন কোন তাফসীরকারকের মতে হাশরের ময়দানে অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা থাকবে আমল পরিমাপের জন্য। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে একটি দাঁড়িপাল্লা অনেকগুলোর কাজ দেবে বলে বহুবচনের শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়, কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলেও করা যাবে।

আরেকটি প্রশ্ন হল, কাফির-মুশরিক এর আমল ও কি ওজন করা হবে? এর জবাব কুরআনে পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। আল্লাহ্ বলেন, "এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রবের নিদর্শনাবলি মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে হাজির হবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে কোন ওজন নেব না।" (কাহাফ ঃ ১০৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কাফির-মুশরিকদের পরিমাপ করার মত কোন আমলই থাকবে না। কারণ তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার, শিল্প, কল-কারখানা, সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণসহ যা কিছু করেছে তার মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই যা আল্লাহর তুলাদণ্ডে ওজন করার জন্য আল্লাহর সামনে পেশ করা যেতে পারে। আখিরাতে সেসব কিছুই শুধুমাত্র ওজন করা হবে বা মূল্যবান হবে, যা আল্লাহকে খুশি করার জন্য করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ যত মূল্যবান কোন কাজই করুক না কেন তা যদি আল্লাহকে খুশি করার জন্য করা না হয়, তাহলে আখিরাতে তা হবে একেবারেই মূল্যহীন। কাফির-মুশরিকরা যেহেতু দুনিয়াতেই ফল ভোগের জন্য সব কিছু করে তাই আখিরাতে পরিমাপ করার মত তাদের কোন আমলই থাকবে না। কেননা তাদের সব আমলতো দুনিয়ার জন্য ছিল। মরণের সাথে সাথে তা নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে আরো ইরশাদ করেন, "আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেবো।" (ফুরকান ঃ ২৩)

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র আরো বলেন, "যারা কাফির তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসিত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না; পায় সেখানে আল্লাহকে। অতঃপর আল্লাহ্ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়। যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ। যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের পর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না।" (নূর ঃ ৩৯-৪০)

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কাফির-মুশরিকরা যতই মনে করুক তারা অনেক ভাল কাজ করছে। আখিরাতে সেটা মরীচিকার মতই মনে হবে। তাদের সকল কর্ম অন্ধকারে ছেয়ে থাকবে। আখিরাতে পরিমাপ করার মত কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হাশরের ময়দানে যেখানে আমল পরিমাপ হবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে ঈমানদারদের জন্য সুপারিশ করবেন। যারা তাঁর আদর্শ কায়েমের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, দীনের উপর অটল থাকার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। আর তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে বিচারে অনেকেই নাজাত পাবেন। কিন্তু তিনি কোন কাফির-মুশরিকের জন্য সুপারিশ করবেন না।

বিচারের ক্ষেত্রে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয়

ইনসাফের সাথে বিচার করা হবে। কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।

দুনিয়ার বিচার-ফয়সালায় অন্যায় বা অবিচার হয়। কিন্তু আল্লাহর বিচার-ফয়সালায় কোন অবিচার করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" (আম্বিয়া ঃ ৪৭)

সেদিন বিচারের ইনসাফ প্রসঙ্গে তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুটি গোলাম আছে, এরা অবাধ্য এবং কাজে কারচুপি করে। আমি তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং মারপিট করি। এ ক্ষেত্রে ইনসাফ করা হবে কিভাবে? আল্লাহর রাসূল জবাব দেন, যদি তাদের অপরাধের তুলনায় তোমার আচরণ কম হয় তাহলে তুমি তাদের প্রতি ইহসান করলে। আর তাদের অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশি হলে বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এ কথা শুনার পর ঐ ব্যক্তি কান্না জুড়ে দেয়।

হাশরের দিন সম্পূর্ণ ইনসাফের সাথে বিচার করা হবে। সেদিন বিচারে যুলুম করা হবে না, এ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন, "আজকের দিনে কারও প্রতি যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে।" (ইয়াসীন ঃ ৫৪)

www.pathagar.com

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, "আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার উপার্জনের প্রতিফল দেওয়া হবে, আজ কারো উপর যুলুম করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষীপ্রতার সাথেই হিসাব গ্রহণ করবেন।" (মুমিন ঃ ১৭)

এ আয়াত থেকে জানা যায়, দুনিয়ার বিচার-ফয়সালায় অনেক সময় রায় ঘোষণা হতে অনেক সময় লেগে যায়। অনেক মামলা অমীমাংসিত থেকে যায়। আখিরাতে আল্লাহ বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা করবেন না। হিসাব-নিকাশ শুরু হবার পর তাড়াতাড়ি তা সম্পন্ন করে ফেলবেন। কিছু মানুষের বিচার হল আর কিছু মানুষ বিচার থেকে রেহাই পেল, এমনটি হবে না। সেদিন সবার বিচার ইনসাফের সাথে করা হবে।

কোন উকিল, সাহায্যকারী বা দোভাষী থাকবে না

দুনিয়াতে বিচারের রায়কে পক্ষে আনার জন্য উকিল নিয়োগের সুযোগ আছে। আখিরাতে এ ধরনের কোন সুযোগ নেই। দুনিয়াতে বিচারকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করা হয়। আখিরাতে তা সম্ভব নয়। সেদিন কোন ধরনের অনাস্থা প্রকাশের প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ সেদিনের কথা এভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। "আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারো সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না। কারও কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণও নেওয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না"। (বাকারা ঃ ৪৮)

সেদিন আল্লাহ দোভাষী ছাড়া সরাসরি প্রত্যেকের সাথে কথা বলবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কোন দোভাষী ছাড়াই কথা বলবেন। ভাগ্যবান ব্যক্তিরা তখন তাদের কৃতকর্ম দেখতে পাবে এবং হতভাগ্যরাও তাদের পূর্বকৃত কাজগুলো দেখবে। আর তাদের সামনে জাহান্নামও তারা দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা জাহান্নামকে ভয় কর এবং এ জন্য সম্ভব হলে অন্তত এক টুকরো খেজুরও দান কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেককে পাঁচটি বিষয়ের জবাব দিতেই হবে

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক বনী আদম পাঁচটি বিষয়ের জবাব দেওয়া ছাড়া এক কদমও নড়তে পারবে না। সে পাঁচটি বিষয় হল, জীবন-কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে। যৌবনকাল- কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে। সম্পদ-কিভাবে আয় হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে। আর ইলম অনুযায়ী আমল করা হয়েছে কিনা?

www.pathagar.com

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, দুনিয়ার পুরো জীবনের হিসাব আমাদেরকে দিতে হবে। সেদিন আমাদেরকে আল্লাহর বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। সেই বিচারের দিনে কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত পেতে হলে আল্লাহর দেওয়া জীবন আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহকে রাজি ও খুশি করার জন্যই খরচ করতে হবে।

প্রত্যেককে নিজের আমলনামা পড়তে দেওয়া হবে

দুনিয়াতে যেসব ছাত্র পরীক্ষা দেয় তারা পরীক্ষার রেজাল্ট পায়। মার্কশীটে প্রত্যেক বিষয়ের নম্বর লিখা থাকে। সার্টিফিকেটে লিখা থাকে সে কোন গ্রেডে পাস করেছে। আখিরাতেও প্রত্যেকে নিজের আমলনামায় সব কিছু লিখা পাবে। আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, "আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (এবং তাকে বলা হবে) পাঠ কর তোমার কিতাব! আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট"। (বনী ইসরাইল ঃ ১৩-১৪)

আমলনামায় সব কিছু লিপিবদ্ধ দেখতে পাবে

সেদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলনামা দেখবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে। চাই তা ভালো হোক বা মন্দ। সেদিন তারা কামনা করবে যে, এ দিনটি যদি তাদের নিকট হতে অনেক দূরে অবস্থান করত, তবে কতোই না ভাল হত। (আলে ইমরান ঃ ৩০)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন, "সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে; তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না।" (হাক্কাহ ঃ ১৮) মানুষ আমলনামা দেখে অবাক হয়ে যাবে। কারণ আমলনামায় ছোট-বড় সবকিছু লিখা থাকবে। কে কখন কাকে সামান্য উপকার বা ক্ষতি করেছে। কে কখন সামান্য নেকী বা বদীর কাজ করেছে সবকিছুই দেখতে পাবে। নিজের আমলনামা দেখে অপরাধীরা বলার চেষ্টা করবে, এসব অপরাধ আমি করিনি। ফেরেশতারা অতিরিক্ত লিখেছে। তখন আল্লাহ্ তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, তোমরা সাক্ষ্য দাও। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে এবং সবকিছু খুলে বলবে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, ফেরেশতারা কিভাবে আমলনামা সংরক্ষণ করেন? এব্যাপারে সঠিক কোন ধারণা মানুষের নেই। একমাত্র আল্লাহ্ই এ সম্পর্কে ভাল জানেন। এ ক্ষেত্রে শুধু এতটুকু বলা যায়, মানুষ কম্পিউটারের ছোট একটি ডিস্কে কত ধরনের ফাইল সংরক্ষণ করতে পারে, তাহলে আল্লাহ্-যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি বিশেষ কুদরতে মানুষের আমল সংরক্ষণ করতে সক্ষম নন? তিনি অবশ্যই সব আমল সংরক্ষণ করতে পারেন।

www.pathagar.com

দুনিয়াতে আমরা চোখ দিয়ে আল্লাহর নিয়ামতরাজি দেখি। আর তিনি ইচ্ছা করলে এ চোখকে ভিডিও রেকর্ডের কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম। কান দিয়ে আমরা কত কিছুই শুনি। আল্লাহ্ এ কানকে অডিও রেকর্ডের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের কাছে কোন কিছু অসম্ভব হলেও আল্লাহর কাছে সবই সম্ভব। আর আমাদের কাছে যা সম্ভব তা আল্লাহর কাছে অসম্ভব হবে কেন? এ কারণে এ কথা মনে করার সুযোগ নেই, ফেরেশতারা আমল সংরক্ষণ করতে পারবে না, কিংবা কম-বেশি করে ফেলবেন। আমরা দুনিয়াতে দেখি, গোয়েন্দা পুলিশ গোপনে ছোট অডিও টেপের মাধ্যমে অনেক অপরাধীর কথা, ফোন-সংলাপ রেকর্ড করে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে এর চেয়ে অধিক নিপুণতার সাথে মানুষের পাপ-পুণ্যের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে সক্ষম।

আমরা জমিনে বিচরণ করি, কথা বলি। পাপ-পুণ্য সবকিছু জমিনেই করি। এ জমিনই একদিন সবকিছু আল্লাহর কাছে খুলে বলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর পৃথিবী তার সমস্ত ভার বাইরে বের করে দেবে।" (যিলযাল ঃ ২)

এ আয়াতের তাফসীরে মাওলানা মওদূদী (র) লিখেন, "জমিন কেবলমাত্র মরা মানুষকে বাইরে নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হবে না, বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা ও কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ্য প্রমাণের যে বিশাল স্তূপ তার গর্ভে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকেও বের করে বাইরে ফেলে দিবে।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জমিনের পিঠে প্রত্যেক মানব ও মানবী যে কাজ করবে, জমিন তার সাক্ষ্য দেবে। সে বলবে, "এই ব্যক্তি অমুক দিন অমুক কাজ করেছিল"। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, "কিয়ামতের দিন জমিন এমন প্রতিটি কাজ নিয়ে আসবে যা তার পিঠের উপর করা হয়েছে।"

জমিন কিভাবে সবকিছু খুলে বলবে প্রাচীনকালে এটা অবাক লাগলেও বর্তমানে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কারের ফলে এটা আর অবাক কিছু নয়। রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, অডিও, ভিডিও, টেপরেকর্ডার, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ই-মেইল, ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে জমিন তার উপর ঘটে যাওয়া ঘটনা কিভাবে বর্ণনা করবে এ কথা অনুধাবন করা সহজ হয়ে গেছে।

নেক বান্দারা ডান হাতে আর বদকাররা বাম হাতে আমলনামা পাবে

দুনিয়াতে আমরা দেখি, সম্মানিত কোন ব্যক্তিকে বাম হাতে কেউ কিছু দেয় না, ডান হাতেই দেয়। আখিরাতেও নেক বান্দাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়ার অর্থ হল তারা আল্লাহর সম্মানিত অতিথি। আর যাদেরকে বাম হাতে

www.pathagar.com

দেওয়া হবে তারা হল আল্লাহর নাফরমান সেসব বান্দা যারা আল্লাহর দীনের অপমান করতে কুণ্ঠাবোধ করত না। অহরহ আল্লাহর নাফরমানী করত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে নাও তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুউচ্চ জান্নাতে সুখী জীবন-যাপন করবে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। তাদেরকে বলা হবে-বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর। যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে হায়! আমার যদি আমলনামা না দেওয়া হত। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি শেষ ব্যাপার হত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (সে সময় আল্লাহ্ ফেরেশতাদের বলবেন) একে, ধর এবং গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তারপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শিকলে।" (হাক্কাহ্ ঃ ১৯-৩২) সূরা বনী ইসরাঈলে এসেছে, কিতাব দেওয়ার পর সকলেই বলবে, "এ কোন কিতাব যা ছোট্ট কিছু বাদ রাখেনি এবং বড় কিছুও"।

বন্ধু-বান্ধব কেউ কারো উপকারে আসবে না

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, বন্ধুগণ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়। (আল যুখরুফ ঃ ৬৭)

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন, "(সে দিন) বন্ধু-বান্ধব খবর নেবে না। যদিও একে-অপরকে দেখতে পাবে। সে দিন গুনাহ্গার ব্যক্তি পণ্যস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে।" (মাআরিজ ঃ ১০-১৪)

একমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিই সুপারিশ করতে পারবেন

অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া আর কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না।" (তোয়াহা ঃ ১০৯)

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশই সে দিন গ্রহণযোগ্য হবে। তাই যারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণ করে না তাদের পক্ষে তাঁর সুপারিশ আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

ভাল-মন্দ সব কিছুর প্রতিফল দেওয়া হবে

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" (যিলযাল ঃ ৬-৭)

আল্লাহর কাছে কোন কিছু লুকিয়ে রাখার সুযোগ নেই। আমরা যত গোপনেই নেক বা পাপ কাজ করি না কেন তার পরিপূর্ণ প্রতিফল আল্লাহ্ পাক দান করবেন।

আল্লাহ্ তাঁর প্রদত্ত সকল নিয়ামতের হিসাব নিবেন

আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, সবকিছু সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করবেন। আমরা নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করেছি, কিংবা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত আল্লাহ্র দীনের কাজে কতটুকু ব্যয় করেছি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর সেদিন আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই (তার দেওয়া যাবতীয়) নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন।" (তাকাসুর ঃ ৮)

আমাদের ধন-সম্পদ, শরীর, স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, মেধা, যোগ্যতা সবই আল্লাহ্র নিয়ামত। কারণ পৃথিবীতে অনেকেই আছেন যারা পাগল। অনেকে আছেন সবসময় অসুস্থ থাকেন। অনেকেই আছেন যাদের ছেলে-সন্তান হয় না। আর অনেকেই আছেন যাদের দু'বেলা পেট ভর্তি করে খাবারের সামর্থ্য নেই। আল্লাহ্ যাদেরকে এসব নিয়ামত দিয়েছেন তারা এসব কি কাজে ব্যয় করেছে তার হিসাব তিনি নিবেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ্র সকল নিয়ামতের সঠিক ব্যবহার করা।

যাদের চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাদের পরিত্রাণ নেই

হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ যাদের চুলচেরা হিসাব নিবেন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন কারো হিসাব গ্রহণ করা হলে সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, আমি তখন আল্লাহ্র এ উক্তি তাঁকে পড়ে শুনালাম, "যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাব সহজতর হবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটা হল হিসাব পেশ। আর কিয়ামতের দিন যার (চুলচেরা) হিসাব নেওয়া হবে তার শাস্তি ছাড়া নিস্তার নেই।"

এটা ঠিক যে, আল্লাহ্ তাঁর নেক বান্দাদের হিসাব সহজ করেই নিবেন। এ জন্য আমাদেরকে সবসময় আল্লাহ্র কাছে সহজ হিসাব নেওয়ার জন্য দোয়া করতে হবে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় নামাযে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্ আমার কাছ থেকে সহজভাবে হিসাব নিও।

www.pathagar.com

হাক্কুল্লাহর মধ্যে আল্লাহ প্রথম নামাযের হিসাব নিবেন

আল্লাহ তাআলা আখিরাতে দুনিয়ার সব কিছুর হিসাব নিবেন। আমরা আমাদের জীবন কিভাবে কাটিয়েছি, কিভাবে তাঁর দেওয়া নিয়ামত ভোগ করেছি। সবকিছু সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব। তবে সবকিছুর আগে নামায সম্পর্কে জানতে চাইবেন, আমরা ঠিক মত নামায আদায় করেছি কিনা?

দুঃখের বিষয়, দুনিয়াতে অনেকেই ঠিক সময়ে অফিসে যান। ঠিক সময়ে খাবার খান, ঠিক সময়ে ঘুমান। কিন্তু ঠিক সময়ে নামায পড়েন না। কেউ কেউ আছেন নামায পড়লেও যথাসময়ে পড়েন না। কাযা করেন। আবার কেউ আছেন মৌসুমী নামাযী। তারা ঈদের নামায বা জুমআর নামায পড়েন, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন না। আবার কেউ আছেন যারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়েন। নামায না পড়লে লোকে কি বলবে? আর কেউ কেউ তো আছেন, নামে মুসলিম কিন্তু জীবনে নামায তো পড়েন না; বরং নামাযকে ব্যঙ্গ করেন। আযানকে বেশ্যাদের আহ্বানের সাথে তুলনা করেন। আবার কেউ আছেন, যারা যথাসময়ে খুশূ ও খুযূ সহকারে নামায আদায় করেন। বৃদ্ধ বয়সেও মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার চেষ্টা করেন।

হাশরের ময়দানে আল্লাহ প্রথমেই নামাযের হিসাব নেওয়ার কারণ হল, যারা আল্লাহকে ভয় করে যথাযথভাবে নামায আদায় করে তারা দুনিয়াতে খারাপ কাজ করতে পারে না।

এ কথাই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "নিশ্চয়ই নামায (মানুষকে) পঙ্কিলতা ও কু-কাজ থেকে বিরত রাখে।"

দুনিয়াতে আমরা এত পাপাচার দেখার কারণ হল, আজকের সমাজে নামাযের গুরুত্ব নেই। অনেকেই তো নামায পড়েন না। আর যারা পড়েন তাদের মধ্যে অনেকেই খুশূ তথা বিনয়ের সাথে আদায় করেন না। তাই নামায পড়ার পরও পাপকাজে লিপ্ত হতে দেখা যায়।

আজকে আমাদের ভাবতে হবে, নামায সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হব-এ অনুভূতি নিয়ে আমরা নামায আদায় করছি কিনা? যারা দুনিয়াতে নামায পড়ে না তাদেরকে হাশরের ময়দানে নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তারা সদুত্তর দিতে পারবে না। তবে মজার ব্যাপার হল, ফাঁকিবাজরা সেখানেও ফাঁকি দিতে চাইবে। আল্লাহ যখন জানতে চাইবেন, তোমরা কে কে নামায পড়েছ? সেদিন সবাই বলবে, আমরা নামায পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তাহলে আজ আমাকে একটি সেজদা কর। সে সময় শুধু তারাই সেজদা করতে পারবে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে সেজদা করত। আর যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে সেজদা করত না তাদের পক্ষে সেজদা করা সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

হাক্কুল ইবাদের মধ্যে রক্তপাতের হিসাব প্রথম নেওয়া হবে

বিচার-ফয়সালার সময় আল্লাহর কাছে সব কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। একজন মানুষ আল্লাহর হুকুম-আহকাম কতটুকু পালন করেছে তার হিসেবের পাশাপাশি অন্য মানুষের সাথে সে কেমন আচরণ করেছে তারও হিসাব দিতে হবে। তবে মানুষের সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল? কারো সাথে কোন অন্যায় আচরণ করেছে কিনা তার হিসাব নেওয়ার সময় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হবে সে কাউকে খুন করেছে কিনা? তার ইন্ধনে কোন রক্তপাত হয়েছে কিনা? কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে খুন করে তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ্ সরাসরি তার বান্দার সাথে কথা বলবেন

হাশরের ময়দানে বিচার-ফয়সালার সময় আল্লাহ্ সরাসরি তার বান্দার সাথে কথা বলবেন। সেখানে কোন দোভাষী থাকবে না। আল্লাহ্ সরাসরি যখন কোন বিষয় জানতে চাইবেন তখন নেক বান্দারা সবকিছু খুলে বলবে। কিন্তু অপরাধীরা অনেক কিছু লুকাবার চেষ্টা করবে। যখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা এ অন্যায় করেছো, তারা বলবে না আমরা করিনি। তখন তাদের সামনে তাদের রেকর্ড পেশ করা হবে। রেকর্ড যখন পড়তে বলা হবে তখন তারা বলবে রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে ফেরেশতারা কম-বেশি করেছে। এরপর আল্লাহ্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে বলবেন।

নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে

দুনিয়াতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর আদালতে তার সুযোগ নেই। সেদিন প্রত্যেকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিজের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-"আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" (ইয়াসীন ঃ ৬৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আমরা তেল সাবান লাগাই, যেসব অঙ্গ আমাদের খুবই প্রিয়, একটু ব্যথা পেলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যাই, সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একদিন আমাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। আর এ সাক্ষ্য হবে সম্পূর্ণ বাস্তব ও নিরপেক্ষ। সেদিন আমার চোখ বলে দেবে আমি কোন অন্যায় কিছু চোখ দ্বারা দেখেছি কিনা? হাত সাক্ষ্য দেবে হাত দ্বারা এমন কিছু স্পর্শ করেছি কিনা যা অন্যায়। অথবা অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত করেছি কিনা। আমার পা সাক্ষ্য দেবে পা দ্বারা হেঁটে আমি মসজিদে গেছি নাকি

www.pathagar.com

সিনেমা হল বা মদের আসর অথবা অন্য কোন খারাপ কাজে গিয়েছি। কান সাক্ষ্য দিবে তার সাহায্যে কি শ্রবণ করেছি। শরীরের সাথে লেপটে থাকা চামড়া তার যাবতীয় কাজের সাক্ষ্য দেবে। এভাবে আমার সকল অঙ্গ আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। সে দিন অপরাধী বলবে, তোমরাও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবে, "আজ যে আল্লাহর হুকুমে সব কিছু চলছে। তাঁরই হুকুমে আমরা চলছি।"

আমরা দুনিয়াতে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে ব্যবহার করব এক্ষেত্রে স্বাধীন। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে বলে দিতে পারতেন, হাত দ্বারা কেউ যদি অন্যায় কিছু করতে চায় তাহলে হাত যেন অবশ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা করেননি। কেননা আল্লাহ্ দুনিয়াতে মানুষকে পরীক্ষা করতে চান। কে তাঁর হুকুমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালিত করে। আর কে নিজ মনমত পরিচালিত করে।

আল্লাহ্ তাআলা এভাবে একজন মানুষের দুনিয়ার জীবনে হিসাব নেওয়ার পর বিচারের রায় ঘোষণা করবেন।

বিচারের রায়

আল্লাহর বিচারে সেদিন ঃ

১. যাদের নেকের পাল্লা ভারী হবে তারা সাথে সাথে বেহেশতবাসী হবে।

২. যারা কাফির-মুশরিক তথা আল্লাহর অবাধ্য বান্দা, তারা চির জাহান্নামী হবে।

৩. যাদের নেক ও বদ সমান সমান হবে, তারা হবে আরাফের অধিবাসী। যারা দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কিন্তু কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন "এবং আরাফের উপর অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তাদের নিদর্শন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। যখন তাদের দৃষ্টি দোযখীদের উপর পড়বে, তখন বলবে হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথী কর না। আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের নিদর্শন দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না।" (আরাফ ঃ ৪৬-৪৮)

www.pathagar.com

৪. একদল জাহান্নামে কিছু শাস্তি ভোগ করে তারপর জান্নাতে যাবে। আর তারা হল, যাদের হৃদয়ে ঈমান আছে; কিন্তু তারা ফাসেক। যাদের নেকের তুলনায় বদ বেশি। তারা পাপ এর শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহর রাসূলের সুপারিশে জান্নাতে যাবে।

বিচারের পর জান্নাতীদের আনন্দ ও জাহান্নামীদের বেদনা

সেদিন বিচারের পর জাহান্নামীরা থাকবে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, তাদের চেহারা থাকবে খুবই মলিন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো-মলিন। বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এবার সেই কুফরীর বিনিময়ে আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর। আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" (আলে ইমরান ঃ ১০৬-১০৭)

আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, সেদিন কিছু লোকের চেহারা থাকবে ভীতিকর। আরো হবে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। জ্বলন্ত অঙ্গারে জ্বলে এদের চেহারা ঝলসে যাবে। ফুটন্ত পানির কুয়া থেকে এদের পানীয় পান করানো হবে। খাবার হিসেবে কাঁটাযুক্ত খড় ছাড়া আর কিছুই তাদের জন্য থাকবে না। এ খাবার যেমন তাদের পুষ্ট করবে না, তেমনি এ দ্বারা তাদের ক্ষুধাও মিটবে না। (আবার এদের পাশাপাশি) কিছু চেহারা থাকবে সজীব। তারা তাদের (দুনিয়ার জীবনের) চেষ্টা-সাধনার (সফলতার) জন্য ভীষণ খুশি হবে। (তারা থাকবে) আলীশান জান্নাতে। সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না। তাতে থাকবে প্রবহমান ঝরনাধারা। এতে উঁচু সুসজ্জিত আসন থাকবে। পাশে সাজানো থাকবে নানা ধরনের পানপাত্র। (আরাম আয়েশের জন্য থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ। (আরো থাকবে) সযত্নে পেতে রাখা উৎকৃষ্ট কার্পেটের বিছানা। (গাশিয়া ঃ ২-১৫)

বিচারের পরবর্তী অবস্থা সূরা আবাসাতে এভাবে উল্লেখ আছে, "(তারপর বিচার শেষে দেখা যাবে) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা সেদিন (আনন্দ-উল্লাসে) উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে উঠবে। হাসিমুখগুলো খুশিতে টগবগ করে উঠবে। (অপরদিকে) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা হয়ে যাবে এমন যে তার ওপর থাকবে ধুলোবালি। কদাকার ও মলিনতায় তা ছেয়ে যাবে। এই লোকগুলোই হল অবিশ্বাস ও পাপাচারী। (আবাসা ঃ ৩৮-৪২)

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিচার পরবর্তী জান্নাতীদের খুশি ও জাহান্নামীদের হতাশার কথা উল্লেখ আছে। আমরা দুনিয়ার বিচারেও দেখি,

www.pathagar.com

কেউ শাস্তিপ্রাপ্ত হলে বিচারের কাঠগড়াতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি পত্রিকায় খবর বের হয়েছে, একজন আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার রায় ঘোষণার সাথে সাথে আদালতের কাঠগড়াতেই হাতে থাকা ধারালো ব্লেড দ্বারা নিজ গলা নিজে কেটে ফেলে। ফলে সে মারা যায়। কিন্তু আখিরাতে এভাবে কিছু করার সুযোগ নেই। প্রত্যেকের সাথে থাকবে ফেরেশতা। তারা হাঁকিয়ে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে জান্নাতীদের জান্নাতে নিবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক সূরা যুমারে ইরশাদ করেন, "কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল আসেনি। যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং এদিনের সাক্ষাতের সতর্ক করত? তারা বলবে, হ্যাঁ। কিন্তু কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। (তাদেরকে) বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। (আর) যারা তাদের পালনকর্তার ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার! (যুমার ঃ ৭১-৭৪)

কুরআনের এসব বাণী থেকে পরিষ্কার যে, বিচার-ফয়সালা হয়ে যাবার পর জাহান্নামীদেরকে ফেরেশতারা টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতীদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হবে।

শাফায়াত

শাফায়াত অর্থ সাহায্য প্রার্থনা, শাস্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য মাধ্যম গ্রহণ। শব্দটির উৎপত্তিস্থল শাফউন, এর অর্থ হল জোড়। কেননা যে ব্যক্তি অপরের নিকট শাফায়াত কামনা করেন তিনি একা থাকেন না। তাঁর সাথে সুপারিশকারী যুক্ত হয়ে দু'জন তথা জোড়া হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

দুনিয়াতে কোন কল্যাণকর কাজে জীবিত কোন মানুষের সুপারিশ গ্রহণ করা বৈধ। কেউ যদি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তার অধিকার লাভের জন্য কারো সুপারিশ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কোন অপরাধমূলক কাজে কাউকে সুপারিশ করা বা কারো সুপারিশ গ্রহণ করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কোন মৃত মানুষের কবরে গিয়ে কিান কিছু চাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অথচ বর্তমান সমাজে অনেককেই দেখা যায়, মৃত কারো মাজারে গিয়ে অভাব মোচন বা চাকরি পাবার জন্য আকুতি জানায়। এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

কারো কারো ধারণা, কোন বিশেষ ব্যক্তির পথ অনুসরণ করলে আখিরাতে তিনি সুপারিশ করবেন। এটা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। আখিরাতে আল্লাহ্ কাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। সেদিন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না।

কুরআন হাদীস থেকে জানা যায় যে, আখিরাতে আল্লাহর অনুমোদিত বান্দারাই কেবল আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবেন। সূরা হুদের ১০৫ নম্বর আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "(কিয়ামত) যখন আসবে তখন কারো পক্ষে কথা বলা সম্ভব হবে না। তবে আল্লাহর অনুমতি নিয়ে কিছু বললে অন্য কথা।" এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ করা যাবে। সূরা নাবার ৩৮ নম্বর আয়াতে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "যে দিন রূহ্ ও ফেরেশতা কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবে, কেউ টু শব্দ করতে পারবে না। কিন্তু সে লোক ব্যতীত যাকে পরম দয়াবান অনুমতি দান করবেন এবং সে যথাযথ কথা বলবে।"

উল্লেখ্য যে, যারা সুপারিশ করার অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন, তাঁরা শুধু তার পক্ষে সুপারিশ করতে পারবেন যার জন্য আল্লাহ্ সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। সেদিন শাফায়াতের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কেবল অনুমোদিত ব্যক্তিদের জন্যই সুপারিশ করতে পারবেন। ইচ্ছামত কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তিনি যার প্রতি সন্তুষ্ট, তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারবে। বস্তুত সেদিন তারা তাঁর ভয়েই ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।" (আম্বিয়া ঃ ২৮)

এ শাফায়াত দু ধরনের হবে

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত। কিয়ামতের দিন বিচার-ফয়সালা শুরু করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ এবং জান্নাতের দরজা খোলার জন্য শাফায়াত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস।

www.pathagar.com

২. আল্লাহর অনুমতিপ্রাপ্ত নেক বান্দাদের শাফায়াত। এ শাফায়াত শুধু পাপী মুমিনদের জন্য হবে। ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য শাফায়াত থাকবে। (তাঁরা হলেন) নবীগণ, আলেমগণ, শহীদগণ। একটি হাদীসে আছে, শহীদগণ তার বংশের সত্তর জনের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারবেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আরেক হাদীস থেকে জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য কাতারবন্দি করার পর তাদের পাশ দিয়ে জান্নাতবাসী একজন হেঁটে যাবার সময় জাহান্নামীদের একজন বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তুমি কি আমাকে চেন না? আমি তো সেই যে তোমাকে পানি পান করিয়েছিলাম। তাদের কেউ কেউ বলবে, আমি তো সেই ব্যক্তি যে তোমাকে অযুর জন্য পানি দিয়েছিলাম। তারপর ঐ জান্নাতী তার জন্য সুপারিশ করবে অতঃপর সে জান্নাতে যাবে। (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর নেক বান্দাদের শাফায়াত সম্পর্কে কুরআনেও বর্ণনা এসেছে। কুরআনে শাফায়াত প্রসঙ্গে বহুবচন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "শাফায়াতুশ শাফেয়ীন।" এ থেকে বুঝা যায়, নবী-রাসূল ছাড়াও আল্লাহর অনুমতিপ্রাপ্ত নেক বান্দারা সুপারিশ করতে পারবেন। তবে এ ধরনের সুপারিশ পাবার জন্য কোন মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়ে সুপারিশ ভিক্ষা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। হাশরের ময়দানে কঠিন মুহূর্তে সবাই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশের প্রত্যাশী হবে।

শরহে আকীদাত আত তাহাবিয়্যা নামক গ্রন্থে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াতের ধরন সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ আছে ঃ

১. শাফায়াতে উযমা বা মহা শাফায়াত। হাশরে ময়দানে বিচার-ফয়সালা শুরু করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ।

২. বেহেশতের দরজা উন্মুক্তকরণের জন্য সুপারিশ। আল্লাহর রাসূলের উম্মতই প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

৩. পাপ-পুণ্য সমান-এমন উম্মতের জন্য বেহেশতের সুপারিশ করবেন।

৪. জান্নাতবাসী উম্মতের পজিশন বুলন্দ করার জন্য সুপারিশ।

৫. কিছু উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশত দানের জন্য সুপারিশ। হযরত আবূ উমামা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে জান্নাত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন।

www.pathagar.com

এখানে সত্তর হাজার বলতে অসংখ্য বুঝানো হয়েছে; নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হয়নি।

৬. পাপী উম্মত—যাদের দোযখের ফয়সালা হয়ে গেছে, তাদেরকে মুক্তি দানের সুপারিশ।

৭. পাপী উম্মত—যারা দোযখে জ্বলছে তাদের জন্য সুপারিশ। ফলে রাসূলের উম্মত—যাদের হৃদয়ে শির্কমুক্ত ঈমান ছিল তারা সবাই সাময়িক শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে। কেউ দোযখে থাকবে না। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারা কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছে তারা সবাই জান্নাতে যাবে। কিছু সংখ্যক পাপ অনুযায়ী কিছুদিন জাহান্নামে থাকবে।

তবে এক মুহূর্ত জাহান্নামে থাকা কতই না অসহনীয়! আমরা দুনিয়ার আগুনে কি হাত রাখতে পারি। আর এ আগুন জাহান্নামের তুলনায় ধোঁয়াও নয়। তাই আমাদেরকে সবসময় জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত পাবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে এবং নেক আমল করতে হবে।

সেদিন কাফির-মুশরিকদের জন্য কেউ সুপারিশ করবে না। যারা আল্লাহর অবাধ্য তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "হে নবী! তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও, তাদের ব্যাপারে সবই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ ফাসিক লোকদের কখনও সঠিক পথ দেখান না। (মুনাফিকুন ঃ ৬)

আখিরাতে সুপারিশ পাবার আশায় দুনিয়াতে যারা মূর্তিপূজা করে বা শির্ক-বিদআতের কাজ করে এসব তাদের কোন উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ এ ধরনের ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডন করে বলেন, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্য শাফায়াতকারী বানিয়ে নিয়েছে? তাদেরকে বলো, তাদের কোন ক্ষমতা না থাকলে এবং কিছু না বুঝলেও কি তারা সুপারিশ করবে? বলো সমস্ত শাফায়াত তো কেবলমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। (যুমার ঃ ৪৩-৪৪)

হাউজে কাওসার

আল্লাহ তাআলা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাউজে কাওসার (বিশেষ কূপ) উপহার দিয়েছেন। হাশরের ময়দানে মানুষ যখন পানি পানি করে চিৎকার করতে থাকবে, সে সময় তিনি তাঁর উম্মতকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি

www.pathagar.com

বলেন, আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রশ্ন করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনি কি আমার জন্য সুপারিশ করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ করব। তাহলে অমি কোথায় আপনাকে পাব? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথমেই আমাকে পুলসিরাতে খোঁজ করবে। তখন আমি বললাম, সেখানে না পেলে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারপর মীযানে (অর্থাৎ যেখানে আমল ওযন করা হবে) আমি আবার বললাম সেখানে না পেলে? তখন তিনি বললেন, তাহলে হাউজে কাওসারের কাছে খোঁজ করবে। (এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) নিশ্চয়ই আমি এ তিন স্থানে থাকতে ভুলে যাব না। (তিরমিযী)

হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতন ভাব দেখা দিল। তারপর তিনি সহাস্যে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, এ মুহূর্তে আমার কাছে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমরা জান কাউসার কি? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার রব এটা আমাকে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে এ হাউজে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতারা হাউজ থেকে হটিয়ে দেবেন। আমি বলবো, আল্লাহ! সে তো আমারই উম্মত। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে সে নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ছাওবান (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, হাউজে কাউসার হবে দুধের চেয়ে সাদা আর মধুর চেয়ে সুমিষ্ট। কেউ একবার এখান থেকে পানি পান করলে আর কখনও পানির পিপাসা হবে না।

এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, হাউজে কাউসারের পানি পান করার জন্য অন্ধকার আকাশে দৃশ্যমান অসংখ্য নয়নাভিরাম তারকারাজির ন্যায় বেহেশতী পানপাত্র থাকবে। এখান থেকে পানীয় গ্রহণ করলে কেউ দ্বিতীয়বার পিপাসিত হবে না। বেহেশত থেকে দুটি প্রস্রবণ এসে এ কূপের

www.pathagar.com

সাথে মিলিত হবে। এখান থেকে একবার পানি পান করার পর আর কখনও পিপাসা অনুভূত হবে না। আম্মান থেকে আইলা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমির ন্যায় এটা প্রশস্ত। এর পানীয় দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট। (বুখারী)

পুলসিরাত

পুলসিরাত হল খুবই সরু ব্রীজ বা সেতু। এটা চুলের চেয়ে চিকন এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। এ পুলসিরাত দ্বারাই হাশরের ময়দান ঘেরা থাকবে। হাশরের ময়দানে বিচার-ফয়সালার পর পুলসিরাত পার হয়েই জান্নাতীদের জান্নাতে যেতে হবে। তারা বিভিন্ন গতিতে পুলসিরাত পার হবে। কেউ বিদ্যুতের মত এক পলকে চলে যাবে। কেউ বিজলীর মত, কেউ বায়ুর গতিতে আর কেউ ঘোড়ার গতিতে। কেউ দৌড়িয়ে আর কেউ হেঁটে হেঁটে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। আর জাহান্নামীরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। তারা পুলসিরাত পার হবার সময়ই জাহান্নামে পড়ে যাবে। প্রত্যেককেই পুলসিরাত পার হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, পুলসিরাতের উপর আরোহণ করবে না। এটাতো একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকৃত কথা। তা পূরণ করা তোমার রবের দায়িত্ব।" (মারইয়াম ঃ ৭১)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেককে পুলসিরাত পার হতে হবে। আর প্রত্যেককেই দোযখের উপর দিয়ে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নামের উপর দিয়ে কিয়ামতের সেতু স্থাপন করা হবে। সেদিন আমি এবং আমার উম্মতই প্রথমে সেই বৈতরণী পার হব। নবী-রাসূল ছাড়া কেউ সেদিন কোন কথা বলতে পারবে না। রাসূলগণ সেদিন বারবার এ দোয়া পড়তে থাকবে, "হে আল্লাহ্! শান্তি দাও, শান্তি দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে মুফতী শফী (র) বলেন, হাদীস থেকে জানা যায় যে, কাফির-মুশরিকদেরকে ডাইরেক্ট জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তাদের পুলসিরাতে চড়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে ঈমানদাররা ঈমানের আলোতে বিজলীর মত পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। তাদের আলোতে মুনাফিকরা চলতে চাইবে। ঈমানদারদেরকে ডেকে ডেকে বলবে একটু কাছে এসো, তোমার আলো দ্বারা উপকৃত হই। সে সময় ফেরেশতারা বলবে, পেছনে ফিরে যাও। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝখানে একটা প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবল আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে।

www.pathagar.com

এখন একটু চিন্তা করা দরকার, আমরা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য কি সবসময় চেষ্টা করি? আমরা কি আমাদের ঝোঁক প্রবণতা, কামনা-বাসনা সবকিছু আল্লাহ্‌র রাসূলের আদর্শের অনুবর্তী বানাতে সক্ষম হয়েছি? যদি আল্লাহ্‌র রাসূলের আদর্শের অনুবর্তী বানাতে না পারি তাহলে আমরা কি আখিরাতে তাঁর সুপারিশ পাবো? আমরা কি হাউজে কাউসারের সুপানীয় পান করতে পারব? আমরা কি বিজলীর মত পুলসিরাত পার হতে পারব? আর এ পুলসিরাত পার হয়েই তো আমাদেরকে জান্নাতে যেতে হবে। যদি তা পার হতে না পারি তাহলে জাহান্নামে পড়ে যেতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

নূর বা আলো বণ্টন

পুলসিরাতে চড়ার পূর্ব মুহূর্তে ঈমানদার ব্যক্তিদের মাঝে আলো বণ্টন করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন, "সেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের আগে ও ডান দিকে ছুটোছুটি করবে।" (তাহ্‌রীম ঃ ৮)

মুফতী শফী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেন, এখানে সেদিন বলে কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার বিষয়টি পুলসিরাতে চলার কিছু আগে ঘটবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ উমামা বাহেলী (র) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস আছে। হাদীসটির সারকথা হল, হযরত আবূ উমামা একদিন দামেশকের এক জানাযায় শরীক হন। তিনি জানাযা শেষে উপস্থিত লোকজনকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে এবং অপর কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক মনযিলে সব মুমিন কাফিরকে অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেওয়া হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণ নূর দেওয়া হবে। ফলে কারো নূর পর্বতসম, কারো নূর খেজুর বৃক্ষসম, কারো নূর মানবদেহ সম হবে। সবচেয়ে কম নূর যেই ব্যক্তির হবে, তার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে। তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে।

দুনিয়াতেও দেখা যায়, মানুষ অন্ধকার রজনীতে চলাফেরা করার সময় লাইট ব্যবহার করে। এক ব্যাটারির লাইটের আলো আর তিন ব্যাটারির লাইটের

www.pathagar.com

আলো সমান হয় না। যত বেশি ব্যাটারির লাইট হয় তত বেশি আলো হয়। তেমনিভাবে আখিরাতে পুলসিরাত পার হওয়ার আগে মুমিনদের মধ্যে যে আলো বণ্টন করা হবে তা সমান হবে না। ঈমানদার ব্যক্তিদের নেক আমলের কম-বেশির উপর আলো বণ্টনে কম-বেশি করা হবে। আর যেসব কাফির দুনিয়াতে ঈমানের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল, তাদের ভাগ্যে সেদিন কোন আলোই জুটবে না। দুনিয়াতে একজনের লাইটের আলোতে আরেকজন চলতে পারে; কিন্তু আখিরাতে পুলসিরাত পার হওয়ার সময় একজনের আলোতে আরেকজন চলতে পারবে না।

জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করা হবে

দুনিয়াতে বিভিন্ন কারণে একে-অপরের সাথে মনোমালিন্য হতে পারে। জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের আগে তাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করে দেওয়া হবে। এরপর কারো মনে কারো প্রতি কোন দুঃখ থাকবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে। তারা বলবে, আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।" (আরাফ ঃ ৪৩)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের আগেই পরস্পরের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। তারা একে অপরের ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং প্রীতিময় পরিবেশে বসবাস করবে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, মুমিন বান্দারা যখন পুলসিরাত পার হয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর থামিয়ে দেওয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারো প্রতি কারো কোন কষ্ট থাকে অথবা কারো কাছে যদি কারো পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে এ পুল বাহ্যত পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ূতীসহ অনেকেই এ মত সমর্থন করেছেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জান্নাত

দুনিয়াতে কোন বিশেষ মেহমান এলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বেহেশতেও বেহেশতবাসীকে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তাদেরকে ফেরেশতা এবং কিশোররা সংবর্ধনা দেবে। আর জান্নাতীদেরকে ফেরেশতারা সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাদের আসনের কাছে নিয়ে যাবে। ফেরেশতারা তাদের আসন দেখিয়ে দেবে এবং হুরদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। তাদেরকে জান্নাতের প্রহরীরা ওয়েলকাম জানাবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সর্বদা বসবাসের জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।" (যুমার ঃ ৭৩)

মূলত জান্নাতের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ সম্পর্কে দুনিয়ায় বসে কল্পনা করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কোন দিন দেখেনি, কোন কান কোন দিন তার বর্ণনা শুনেনি। আর কোন মানুষ কোন দিন তা ধারণা বা কল্পনাও করতে পারেনি। এ কথার সমর্থনে তোমরা এই আয়াত পাঠ করতে পার। নেক কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য নয়নাভিরাম যেসব সামগ্রী সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, তা কোন ব্যক্তিই জানে না।" (সাজদা ঃ ১৭)

জান্নাতের আট তোরণ প্রসঙ্গে

জান্নাতে জান্নাতীরা তাদের নেক আমলের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত, জান্নাতে অনেকগুলো দরজা থাকবে। একেক দরজা দিয়ে একেক শ্রেণীর নেক বান্দারা প্রবেশ করবে।

জান্নাতে যে অনেক প্রবেশ-তোরণ থাকবে তার সমর্থনে অনেক আয়াত উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ্ তাআলা সূরা ছোয়াদে ইরশাদ করেন, "এ এক মহৎ আলোচনা। খোদাভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।" (ছোয়াদ ঃ ৪৯-৫০)

এ আয়াতে আল্লাহ্ জান্নাতের দ্বার বুঝানোর জন্য একবচন 'বাব' শব্দের পরিবর্তে বহুবচন 'আবওয়াব' শব্দ উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে সূরা যুমারের ৭৩ নম্বর আয়াতেও 'আবওয়াব' শব্দ উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের আটটি দরজা হবে। রাইয়্যান নামক দরজা দিয়ে রোযাদাররা প্রবেশ করবে।" হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ নামাযীদেরকে 'বাব আস সালাত,' মুজাহিদদেরকে 'বাব আল জিহাদ,' দান- সদকাকারীদেরকে 'বাব আস সদকা' এবং রোযাদারকে 'বাব আর রাইয়্যান' দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আহ্বান জানাবেন। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, দুনিয়াতে যারা যে ধরনের নেক আমল করতে বেশি ভালবাসতো তাদেরকে আখিরাতে তাদের সাথেই থাকতে দেবেন যারা সে ধরনের আমল করত।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন মানুষকে নামায, রোযা, সদকা সব কিছুই পালন করতে হয়। তাহলে কিভাবে তার দরজা ঠিক করা হবে? এর জবাবে বলা হয়, ফরয নামায, রোযা তো সকলকেই করতে হয়। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে ধরনের নফল ইবাদত বেশি করবে, তাদেরকে সেভাবেই আখিরাতে ডাকা হবে। আর যারা বিভিন্ন ধরনের নেক আমল করতেন তাদের মনের ঝোঁক যে নেক আমলের প্রতি বেশি থাকে তাদেরকে সে ধরনের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের জন্য বলা হবে। আর যারা নামায ও রোযা, জিহাদ, দান-সদকাসহ অনেক ধরনের নেক আমলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দুনিয়াতে সম্পাদন করেন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে চাও, করতে পার।" এভাবে আরো অনেক নেক আমলকারী সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে, তাদেরকে জান্নাতের যে-কোন তোরণ দিয়ে প্রবেশ করার এখতিয়ার দেওয়া হবে। যেমন এক হাদীসে আছে, "যিনি উত্তমভাবে অযু করবে অতঃপর বলবে, 'আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে যে-কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।" জান্নাতের এক দরজা থেকে আরেক দরজা অনেক দূরে থাকবে। এক হাদীস অনুযায়ী মক্কা ও বসরার মধ্যে যে ধরনের দূরত্ব, এক দরজা থেকে আরেক দরজা সে ধরনের দূরত্বে থাকবে। হিসেব করে দেখা গেছে, মক্কা থেকে বসরার দূরত্ব হল ১১,২৫০ কিলোমিটার।

জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

জান্নাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একেক স্থানে একেক ধরনের বেহেশতী আমেজ থাকবে। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে অনেক বিবরণ এসেছে। নিম্নে জান্নাতের বিভিন্ন স্থানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

www.pathagar.com

১. ফেরদাউস— এটা মূলত জান্নাতের এক সুন্দর বাগান। হযরত কা'ব (রা) বলেন, এ বাগানে থোকা থোকা আঙুর সুশোভিত থাকবে। দাহ্হাক বলেন, এটা গাছ-গাছালিতে ভরপুর থাকবে। এ জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা শীতল ছায়াময় (ফেরদাউস) উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" (মুমিনূন ঃ ১০-১১)

কারা এ জান্নাতের উত্তরাধিকার লাভ করবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যারা নামাযে বিনয়ী, বিনম্র। যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত। যারা যাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে এবং যারা তাদের নামাযসমূহের হেফাযত করে।" (মুমিনূন ঃ ২-৯)

২. নাঈম—এটা হবে নানা ধরনের নিয়ামতে ভরপুর। খাবার, পানীয়, পোশাক ও মনোমুগ্ধকর ছবিসহ অনেক কিছু এখানে শোভা পাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে ভরা জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্র ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (লুকমান ঃ ৮-৯)

৩. মাওয়া—এ জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। যার কাছে অবস্থিত বসবাসের (মাওয়া) জান্নাত।" (নাজম ঃ ১৩-১৫) মুফতী শফী (র) লিখেন, মাওয়া অর্থ ঠিকানা, আশ্রয়স্থল। এ জান্নাতকে মাওয়া বলার কারণ হল, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। হযরত আদম (আ) এখানেই সৃজিত হন। এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে। হযরত আতা বলেন, মাওয়া হল হযরত জিবরাঈল (আ)-সহ অন্যান্য ফেরেশতাদের অবস্থানস্থল।

৪. দারুস সালাম—এর নাম আস্ সালাম রাখার কারণ হল এখানে কোন ধরনের কষ্ট কেউ অনুভব করবে না। সব ধরনের খারাপ বা অপছন্দনীয় বস্তু থেকে জান্নাতীরা মুক্ত থাকবে। ফেরেশতারা সালাম দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। তারা সবসময় শান্তি বর্ষণের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তা হল বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

www.pathagar.com

বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম গৃহ কতই না চমৎকার!" (রাদ ঃ ২৩-২৪) আল্লাহ্ তাআলা এ শান্তিময় স্থানের প্রতিই তাঁর বান্দাদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আর আল্লাহ্ শান্তি-নিরাপত্তার আবাসের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।" (ইউনুস ঃ ২৫) আল্লাহ্ তাআলা এ শান্তিময় স্থানের বিবরণ অন্যত্র এভাবে দিয়েছেন, "সেখানে তাদের প্রার্থনা হল 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্!' আর শুভেচ্ছা হল 'সালাম' এবং তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়' 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য বলে।" (ইউনুস ঃ ১০)

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী বলেন, জান্নাতীদের যখন কোন কিছুর ইচ্ছা হবে তখন তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ বাক্যটি শুনার সাথে সাথে ফেরেশতারা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু এনে দিবেন। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, জান্নাতীদের কোন কিছু মুখে চাইতে হবে না। মনে কোন কিছুর কল্পনা হলেই আল্লাহ্ তা তাদেরকে দিয়ে দিবেন। তারা সবসময় নিয়ামতের ভেতর ডুবে থাকবে। এ কারণে সবসময় তারা খুশিতে বাক বাক থাকবে। তারা কোন কিছু চাওয়ার জন্য 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবে না। বরং এটা বলে তারা মনে সুখ অনুভব করবে। আর স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা অথবা ফেরেশতারা তাদেরকে 'সালামুন আলাইকুম' বলে খোশ আমদেদ জানাবে।

৫. দারুল মাকাম—এর অর্থ হল বাসস্থান। জান্নাত (জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহর শুকরিয়া) বসবাসের জন্য সর্বোত্তম স্থান। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন। তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি।" (ফাতির ঃ ৩৫)

৬. দারুল খুলদ—জান্নাতকে এ কারণে দার আল খুলদ বলা হয় যে, এটা জান্নাতীদের স্থায়ী আবাস। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের অনেক জায়গায় জান্নাত প্রসঙ্গে বলেছেন, "খালিদীনা ফিহা আবাদা" অর্থাৎ জান্নাতীরা সবসময় জান্নাতের ভেতরেই থাকবে। তাদেরকে দুনিয়ার মত কিছুদিন পর বাসা পরিবর্তন করতে হবে না।

৭. আদ্ন—আদন বলা হয় যেখানে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আস্তানা করে। জান্নাতে জান্নাতীরা স্থায়ীভাবেই থাকবে। আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত আর বসবাসের জন্য জান্নাত (আদ্ন) উত্তম বাসগৃহ। এটা মহাসাফল্য।" (ছাফ ঃ ১২)

www.pathagar.com

তিনি অন্যত্র বলেন, "(আদ্‌ন) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তাঁর ওয়াদায় তারা পৌঁছবে।" (মারইয়াম ঃ ৬১)

৮. দার আল হাইওয়ান—হাইওয়ান মানে জীবন। দুনিয়ার জীবন আসল জীবন নয়। আসল জীবন হল আখিরাতে জান্নাতের জীবন। এ কথার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানতো।" (আনকাবুত ঃ ৬৪) আফসোসের বিষয় হল-মানুষ দুনিয়ার রং তামাশা ভোগ করার জন্য প্রকৃত জীবন সম্পর্কে উদাসীন।

৯. মাকআদ আস্ সিদক—সিদ্‌ক মানে সত্য, খাঁটি। আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাদের জান্নাতে থাকার বিষয়টি সত্য। আর স্থান হিসেবে এটা খাঁটি। আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, "খোদাভীরুরা অবস্থান করবে জান্নাত ও ঝরনাসমূহের মধ্যে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।" (কামার ঃ ৫৪-৫৫)

১০. আল মাকাম আল আমীন—আমীন বলা হয় সে স্থানকে যা সবধরনের খারাপ কিছু থেকে নিরাপদ। জান্নাতে জান্নাতীরা কোন ধরনের বিপদ-মুসিবত বা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে না। এ কারণে জান্নাতকে মাকামে আমীন বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, "নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা নিরাপদস্থানে থাকবে। উদ্যানরাজি ও ঝরনাসমূহে।" (দুখান ঃ ৫১-৫২)

এভাবে জান্নাতের নিয়ামতের অনেক বিবরণ কুরআন ও হাদীসে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "সেখানে যেদিকে তোমরা তাকাবে শুধু নিয়ামত আর নিয়ামত এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম দেখতে পাবে।" (দাহর ঃ ২০)

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জান্নাতের বিবরণ

সৌরভ ও সুগন্ধ সবসময় পাওয়া যাবে

দুনিয়াতে মানুষ সুগন্ধ পছন্দ করে। এ কারণে ফুলবাগানে যায় বা আতর-গোলাপ ব্যবহার করে। দুনিয়াতে আতর-গোলাপ না মাখলে গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু জান্নাতের পরিবেশই এমন হবে যে, সবসময় সৌরভ ছড়াবে। যেদিকেই যাবে সেদিকেই সুগন্ধ নাকে আসবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, জান্নাতে দু'ধরনের সুগন্ধ পাওয়া যাবে। এক ধরনের সুগন্ধ নির্গত হবে জান্নাতীদের শরীর থেকে, আরেক ধরনের সুগন্ধ নির্গত হবে জান্নাতের স্থান থেকে। এ থেকেই অনুমান করা যায়, জান্নাতের পরিবেশ কত মনোরম হবে।

সবুজ শ্যামল বাগান

জান্নাত শব্দের অর্থই হল বাগান। মানুষ বাগানে ঘুরতে পছন্দ করে। বিশেষত সবুজ-শ্যামল বাগিচা মানুষের কাছে খুবই প্রিয়। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।" (রাহমান ঃ ৪৬)

উক্ত সূরায় জান্নাতের বিবরণ আরো এসেছে। যেমন বলা হয়েছে, উদ্যানদ্বয় ঘন শাখা পল্লববিশিষ্ট হবে। যার ফলে এর ছায়াও বেশি হবে এবং ফলও বেশি হবে। অন্যত্র বলা হয়েছে উদ্যানদ্বয় হবে ঘন সবুজ। আর পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরো দুটি উদ্যান রয়েছে। 'দূররে মানসূরে' এর তাফসীরে বলা হয়েছে, স্বর্ণ নির্মিত দু'উদ্যান হবে নৈকট্যশীলদের জন্য এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ ঈমানদারদের জন্য। (মাআরেফ আল কুরআন)

প্রবহমান ঝরনাধারা

মানুষ দুনিয়াতে সাধারণত ঝরনাধারায় আনন্দ উপভোগ করতে যায়। আল্লাহ জান্নাতে যে ঝরনা রেখেছেন দুনিয়ার কোন কিছুর সাথে তার তুলনা করার সুযোগ নেই। মূলত জান্নাতের সবকিছু সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। দুনিয়ার পরিচিত জিনিসের নামেই আল্লাহ এ সবের কথা উল্লেখ করেছেন, মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে। আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, "আর হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্য করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফলপ্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ-তো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতঃপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পূত-পবিত্র রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনাদিকাল অবস্থান করবে।" (বাকারা ঃ ২৫)

www.pathagar.com

দুঃখ-বেদনা বা কোন ধরনের চিন্তা থাকবে না, সবাই সন্তুষ্ট থাকবে

দুনিয়াতে মানুষ কোন না কোন কারণে দুঃখ পায় বা চিন্তিত থাকে। অনেক সময় ভয়-ভীতি কাজ করে। জান্নাতে কারো মাঝে কোন ধরনের চিন্তা বা দুঃখ থাকবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, সেদিন যখন আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া অপর সব বন্ধুরা পরস্পর দুশমন হয়ে যাবে। যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দাহ্ হয়েছিল তাদেরকে সেদিন সম্বোধন করে বলা হবে, 'হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমাদের কোন দুশ্চিন্তায়ও আজ পড়তে হবে না। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে। তাদের সামনে পানপাত্র ও সোনার থালা থাকবে এবং মন ভুলানো ও চোখ জুড়ানো জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে।" (যুখরুফ ঃ ৬৮-৭১)

জান্নাতীদের খাদেম

জান্নাতীদের খেদমত করার জন্য হুরের পাশাপাশি অসংখ্য সেবক দেওয়া হবে। এরা হবে বালক। এদের বয়স কোনদিন বাড়বে না। এরা হবে সেসব বালক যারা বালেগ হবার আগেই মারা যায় এবং তাদের মাতা-পিতা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়। অথবা তারা হবে আল্লাহ্র নতুন সৃষ্টি। জান্নাতীদের সেবা-যত্ন করার জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "তাদের সেবার জন্য এমন সব বালক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে এরা যেন ছড়িয়ে দেওয়া মুক্তা।" (দাহর ঃ ১৯)

কোন বাজে কথা শুনবে না

দুনিয়াতে রাস্তাঘাটে চলতে গেলে কত বাজে কথা শুনা যায়। অনেককে নিরর্থক কথা বলতে শুনা যায়। জান্নাতে কেউ বাজে বা নিরর্থক কথা শুনতে পাবে না। আল্লাহ্ জান্নাত প্রসঙ্গে বলেন, "সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না।" (গাশিয়াহ্ ঃ ১১)

এ প্রসঙ্গে সূরা আন্-নাবাতে ইরশাদ হয়েছে, "তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথাযথ দান।" (নাবা ঃ ৩৫-৩৬)

এ থেকে জানা গেল, জান্নাতীরা কোন ধরনের গালাগালি, মিথ্যা, কুফরী কথা, অপবাদ ও দোষারোপ করে কোন কথা বলবে না। সেখানে কেউ কোন

www.pathagar.com

ধরনের অশালীন কথা শুনবে না। জান্নাতের পরিবেশ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে বিরাজ করবে ভালবাসার মধুর আমেজ। সেখানে তারা থাকবে অনাবিল শান্তির পরিবেশে।

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ এ প্রসঙ্গে তাঁর তাফসীরে লিখেন, "সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না", এ বক্তব্য দ্বারা এক ধরনের শান্ত, নিরিবিলি, নিরাপদ, তৃপ্তিদায়ক, শান্তিদায়ক, প্রীতিময়, সন্তোষে পরিপূর্ণ, ক্লেদমুক্ত, ঝামেলামুক্ত ও বন্ধুদের নিয়ে নির্মল বিনোদনের একান্ত পরিবেশের ছবি ফুটে উঠে। সবধরনের বাজে কথা, অশুভ কথা থেকে সে পরিবেশ হবে সম্পূর্ণ মুক্ত।

বিশেষ উপহার

হুর ও গেলমান

জান্নাতীদের জন্য থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। তারা চারিত্রিক দিক দিয়ে হবে সুশীলা, আর শারীরিক দিক থেকে হবে খুবই সুন্দরী। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "কোন মানব বা জিন পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি।" (রাহমান ঃ ৭৪)

কুরআনে 'তামস' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাফসীরকারকগণ বলেন, তামসের এক অর্থ হায়েযের রক্ত। এ থেকে বুঝা যায়, জান্নাতে রমণীগণ হায়েযমুক্ত থাকবে। এর আরেক অর্থ সহবাস অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে এমন রমণী দেওয়া হবে যাদের সাথে ইতঃপূর্বে কেউ সহবাস করেনি। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়। তারা যা কিছু করত তার পুরস্কার স্বরূপ । (ওয়াকিয়া ঃ ২২-২৪)

জান্নাতে যেসব হুর দেওয়া হবে, তাদের বর্ণনায় কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। কামিনী, সমবয়স্কা।" (ওয়াকিয়া ঃ ৩৭)

তাফসীরকারকগণ 'বিশেষ প্রক্রিয়া'র অর্থ বলেছেন, তাদেরকে প্রজনন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তারা সবসময় কুমারী বালিকার মত থাকবে। সহবাস করার পর আবার কুমারী হয়ে যাবে। প্রত্যেকে হবে সমবয়স্কা। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেকের বয়স হবে তেত্রিশ। প্রত্যেককে যুবতী ও লাবণ্যময়ী করে সৃষ্টি করা হবে। এমনকি দুনিয়াতে যেসব রমণী কদাকার ছিল তারাও সুশ্রী হবে। আর যারা বৃদ্ধ হয়ে মারা গেছে তাদেরকেও জান্নাতে যুবতী করে দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমার গৃহে আল্লাহর রাসূল আগমন করেন। সে সময় আমার কাছে এক বৃদ্ধা বসা ছিল। তিনি জানতে চান তোমার কাছে কে? আমি বললাম আমার এক খালা। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, জান্নাতে কোন বৃদ্ধা যাবে না। এ কথা শুনার পর বৃদ্ধা বিষণ্ন হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না। বরং যুবতী হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, জান্নাতে রমণীরা এত সুন্দরী হবে যে, তাদের উরুর হাড়ের মজ্জা মাংসের ভেতর দিয়ে দেখা যাবে। শুধু রমণীরা নয় জান্নাতী পুরুষরাও হবে সুন্দর, সুঠাম দেহের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার মত উজ্জ্বল হবে। এরপর যারা প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা ঝিকমিক করা তারকার মত আলোকিত হবে। তাদেরকে পেশাব-পায়খানা করতে হবে না; মুখে থুথু আসবে না। আর নাকে ময়লা হবে না। তাদের ঘাম হবে মেশকের মত সুগন্ধময়। তাদের ধূপদানী সুগিন্ধ কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। আয়তলোচনা হুর হবে তাদের স্ত্রী। তাদের দৈহিক গঠন হবে একই রকমের। উচ্চতায় তারা তাদের আদিপিতা আদমের মত ষাট হাত লম্বা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, যেসব স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জান্নাতী হবে তাদেরকে জান্নাতে এক সাথে রাখা হবে। আর যদি স্বামী জান্নাতী না হয় তাহলে স্ত্রীকে অন্য জান্নাতীর সাথে থাকতে দেওয়া হবে। আর যদি কোন নারীর একাধিক স্বামী থাকে তাহলে তারা যদি উভয়েই জান্নাতী হয় সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইখতিয়ার দেওয়া হবে। যাকে সে পছন্দ করবে তার সাথে থাকতে পারবে। আর তাদের একজন যদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাতী স্বামীর সাথে থাকতে দেওয়া হবে।

কিশোরদের সম্ভাষণ

দুনিয়াতেও দেখা যায় যে, কোন বিশেষ অতিথি কোন দেশে গেলে কিশোরদের মাধ্যমে ফুলের তোড়া দেওয়া হয়। জান্নাতে জান্নাতীদেরকে ছোট ছোট কিশোররা সাদর সম্ভাষণ জানাবে। তারা হবে সেসব শিশু যারা নাবালেগ অবস্থায় মারা যায়। আর তারা এরা, যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতীদের সেবা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা। পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা

www.pathagar.com

হাতে নিয়ে। যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখির মাংস নিয়ে।" (ওয়াকিয়া ঃ ১৭-২১)

যা চাইবে তাই পাবে

জান্নাতে জান্নাতীতের কোন কামনা-বাসনা অপূর্ণ থাকবে না। সেদিন তারা যা চাইবে আল্লাহ তাদেরকে তা-ই দান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "সেখানে তোমরা যা কিছু চাও পাবে এবং যা ইচ্ছে করবে সাথে সাথে তাই হবে। এটা হল ক্ষমাশীল ও দয়াবান আল্লাহর তরফ থেকে মেহমানদারী।" (হামীম আস সাজদা ঃ ৩০-৩১)

দুনিয়াতে কোন মানুষ এমন নেই যে, তার যে-কোন ইচ্ছা পূরণ হয়। কিন্তু আখিরাতে জান্নাতীদের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাঁর নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু রেখেছেন যা কেউ চোখে কখনও দেখেনি, আর সে সম্পর্কে কান কখনও শুনেনি। এমনকি মানুষের অন্তরে সে সম্পর্কে কোন ধারণাও জাগেনি।" (বুখারী ও মুসলিম)

পোশাক

দুনিয়াতে পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ব্যবহার নিষিদ্ধ (হারাম)। কিন্তু জান্নাতে পুরুষের জন্য তা বৈধ (হালাল)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তারা জান্নাতে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে।" (রাহমান ঃ ৫৪)

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে আরো বলেন, "তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জান্নাত। তার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কঙ্কনে অলঙ্কৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে।" (কাহফ ঃ ৩১)

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীদের রেশমি পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবের (রা) বলেন, "জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে।" জান্নাতে রেশমি পোশাক সেসব মুমিনরাই পরিধান করবে যারা দুনিয়াতে তা পরিধান করেন না। কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম এটা পরিধান করতে পুরুষদেরকে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমি বস্ত্র পরিধান করবে সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। এর পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।

মখমলের বিছানা ও হেলান দেওয়ার মত বালিশ

জান্নাতে এখানে সেখানে হেলান দেওয়ার মত বালিশসমূহ সারিবদ্ধ থাকবে। আর থাকবে মূল্যবান মখমলের বিছানা। নয়নাভিরাম কার্পেট ও আরামদায়ক গদি পাতানো থাকবে। জান্নাতীরা যখন ইচ্ছা যেখানে সেখানে বসতে পারবে। ঘুমাতে পারবে।

এ কথাই আল্লাহ্ সূরা আল গাশিয়াতে বলেছেন, "এতে উঁচু সুসজ্জিত আসন থাকবে। পাশে সাজানো থাকবে নানাধরনের পানপাত্র। (আরাম আয়েশের জন্য থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ। (আরো থাকবে সযত্নে পেতে রাখা) উৎকৃষ্ট কার্পেটের বিছানা।" (গাশিয়া ঃ ১৩-১৫)

স্বর্ণের জিনিস ব্যবহার করতে পারবে

দুনিয়াতে পুরুষের জন্য স্বর্ণের কোন কিছু ব্যবহার করা জায়েয নেই। এমনকি অনেককে বিবাহের সময় স্বর্ণের আংটি উপহার দেওয়া হয়, যা ব্যবহার করা পুরুষের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু জান্নাতে তা বৈধ থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় মনে যা চায় তা-ই রয়েছে এবং (এমন সব জিনিস রয়েছে) যা নয়ন তৃপ্তকারী। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে।" (যুখরুফ ঃ ৭১)

খাবার ও পানীয়

শরাব দেওয়া হবে

দুনিয়াতে শরাব পান নিষিদ্ধ। কিন্তু জান্নাতে তা বৈধ থাকবে। তবে দুনিয়াতে অধিক শরাব পান করলে বেহুঁশ হয়ে যায়। মাথা ব্যথা হয়। জান্নাতে এসব উপসর্গ দেখা যাবে না। জান্নাতীদের যে শরাব দেওয়া হবে, সে শরাবে

www.pathagar.com

তাসনীমের মিশ্রণ থাকবে। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই তা পান করবে। মাওলানা মওদূদী (র) বলেন, কোন কোন ঝরনাকে তাসনীম বলার কারণ হল, তা উঁচু থেকে প্রবাহিত হয়ে নিচের দিকে আসে। এসব শরাব যেসব পাত্রে রাখা হবে, তার ওপর মাটি বা মোমের পরিবর্তে মেশকের মোহর লাগানো থাকবে। জান্নাতের খাদেমরা এগুলো মেশকের মোহর লাগানো পাত্রে করে এনে জান্নাতীদের পান করাবে। জান্নাতীরা তা পান করার সময়ও মেশকের গন্ধ পাবে। (তাফহীমুল কুরআন ঃ আমপারা)

মধু ও দুধের নহর

দুধ দুনিয়াতে সুস্বাদু পানীয়। সবাই দুধ পছন্দ করে। তবে দুনিয়াতে দুধ অল্প সময়ের ব্যবধানে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতে তা কখনও নষ্ট হবে না। দুনিয়াতে খাবার ঠিক রাখার জন্য তা ফ্রিজে রাখা হয়। কিন্তু ফ্রিজে বেশি গরম ঢুকালে বা খুব বেশি দিন রাখলেও নষ্ট হয়ে যায়। জান্নাতে ফ্রিজের প্রয়োজন হবে না। যেসব জিনিস সেখানে থাকবে তা কখনও নষ্ট হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তার অবস্থা হল। তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্য রয়েছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি? অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন করে দেবে। (মুহাম্মদ ঃ ১৫)

জান্নাতে পানি, দুধ, মধু ও শরাব এ চার প্রকার নহর হবে। কিন্তু এসব নহরে দুনিয়ার নহরের ন্যায় দুর্গন্ধ হবে না। স্বাদ নষ্ট হবে না। জান্নাতীদের জন্য প্রদত্ত পানীয় সম্পর্কে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "নিশ্চয়ই সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে। সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তূরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা থাকা উচিত। তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি। এটা একটা ঝরনা যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।" (মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ২২-২৮)

সাইয়েদ কুতুব বলেন, রাহীক হল নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ পানীয়। যাতে কোন মলিনতা ও মিশ্রণ নেই। আর মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত জিনিস দ্বারা সিল মারা দ্বারা বুঝা যায়, জিনিসটি হবে অত্যন্ত মূল্যবান ও উপকারী। এ বিষয়টি মানুষের পক্ষে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আর এ পানীয়ের সাথে

www.pathagar.com

তাসনীম থেকে মিশ্রণ থাকবে। তাসনীম হল ঘনিষ্ঠজনদের পান করার ঝরনা। এ থেকে বুঝা যায়, জান্নাতে যে পানীয় দেওয়া হবে তা দু' ধরনের হবে। সর্বসাধারণের জন্য যে পানীয় থাকবে তার চেয়ে সুস্বাদু পানীয় থাকবে আল্লাহর ঘনিষ্ঠজনদের জন্য।

আফসোসের বিষয় হল, অনেক মানুষ দুনিয়ার স্বল্প সময়ের জিন্দেগীতে আল্লাহর নিষিদ্ধ পানীয় পান করছে অথচ তারা স্থায়ী জিন্দেগীর কথা ভুলে রয়েছে। তারা যদি দুনিয়ায় এসব নিষিদ্ধ পানীয় বর্জন করত তাহলে আল্লাহ জান্নাতে এর চেয়ে অনেক উন্নত পানীয় তাদেরকে দান করতেন।

নানা ধরনের ফল ফলাদি

দুনিয়াতে দেখা যায়, কোন মেহমান এলে তাঁকে ফল খেতে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদেরকেও জান্নাতে নানা ধরনের ফল-ফলাদি দান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "উভয়ের মধ্যে (জান্নাতে) প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে।" (রাহ্মান ঃ ৫২)

জান্নাতে হরেক রকমের ফল পাওয়া যাবে। আর ফলের সংখ্যাও হবে প্রচুর। এসব ফলের স্বাদ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুনিয়াতে একেক মৌসুমে একেক ফল হয়, কিন্তু জান্নাতে সবসময়ই সব ধরনের ফল পাওয়া যাবে। জান্নাতীরা যখন যে ফল খেতে চাইবে তাই তারা পাবে। দুনিয়াতে এসব ফল নির্দিষ্ট সময়ের পর পাওয়া যায় না। কিন্তু জান্নাতে সবসময় পাওয়া যাবে। দুনিয়াতে একজনের বাগান থেকে আরেকজন বিনা অনুমতিতে ফল খেতে পারে না কিন্তু জান্নাতে কোন ফলই কারো জন্য নিষিদ্ধ থাকবে না। হাদীস থেকে জানা যায়, জান্নাতীরা কোন ফল গাছ থেকে একটি ফল ছেঁড়ার সাথে সাথে আরেকটি ফল সেখানে দেখতে পাবে। যতই খাবে তার কোন শেষ বা কমতি হবে না।

আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন, জান্নাতে একজন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে, ইয়া রব! আমি নিজে ফল গাছ রোপণ করে সে ফল খেতে চাই। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যা চাও এখন কি পাওনা? তখন বান্দা বলবে, হ্যাঁ, পাই। তবে আমি চাই আমি বীজ বপন করি। তারপর সে ব্যক্তি বীজ বপন করবে। এরপর ফল গাছ দ্রুত বড় হয়ে যাবে এবং তাতে ফল ধরবে।

www.pathagar.com

পাখির গোশত

দুনিয়াতে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে পাখি শিকারের প্রবণতা আছে। এটা খুবই সখের বিষয়। জান্নাতে আল্লাহ্ রুচিসম্মত পাখির গোশত দেবেন। জান্নাতীরা যখন যে পাখির গোশত খেতে চাইবে তাই পাবে।

কাঁটাবিহীন বদারিকা বৃক্ষ

দুনিয়াতে বিভিন্ন ফল গাছে কাঁটা থাকে। মানুষ এসব গাছের ফল খেতে অনেক সময় কাঁটাবিদ্ধ হয়। কিন্তু জান্নাতে এসব গাছ হবে কাঁটামুক্ত। আর গাছে ফল এত বেশি হবে যে, ফলভারে নুয়ে পড়বে। জান্নাতের বদারিকা দুনিয়ার বদারিকার মত হবে না। এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় হবে এবং স্বাদে হবে অতুলনীয়। উল্লেখ্য, জান্নাতে জান্নাতীরা যতই খানাপিনা করুক না কেন তাদের কোন পেশাব-পায়খানা হবে না। দুনিয়ার মত কোন ধরনের দুর্গন্ধ ছড়াবে না।

থাকার আবাস কেমন হবে

কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, জান্নাতীদের ঘর হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। তাতে থাকবে মুক্তার গাঁথুনি। বাইরে থেকে দেখতে কাচের প্রাসাদের মত সাদা মনে হবে। প্রাসাদ থেকে সবসময় মেশকের গন্ধ পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের প্রাসাদের বিবরণ কুরআনে এভাবে দিয়েছেন, "কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত।" (যুমার ঃ ২১)

জান্নাতীদের বালাখানা সম্পর্কে আল্লাহ্ আরো বলেন, "তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে।" (ফুরকান ঃ ৭৫)

এ আয়াতে উল্লিখিত 'গুরফাহ্' শব্দের অর্থ বালাখানা তথা উপর তলার কক্ষ। আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা জান্নাতে এমনসব বালাখানা পাবে যা সাধারণ জান্নাতীদের কাছে তেমন দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে। এ কথা শুনার পর উপস্থিত লোকজন প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি জবাব দিলেন, যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাতে সবাই যখন ঘুমে থাকে তখন তাহাজ্জুদের নামায পড়ে-তার জন্য।" (তাফসীরে মাযহারী)

সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আল্লাহর দীদার

জান্নাতীগণ জান্নাতে আল্লাহর দীদার লাভ করবেন। আল্লাহর দীদার লাভ জান্নাতীদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। মূলত আল্লাহ প্রেমিক বান্দার সাথে যখন তার প্রেমাস্পদ আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে তখন তার কাছে জান্নাতের অন্যান্য কিছুর চাইতে এ দীদারই সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য হবে। আমরা দুনিয়াতে দেখি, কোন প্রেমিক যদি তার প্রেমিকার সাক্ষাৎ পায়, তখন তার কাছে খাওয়া-দাওয়া বা অন্য কিছুর চেয়ে পরস্পরের সাক্ষাৎই বেশি মধুর মনে হয়।

যে আল্লাহর দীদার লাভের জন্য প্রেমিক বান্দা দুনিয়াতে সবসময় আকুতিভরা প্রার্থনা করেছে তাঁর দর্শন লাভ যে কী মধুর মনে হবে তা বর্ণনাতীত। সে অনুভূতি দুনিয়ার কোন প্রাপ্তির সাথে তুলনীয় নয়। সে অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সে অনুভূতি দুনিয়াতে বসে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

আল্লাহর এ দীদার লাভ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, এটা চর্ম চোখে হবে না। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, এটা চর্ম চোখেই হবে।[৪৯]

কুরআন ও হাদীস থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত। আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেন, "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (কিয়ামাহ ঃ ২২-২৩) আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, "যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি।" (ইউনুস ঃ ২৬) হাদীসে 'যিয়াদাহ' তথা আরো বেশির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'আল্লাহর দীদার'।

আল্লাহর রাসূলের হাদীস থেকে জানা যায়, আমরা যেমনিভাবে চাঁদ দেখি তেমনিভাবে আল্লাহকে দেখতে পাব। এ প্রসঙ্গে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমরা এখন চাঁদকে যেভাবে দেখছ, অচিরেই তোমাদের প্রভুকেও সেভাবে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তাঁর দর্শনে তোমরা কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা অনুভব করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

অবশ্য কোন কোন আলেম বলেছেন, প্রত্যেকের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তাঁকে দেখবে। কেউ সারাক্ষণ আল্লাহর দীদার লাভ করবে। আর কেউ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দেখবে। আর কেউ সপ্তাহে প্রতি জুমআবার দেখবে। (তাফসীরে মাযহারী)

এখন প্রশ্ন হল, দুনিয়াতে কেন আল্লাহর দীদার লাভ করা সম্ভব নয়? হযরত মুসা (আ)-এর কাওম আল্লাহকে দেখতে চেয়ে তাঁর নূরের তাজাল্লীতে জ্বলে গিয়েছিল কেন? এর জবাবে মুফতী শফী (র) লিখেন, দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার সহ্য করার মত শক্তি মানুষের নেই। তাই দুনিয়াতে নেক বান্দারা এ দীদার লাভ করতে পারছে না। পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম ও শক্তিশালী করে দেওয়া হবে। ইমাম মালেক (র) বলেন, মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে পারে না, কারণ মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল আর আল্লাহ্ তাআলা অক্ষয়। পরকালে মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে। তখন আল্লাহর দীদারে কোন বাধা থাকবে না।

আল্লাহকে পাওয়া তো একজন মানুষের সবচেয়ে বড় পাওনা। দুনিয়াতে যদি তা পেয়েই যায় তাহলে আখিরাতে অন্য পুরস্কার পেলেও তা হবে তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। আর আল্লাহর দীদার লাভই হল আল্লাহ্ প্রেমিক বান্দাদের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা দুনিয়াতে আখিরাতের চূড়ান্ত ফয়সালার আগে পূরণ হলে আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অবশ্য একজন মানুষ মরণের আগ পর্যন্ত আল্লাহকে খুশি করার জন্য নেক আমল করে আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল করলেই তো আল্লাহর দীদার পাবে। কিন্তু যারা আল্লাহর নাফরমানী করে তারা তো মরণের পরও আল্লাহর দীদার পাবে না।

জান্নাত প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা

জান্নাতীদের আর মৃত্যু নেই, জান্নাতই স্থায়ী আবাস

দুনিয়াতে কেউ কোন জায়গায় কিছুদিন থাকলে অনেক সময় স্থান পরিবর্তন করতে হয়। কখনও নদীতে ভেঙে যায়। কখনও ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে ধ্বংস হয়। কিন্তু জান্নাতে জান্নাতীরা চিরদিন থাকবে। এটা কখনও ধ্বংস হবে না। এ কারণে আল্লাহ্ জান্নাতের বিবরণ দেওয়ার সময় 'খালিদুন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ জান্নাত জান্নাতীদের স্থায়ী আবাস। দুনিয়ার আবাসের মত ক্ষণস্থায়ী নয়। এখান থেকে তারা কখনও বের হতে চাইবে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। (কাহাফ ঃ ১০৭-১০৮)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আরো বলেন, "যারা একবার জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর কারো মৃত্যু হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, সেখানে তারা আর কখনও মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। পৃথিবীতে যে একবার মৃত্যু হয়েছে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট।" (দুখান ঃ ৫৬)

হাদীস থেকে জানা যায়, জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ পাক মওতকে মেষের আকৃতি দান করবেন। তারপর জান্নাতীদেরকে আদর করে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতীরা! তোমরা কি এটাকে চেন? জান্নাতীরা জবাবে বলবে, হ্যাঁ চিনি, এটা হল মওত। তারপর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে মওতকে যবেহ্ করা হবে। অতঃপর জান্নাতীদেরকে বলা হবে, 'হে জান্নাতীরা! তোমরা জান্নাতে স্থায়ী'। আর জাহান্নামীদেরকে বলা হবে, 'হে জাহান্নামীরা! তোমরা জাহান্নামে স্থায়ী'।

জান্নাতে কোন জিনিস নষ্ট হবে না, কোন জিনিস শেষ হবে না এবং কোন কষ্ট হবে না

দুনিয়াতে কোন জিনিস কিছু দিন থাকলে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু জান্নাতে কোন জিনিস নষ্ট হবে না। জান্নাত হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ্ বলেন, "তাদেরকে সেখানে না সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে না শৈত্যপ্রবাহ।" (দাহর ঃ ১৩)

দুনিয়াতে ব্যবহার করতে করতে একটি জিনিস শেষ হয়ে যায়, কিন্তু জান্নাতে কোন জিনিসই শেষ হবে না। যে যত খাবে তত পাবে। দুনিয়াতে যে মানুষ চিরসুখী সেও কোন না কোন সময় দুঃখ পায়। কিন্তু জান্নাতে কেউ কখনও দুঃখ পাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "সেখানে তাদের কোন কষ্ট হবে না এবং সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃত হবে না।" (হিজর ঃ ৪৮)

বেহেশতের বাজার

দুনিয়াতে আমরা বাজারে যাই, সেখানে অনেক লোক সমাগম হয়। বেহেশতেও বাজার বসবে। বেহেশতবাসীরা সেখানে মিলিত হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে প্রতি শুক্রবার একটি বাজার বসবে। বেহেশতবাসীরা সেখানে যাবে। তখন উত্তরদিক থেকে একটা বাতাস প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও কাপড়-চোপড়ে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাতে তাদের রূপ-সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। এই অবস্থায় যখন তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যাবে তখন তারা বলবে, আল্লাহর শপথ! তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে তারাও বলবে, আল্লাহর শপথ! তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে।-(মুসলিম)

www.pathagar.com

পরিবার-পরিজনসহ বসবাস

কোন পরিবারের সবাই যদি জান্নাতী হয়, তাহলে জান্নাতে তারা সবাই এক সাথে থাকবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য একক একটি ফাঁকা মুক্তার তৈরি তাঁবু থাকবে। তার উচ্চতা হবে ষাট মাইল। ঈমানদার ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা এর মধ্যে বসবাস করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

জান্নাতীদের আসন এমনভাবে বিন্যাস করা হবে যে, শুধু তার পরিবার-পরিজন নয়, বরং অপর জান্নাতীদেরকেও দেখতে পাবে। এ প্রসঙ্গে সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেহেশতবাসীরা তাদের কক্ষে বসে একে-অপরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেভাবে তোমরা আকাশের তারকাগুলিকে দেখতে পাও। (বুখারী ও মুসলিম)

জান্নাতীদের একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ

মানুষ দুনিয়াতে যেমনিভাবে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যায় তেমনিভাবে জান্নাতেও একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবে। তবে জান্নাতে সবার মর্যাদা সমান হবে না। নেক আমল অনুযায়ী জান্নাতের সুযোগ-সুবিধার তারতম্য থাকবে। যারা উঁচু মর্যাদাপূর্ণ স্থানে থাকবে তাদের কাছে সাধারণ জান্নাতীরা যেতে পারবে না। কিন্তু তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা জান্নাতে ঘুরে ঘুরে দেখবে। তারা বিভিন্নজনের সাথে মিশবে। তারপর আবার নিজ আবাসস্থলে ফিরে আসবে। হযরত মুজাহিদ বলেন, জান্নাতীরা নিজ আবাসস্থল এমনভাবে চিনবে মনে হবে যেন জন্ম থেকেই তারা এই স্থানে আছে।

গরীবরা জান্নাতে আগে প্রবেশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "গরীবরা ধনীদের পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী)

এর অর্থ হল, যার যতটুকু ধন-সম্পদ থাকবে তাকে সে অনুযায়ী হিসাব দিতে হবে। আর গরীব মানুষদের মধ্যে যারা নেককার তাদের তো ধন-সম্পদের বেশি হিসাব নেই। তাই তারা দ্রুত বেহেশতে প্রবেশ করবে। এ হাদীসের

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম বলেন, গরীবরা ধনীদের আগে প্রবেশের অর্থ এ নয় যে, ধনীদের মর্যাদা কম হবে। বরং যেসব ধনী ব্যক্তি দান-সদকাসহ নেক আমল বেশি করবে তারা তাদের আমলের ভিত্তিতে জান্নাতে মর্যাদা লাভ করবে। জান্নাতে মর্যাদার তারতম্য হবে নেক আমলের ভিত্তিতে। যার নেক আমল বেশি হবে তিনিই উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন থাকবেন।

জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের মর্যাদা ভোগ

কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত জান্নাতীরা একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে না। নেক আমল অনুযায়ী একেকজন একেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। জান্নাতে মর্যাদার পার্থক্যের বিষয়টি কুরআনে এভাবে এসেছে, "যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমার দেওয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে। তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুজি।" (আনফাল ঃ ২-৩)

এখানে মুমিনদের সুউচ্চ মর্যাদা বুঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা আরবী 'দারাজাত' বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হল সব মুমিনের মর্যাদা জান্নাতে এক ধরনের হবে না। ঈমানের দাবি পূরণে ভূমিকার পার্থক্যের কারণে মর্যাদারও পার্থক্য হবে।

আরেক হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া করবে। কেননা জান্নাতুল ফেরদাউস হল জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে আর এটা হল সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান। (বুখারী)

এভাবে আরো অনেক হাদীস আছে যা থেকে বুঝা যায়, জান্নাতে সব জান্নাতীদের মর্যাদা সমান হবে না।

একজন সাধারণ জান্নাতীর প্রাপ্য

জান্নাতে জান্নাতীদের আমলের তারতম্য অনুযায়ী মর্যাদার তারতম্য হবে। দুনিয়াতে আমরা দেখি, যেসব ছাত্র প্রথম বিভাগ বা এ গ্রেডে পাস করে তাদের

www.pathagar.com

মধ্যেও নাম্বারের পার্থক্য থাকে। যারা স্কলারশীপ পায় তাদের বৃত্তির টাকার মধ্যেও বিভিন্নতা দেখা যায়। ট্যালেন্টপুল বা মেধা তালিকায় উত্তীর্ণদের বৃত্তি আর সাধারণ বৃত্তির পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য থাকে। জান্নাতেও জান্নাতীদের কৃত আমল অনুযায়ী পরস্পরের ভোগের জিনিসের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। হাদীস থেকে জানা যায়, জান্নাতে একজন নিম্ন পর্যায়ের জান্নাতী আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তরজন স্ত্রী পাবে। ঐ সব স্ত্রী যেসব ওড়না ব্যবহার করবে তার মধ্যে জামরূদ, মুক্তা ও ইয়াকূতের কারুকার্য খচিত থাকবে।

হযরত আদম (আ) কোন জান্নাতে ছিলেন

কুরআন ও হাদীস দ্বারা এতটুকু জানা যায় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-ক সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ জান্নাতে বসবাস করতে বলেছেন। কিন্তু এ জান্নাত কি সেই জান্নাত যেখানে জান্নাতবাসীরা হাশরের বিচার-ফয়সালার পর যাবে? না অন্য কোথাও?

এর জবাবে কয়েকটি অভিমত রয়েছে ঃ

১. তাঁরা জান্নাতেই ছিলেন। কারণ যখন তাঁরা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন তখন আল্লাহ্ বললেন, “তোমরা নিচে নেমে যাও।” (বাকারা ঃ ৩৬) এ থেকে বুঝা যায়, তাঁরা সাত আসমানের উপরে জান্নাতেই ছিলেন।

২. হযরত আদম ও হাওয়া (আ) যে জান্নাতে ছিলেন তা আল্লাহ্ দুনিয়াতেই তৈরি করেছিলেন। কেননা কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের যে বিবরণ এসেছে তা থেকে স্পষ্ট যে, জান্নাত হল এমন এক জায়গা যেখানে প্রবেশ করার পর আর বের করে দেওয়া হবে না। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, “সেখানে তাদেরকে কোন অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান হতে বহিষ্কৃতও হবে না।” (হিজর ঃ ৪৮) আর সেটা হল স্থায়ী আবাস। সেখানে কোন ধরনের খারাপ কথা কেউ শুনবে না। (তুর ঃ ২৩) কিয়ামতের দিন বিচার-ফয়সালার পরই মানুষ সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাই আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর যে জান্নাতে রাখা হয়েছিল তা দুনিয়ার কোথাও ছিল।

৩. হযরত আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর জান্নাতে রেখেছিলেন এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় এটা বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু তাঁদেরকে কোন্ জান্নাতে রেখেছেন এটার সাথে পৃথিবীর আমলের কোন সম্পর্ক নেই। তাই অনেকে এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করাকেই শ্রেয় মনে করেন।

www.pathagar.com

জান্নাতের পথ একটাই

আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই। জান্নাতে যাওয়ার জন্য নেক আমল করতে চাই। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল জান্নাতে যাওয়ার পথ কি? এর জবাব কুরআনে দেওয়া আছে। জান্নাতে যাওয়ার পথ একটাই আর তা হল সিরাতুল মুস্তাকীমের অনুসরণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল, অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।" (আনআম ঃ ১৫৩) এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, অনেক ভ্রান্ত পথের যে-কোন একটি অনুসরণ করাই জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু জান্নাতে যেতে হলে একমাত্র একটি পথেই চলতে হবে। আর সে পথের নাম হল 'সিরাতুল মুস্তাকীম'। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে এ পথকেই 'আলোর পথ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, "তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।" (মায়েদাহ ঃ ১৫-১৬)

এখানে আল্লাহ্ তাআলা আলোর পথ বুঝানোর জন্য 'নূর' একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হল হেদায়াতের পথ একটাই। আর হেদায়াতের পথই হল আলোময়। এছাড়া বাকি সব অন্ধকার। তিনি এখানে ভ্রান্তপথ বুঝানোর জন্য 'যুলুমাত' বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হল ভ্রান্ত পথ অনেক হতে পারে। কুফর, শির্ক, নিফাক, ইরতেদাদ ও ভ্রান্ত দর্শনে বিশ্বাসসহ যে-কোনভাবেই একজন মানুষ ভ্রান্ত পথে চলতে পারে। এ আয়াত থেকে আরো জানা যায়, সিরাতুল মুস্তাকীমই 'নিরাপদ পথ', যার শেষ গন্তব্য জান্নাত। আর অন্ধকার পথ সে তো বিপদসংকুল যার শেষ গন্তব্য 'জাহান্নাম'।

জাহান্নাম

জাহান্নাম পীড়াদায়ক শাস্তির জায়গা। কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের চির আবাসস্থল। তারা চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আর যেসব ঈমানদার ব্যক্তির নেক আমলের তুলনায় বদ আমল বেশি হবে তাদেরকে যদি আল্লাহ বিচারের সময় মাফ না করেন তাহলে তারাও দোযখে যাবে। কিন্তু তারা সবসময় দোযখে থাকবে না। অপরাধ অনুযায়ী দোযখের আগুনে জ্বলবে। পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূলের সুপারিশে তারা নাজাত পাবে। কিন্তু সাময়িকভাবে দোযখে জ্বলাও কত অসহনীয়! কত কষ্টকর! এ কষ্টের কথা কুরআন হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত আছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় দোযখের আগুনের ভয় প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি তোমাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ব্যাপারে বারবার সাবধান করে দিয়েছি।" (লাইল ঃ ১৪)

তিনি দোযখের আগুন থেকে বাঁচার জন্য তাগিদ দিয়ে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ তাআলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না; বরং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে। (তাহরীম ঃ ৬)

এ আয়াতে আল্লাহ্ শুধু নিজেকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচার কথা বলেননি। নিজেকে বাঁচানোর সাথে সাথে নিজের আহলকেও বাঁচানোর কথা বলেছেন। এখন প্রশ্ন হল আহল কারা? আহল হল তারা, যারা কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেমন ছেলে-সন্তান, স্ত্রী, কর্মচারী ও যে-কোন ধরনের অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ। এ আয়াত নাযিল হবার পর হযরত উমর (রা) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটিতো বুঝে আসে (যে, আমরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকবো এবং আল্লাহর বিধানাবলি মেনে চলব) কিন্তু আহলকে কিভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করব? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর উপায় হল, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকে সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে। (তাফসীরে রুহুল মায়ানী) এ আয়াতের আলোকে ফকীহ্গণ বলেন, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন তথা অধীনস্থদের দীনের মৌলিক জ্ঞান তথা ফরয ও হালাল-হারামের বিধানাবলি শিক্ষা দেওয়া ফরয।

কেউ নিজে যদি দীনের উপর না চলে আর অধীনস্থদের দীনের উপর চলতে উদ্বুদ্ধ না করে, তাহলে তাকে দোযখের ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। কুরআন হাদীসের বিভিন্নস্থানে দোযখের কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিনিয়ত দোযখের শাস্তি থেকে পানাহ চাইতেন এবং সাহাবীগণকেও দোযখের আযাব থেকে পানাহ্ চাইতে বলতেন। সাহাবায়ে কেরাম সবসময় আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতেন আর দোযখের আগুন থেকে নাজাত পাবার জন্য আকুতি জানাতেন।

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়,* দোযখে সবধরনের অপরাধীরা একই ধরনের শাস্তিভোগ করবে না। একেক ধরনের অপরাধীরা একেক ধরনের শাস্তি ভোগ করবে।

জাহান্নামের সাতটি স্তর বা দরজা প্রসঙ্গে

জাহান্নামে অপরাধীর অপরাধ অনুযায়ী একেকুজনের একেক ধরনের শাস্তি হবে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামের সাত দরজা রেখেছেন। একেক দরজা দিয়ে একেক ধরনের অপরাধীরা প্রবেশ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি পৃথক দল আছে।" (হিজর ঃ ৪৩-৪৪)

দুনিয়াতে আমরা দেখি, জেলখানায় একেক অপরাধীর একেক ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়। কাউকে সেলে রাখা হয়। কাউকে ডাণ্ডা-বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়। কাউকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অপরাধীর অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড দেওয়া হয়। অবশ্য দুনিয়ার এ দণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক বিচার নাও হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আখিরাতে ইনসাফের সাথে অপরাধীদের সাজা দেবেন।

আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীদের রাখবেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হবে। এ ধরনের শাস্তিকে সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে। তা হল হাবিয়া, জাহীম, সাকার, লাযা, সাঈর, হুতামাহ ও জাহান্নাম।

সাকার

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল মুদ্দাসসিরে সাকার এর কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি তাকে দাখিল করব (সাকার) অগ্নিতে। আপনি কি জানেন (সাকার) অগ্নি কি? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। এটা মানুষকে দগ্ধ করবে। (মুদ্দাসসির ঃ ২৬-২৯)

অনুরূপভাবে সূরা আল কামারে ইরশাদ হয়েছে, "যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়ে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামে; বলা হবে, অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।" (কামার ঃ ৪৮)

সাকারে কারা প্রবেশ করবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "(আখিরাতে জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করা হবে) তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তদেরকে

www.pathagar.com

আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত।" (মুদ্দাসসির ঃ ৪২-৪৭)

হুতামাহ্

দুনিয়ার আগুনে চামড়া পোড়া যায়, হৃদয় পোড়ানো যায় না। কিন্তু জাহান্নামের আগুন হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর এ ধরনের আগুনে গীবতকারী, চোগলখোর ব্যক্তি এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীরা প্রবেশ করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'বরং নির্ঘাত (তার জমানো অর্থ-সম্পদ) অল্পদিনের মধ্যেই (হুতামাহ্) চূর্ণ-বিচূর্ণকারী (এক গর্তের অতলে) নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। তুমি কি জানো, এ চূর্ণ-বিচূর্ণকারী গর্তটি কেমন? (এ হল সম্পদ-লোভী পাপীদের জন্য) আল্লাহ্ তাআলার (নিজস্ব) প্রজ্বলিত এক আগুন। যা (এতো মারাত্মক যে) এ (দহন) মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে (তাকে পুড়িয়ে দিয়ে) যাবে। (হুমাযাহ্ ঃ ৪-৭)

লাযা

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "কখনও নয়, নিশ্চয়ই এটা লেলিহান অগ্নি (লাযা) যা চামড়া তুলে দেবে। সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল এবং বিমুখ হয়েছিল। সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল।" (মাআরিজ ঃ ১৫-১৯)

এ আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জাহান্নামীদের মাথার চামড়া তুলে ফেলা হবে। আর মুজাহিদ বলেন, সারা শরীরের হাড় থেকে চামড়া আলাদা করে শাস্তি দেওয়া হবে। এবার একটু ভাবুন, দুনিয়াতে কাউকে যদি চামড়া তুলে শাস্তি দেওয়া হয়, সে কত অস্বাভাবিক কষ্ট অনুভব করে। আখিরাতে আল্লাহ্ জাহান্নামীদের গায়ের সে চামড়া তুলে তাদের শাস্তি দেবেন।

হাবিয়া

এটা হবে মুনাফিকদের আবাস। হাবিয়া হল দোযখের তলদেশ। আর মুনাফিকদের আবাস হবে দোযখের তলদেশ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।" (নিসা ঃ ১৪৫)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র হাবিয়া দোযখ সম্পর্কে বলেন, "আর যার পাল্লা হালকা হবে তার আবাস হবে (হাবিয়া) গভীর খাদ। আর তুমি কি জান সেটি কি? (সেটি) জ্বলন্ত আগুন।" (কারিয়া ঃ ৮-১১)

মাওলানা মওদূদী (র) তাফহীমুল কুরআনে এর ব্যাখ্যায় লিখেন, মূল বাক্য হল, তার মা (স্থান) হবে হাবিয়া। হাবিয়া শব্দটি এসেছে হাওয়া থেকে। এর অর্থ হল উঁচু জায়গা থেকে নিচুতে পড়ে যাওয়া। আর যে গভীর গর্তে কোন জিনিস পড়ে যায় তাকে হাবিয়া বলে। জাহান্নামকে হাবিয়া বলার কারণ হল, জাহান্নাম হবে অত্যন্ত গভীর এবং জাহান্নামবাসীদেরকে তার মধ্যে ওপর থেকে নিক্ষেপ করা হবে। আর তার মা হবে জাহান্নাম-এ কথা বলার অর্থ হল মায়ের কোলে যেমন শিশুর অবস্থান হয় তেমনি জাহান্নামবাসীদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কোন অবস্থান হবে না। উল্লেখ্য, এটি শুধু গভীর খাদ হবে না; বরং জ্বলন্ত আগুনেও পরিপূর্ণ হবে। দুনিয়াতেও কেউ যদি কাউকে ধাক্কা মেরে কোন খাদে ফেলে দেয় তাহলে সমতল ভূমিতে পড়ার চেয়ে কষ্ট বেশি অনুভব করে। দোযখেও আগুনের খাদে এক ধরনের অপরাধীদের থাকতে দেওয়া হবে।

সাঈর

যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে এবং দীনের অনুসরণের পরিবর্তে সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের অনুসরণ করে তাদের আবাস হবে সাঈর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য অগ্নি (সাঈর) প্রস্তুত করে রেখেছি।" (ফুরকান ঃ ১১)

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে আরো ইরশাদ করেন, "তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকেও আহ্বান করতে থাকে তবু কি তারা তারই আনুগত্য করবে?" (লুকমান ঃ ২১)

মূলত এক ধরনের মানুষ সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি আসক্ত। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা শুনতে চায় না। বাপ-দাদারা কিভাবে চলেছে তাদের কাছে তার গুরুত্ব বেশি। পূর্ববর্তীরা ভ্রান্তপথে চললে তারাও ভ্রান্ত পথে চলতে চায়। দীনের পথে চলতে তারা ইচ্ছুক হয় না। এ ধরনের ব্যক্তিরাই সাঈরে (দোযখের আগুনে) জ্বলবে। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তারা আরো বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসীদের (সাঈর) মধ্যে থাকতাম না।" (মূলক ঃ ১০)

www.pathagar.com

একটু চিন্তা করলেই একজন মানুষের কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কুসংস্কারের প্রতি আসক্তই সাঈর নামক দোযখের অধিবাসী হওয়ার অন্যতম কারণ। তাই সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার অনুসরণের পরিবর্তে সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করা দরকার।

জাহীম

এটা তাদের আবাস হবে যারা অহংকারবশত দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং ভ্রান্ত জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে নিজের জীবন পরিচালনা করেছে। আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে ইরশাদ করেন, "আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয় তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে (জাহীম)। এটা ধ্রুব সত্য।" (ওয়াকিয়া ঃ ৯২-৯৫)

কুরআনের অন্যত্র জাহীম প্রসঙ্গে বলা হয়, "একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও (জাহীম) জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও।" (দুখান ঃ ৪৭-৪৮)

জাহান্নাম

এটা হবে কাফিরদের আবাস। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "আমি কাফিরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি।" (কাহাফ ঃ ১০২)

তাদেরকে সবসময় আগুনের ভেতরে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি।" (আরাফ ঃ ৪১)

আল্লাহ তাআলা অপরাধী মানুষ ও জিন জাতিকে জাহান্নামের আগুনে ফেলে শাস্তি দিবেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, জিন হল আগুনের তৈরি। তাদেরকে আগুনে ফেলে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হবে? এর জবাবে বলা যায়, মানব সৃষ্টির মূল উপাদানের মধ্যে ছিল মাটি। মাটির তৈরি মানুষ অনেক সময় মাটিতে পড়েও আঘাত পায়। কেউ যদি কাউকে মাটির কোন শক্ত ঢিল ছুঁড়ে তাহলে সে আহতও হয়। মানব সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি হবার পরও মানুষ মাটির আঘাত অনুভব করে। সুতরাং আগুনের তৈরি জিনকে আগুনে নিক্ষেপ করলে সেও ব্যথা অনুভব করবে।

আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে, কুরআন ও হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত তা সত্য বলেই বিশ্বাস করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা বিবেকে কিছু বুঝে না

www.pathagar.com

আসলেও বিশ্বাস করা অপরিহার্য। মানুষ তাদের সীমিত জ্ঞান, বুদ্ধি ও দুনিয়ার জীবনের অনুভব শক্তি দিয়ে আখিরাতের নিয়ামত বা শাস্তির ধারণা করতে পারে মাত্র। দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের নিয়ামত বা শাস্তির পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

জাহান্নাম সম্পর্কিত কিছু বিষয়

দোযখের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর

দুনিয়াতে আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠ বা গ্যাস আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি। আখিরাতে জাহান্নামের আগুনেরও জ্বালানি দরকার হবে। আর এর জ্বালানি হবে আল্লাহর অবাধ্য মানুষ এবং পাথর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।" (বাকারা ঃ ২৪) তাফসীরকারকদের মতে, পাথর হবে গন্ধকের। যার কারণে জাহান্নামীরা সবসময় দুর্গন্ধ অনুভব করবে।

জাহান্নামীদের মৃত্যু কামনা

আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে আর জান্নাতীদেরকে জান্নাতে দেওয়ার পর 'মৃত্যুর মৃত্যু' হবে। এরপর কারো মরণ হবে না। জাহান্নামীরা এত বেশি কষ্ট অনুভব করবে, যার কারণে তারা মৃত্যু কামনা করবে। তারা জাহান্নামের ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে এ সম্পর্কে কি বলবে তা আল্লাহ্ কুরআনে ইরশাদ করছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তারা ডেকে বলবে, হে মালিক, পালনকর্তা আমাদের কিস্সাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয়ই তোমরা চিরকাল থাকবে।" (যুখরুফ ঃ ৭৭)

আল্লাহ্ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, "যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না, অনেক মৃত্যুকে ডাকো।" (ফুরকান ঃ ১৩-১৪)

দোযখের আগুন

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা এক হাজার বছর দোযখকে তাপ দেওয়ার পর আগুন লাল বর্ণের হয়। এরপর এক হাজার বছর তাপ দেওয়ার পর দোযখের আগুন সাদা বর্ণের হয়ে

www.pathagar.com

যায়। তারপর আরো এক হাজার বছর তাপ দেওয়ার পর দোযখের আগুন কালো বর্ণের হয়ে যায়। বর্তমানে কালো বর্ণ ধারণ করে আছে। (তিরমিযী)

এবার একটু ভাবুন, দুনিয়াতে জ্যোৎস্না রাতের তুলনায় অন্ধকার রাতে মানুষ বেশি ভয় পায়। অন্ধকারে চলতে কষ্ট অনুভব করে। দোযখে আঁধারের ভেতরেই অপরাধীদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এর অর্থ হল দোযখের পরিবেশই হবে ভয়ংকর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

দোযখের গভীরতা

হযরত আবূ মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি একটি পাথর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে নিচে পড়তে সত্তর বছর লাগবে। (তারগীব)

এবার একটু চিন্তা করুন, দুনিয়াতে কেউ যদি এক তলা বিল্ডিং-এর উপর থেকে নিচে পড়ে সে যত কষ্ট অনুভব করে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট অনুভব করে যে একশত তলা বিল্ডিং-এর উপর থেকে পড়ে। দোযখের গভীরতার কারণ হল অপরাধীরা দোযখে গড়িয়ে পড়ার সময়ও অনেক বেশি কষ্ট অনুভব করবে।

জাহান্নামে নিযুক্ত ফেরেশতারা হবে কঠোর স্বভাবের

দুনিয়াতে আমরা দেখি, দাগী আসামী ধরার জন্য প্রশাসনের ঝানু ঝানু পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। জাহান্নামেও জাহান্নামীদের জন্য কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাদের দেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না; বরং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে। (তাহরীম ঃ ৬)

জাহান্নামের শাস্তির কিছু বিবরণ

একজন মানুষ কোথাও গেলে তারজন্য কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। যেমন কিভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়? তাকে কোন্ মানের খাবার ও পানীয় দেওয়া হয়? তার বাসস্থান কি ধরনের হয়? আর তাকে কি ধরনের পরিধেয় দেওয়া হয়? এ বিষয়গুলো কোন মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ণয়ের জন্যও

www.pathagar.com

জরুরি। আল্লাহ তাআলা বিচার-ফয়সালার পর জাহান্নামীদেরকে কিভাবে জাহান্নামে নেন? তাদের আবাসস্থল কেমন দেন? তাদের খাবার ও পানীয় কি দেওয়া হবে? তাদের পরিধানের পোষাক কি হবে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে জাহান্নামীদেরকে নেওয়া হবে

দুনিয়াতে আমরা দেখি, কোন চোর, ডাকাত বা সন্ত্রাসী ধরা পড়লে পুলিশ তাকে হাতে বেড়ি পরিয়ে ডাণ্ডা দিয়ে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যায়। আখিরাতে জাহান্নামীদেরকেও ডাণ্ডা দিয়ে মারতে মারতে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।" (যুমার ঃ ৭১)

পিপাসিত থাকা

জাহান্নামে যখন নেওয়া হবে সে সময় প্রচণ্ড পিপাসা লাগবে। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "অপরাধীদেরকে পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।" (মারইয়াম ঃ ৮৬)

দুনিয়াতে দেখা যায়, কোন মানুষ যখন খুবই পিপাসিত থাকে তখন একটু পানির জন্য হাহাকার করতে থাকে। সামনে ময়লা পানি দেখলেও পান করতে চায়। জাহান্নামীদেরকে পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামে নেওয়া হবে, এর অর্থ হল জাহান্নামে যাওয়ার সাথে সাথেই তাদের পিপাসা নিবারণের জন্য এমন পানীয় দেওয়া হবে, যা পান করে শান্তি তো লাগবেই না বরং অশান্তি আরো বেড়ে যাবে।

মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে।

জাহান্নামীদেরকে মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ও পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নেওয়া হবে এবং জাহান্নামে ফেলা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা দেকেই। অতঃপর তাদের মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। (রাহমান ঃ ৪১) হযরত হাসান বসরী বলেন, জাহান্নামীদের চেহারা হবে কালো এবং চোখ হবে নীলাভ। গভীর বেদনায় তাদের চেহারা বিষণ্ন থাকবে।

www.pathagar.com

আগুন ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে

দুনিয়াতে আগুনের ভেতর এক মুহূর্ত হাত রাখা যায় না। আমরা প্রয়োজনে গরম পানি ব্যবহার করি, কিন্তু পানি বেশি গরম হলে আবার ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে সহ্যসীমার মধ্যে এনে ব্যবহার করি। জাহান্নামে জাহান্নামীদেরকে আগুনের ভেতরেই থাকতে দেওয়া হবে। আর আগুনের ভেতর থাকবে ফুটন্ত গরম পানি। এর ভেতরেই তাকে প্রদক্ষিণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত গরম পানির মাঝে প্রদক্ষিণ করবে।" (রাহমান ঃ ৪৪)

অনুরূপ বর্ণনা সূরা ওয়াকিয়াতে আছে। আল্লাহ্ বলেন, "তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে। এবং ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়। যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।" (ওয়াকিয়া ঃ ৪২-৪৩) একটু ভাবুন, দুনিয়াতে রান্নার সময় ধোঁয়া উঠলে তাও আমাদের সহ্য হয় না। আর আখিরাতে পাপীদেরকে এ ধরনের ধোঁয়ার ভেতরেই থাকতে হবে।

আগুনের লেলিহান শিখা ঘিরে রাখবে

জাহান্নামীদেরকে আগুনের লেলিহান শিখার ভেতরেই থাকতে হবে। যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। আল্লাহ্ বলেন, "যেখানে এদের উপরে আগুনের (লেলিহান) শিখাই ছেয়ে থাকবে। (বালাদ ঃ ২০)

আল্লাহ তাআলা আল কুরআনের অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।" (তাওবাহ ঃ ৪৯)

দুনিয়াতে একটু গরম অনুভব করলে পাখা ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। আখিরাতে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, তাদেরকে সবসময় আগুনের ভেতরেই থাকতে হবে। তারা আগুনের ভেতর 'ঘেরাও' অবস্থায় থাকবে। আগুন থেকে পালাবার কোন পথ থাকবে না। যে দিকে তাকাবে সেদিকে শুধু আগুনই নজরে পড়বে।

মাথায় গরম পানি ঢালা হবে

জাহান্নামীদের শাস্তি শুধু একদিক থেকে হবে না। সবধরনের শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হবে। তারা একমুহূর্তের জন্যও শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "অতএব যারা কাফির তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে।" (হাজ্জ ঃ ১৯-২০)

www.pathagar.com

আগুনের পাহাড়ে উঠতে দেওয়া হবে

দুনিয়াতে সমতল ভূমিতে হাঁটা সহজ। পাহাড়ে উঠা কষ্টকর। আখিরাতে জাহান্নামীদেরকে পাহাড়ে উঠতে দেওয়া হবে। আর সে পাহাড় হবে আগুনের পাহাড়। আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, আমি অতিসত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। (মুদ্দাসসির ঃ ১৭)

এ পাহাড়ে এক শ্রেণীর জাহান্নামীকে উঠতে দেওয়া হবে। সে উপরে উঠার পর আবার ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেওয়া হবে। এভাবে বার বার উঠানো হবে এবং ধাক্কা মেরে নিচে ফেলা হবে।

লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে

দুনিয়াতে কাউকে যদি শাস্তি দিতে হয় স্বাভাবিকভাবে বেত বা ছড়ি ব্যবহার করা হয়। আর আখিরাতে শাস্তি দেওয়ার জন্য লোহার হাতুড়ি ব্যবহার করা হবে। এ হাতুড়ি দিয়ে জাহান্নামীদেরকে পেটানো হবে। এ পেটানোর ব্যথা-বেদনায় তাদের আর্তচিৎকারে জাহান্নাম প্রকম্পিত হবে। আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে, দহন শাস্তি আস্বাদন কর।" (হজ্জ ঃ ২১-২২)

জিঞ্জির দ্বারা আটকে রাখা হবে

দুনিয়ার জেলখানায়ও দেখা যায়, দাগি আসামীদেরকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে আবদ্ধ করে রাখা হয়। জাহান্নামে আল্লাহর অবাধ্য জাহান্নামীদেরকে জিঞ্জির দ্বারা আটকে রাখা হবে।

চামড়া বারবার পরিবর্তন করে দেওয়া হবে

দুনিয়াতে কোন দাগী অপরাধীকে একবার ফাঁসি দেওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি একাধিক ব্যক্তিকে খুন করে তাকে একবারের বেশি ফাঁসি দেওয়ার সুযোগ নেই। জাহান্নামে এসব দাগি অপরাধীদের সব অপরাধের বিচার হবে। সব অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে। এ কারণে একবার চামড়া জ্বলে গেলে আবার নতুন চামড়া দেওয়া হবে, যেন জাহান্নামের শাস্তি বার বার অনুভব করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যখন তাদের চামড়া আগুনে গলে যাবে, তখন অন্য চামড়া পরিবর্তন করে দেবো, যেনো তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।" (নিসা ঃ ৫৬)

www.pathagar.com

চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে

দুনিয়াতে সব মানুষের কাছে তার চেহারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোথাও যাবার আগে বারবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। এ সুন্দর চেহারা জাহান্নামে সুন্দর থাকবে না। আগুনে জ্বলে-পুড়ে বিকৃত হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।" (মুমিনূন ঃ ১০৪)

সবসময় বিকট চিৎকার করবে

জাহান্নামীদের শাস্তির প্রচণ্ডতার কারণে সবসময় তারা চিৎকার করতে থাকবে। তাদের চিৎকারে জাহান্নাম প্রকম্পিত হবে। কিন্তু এসব আর্তচিৎকারে কোন লাভ হবে না। জাহান্নামের মধ্যে একটি স্থানের নাম হবে 'গাই'। এটা হবে জাহান্নামের সবচেয়ে ভীতিকর স্থান। জাহান্নামের অন্য স্থানসমূহও এর থেকে দৈনিক চারশতবার আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইবে।

কি ধরনের খাবার ও পানীয় দেওয়া হবে

যাক্কুম ভক্ষণ করতে হবে

যাক্কুম এক ধরনের তিতা গাছ। এর থেকে যে কষ বের হয় তা খুঁবই দুর্গন্ধযুক্ত। এটা কারো গায়ে লাগলে ফোসকা ফুটে যায়। এটাই হবে জাহান্নামীদের অন্যতম খাবার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে এবং তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি। পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়।" (ওয়াকিয়া ঃ ৫২-৫৬)

পানীয় হবে ফুটন্ত পানি, পুঁজ ও মলমূত্র

দুনিয়াতে যখন গরম লাগে তখন আমরা ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ করি। আখিরাতে জাহান্নামীদেরকে পানীয় দেওয়া হবে ফুটন্ত গরম পানি আর পুঁজ। পুঁজ এমন এক জিনিস তা দেখলেই ঘৃণা লাগে অথচ জাহান্নামে তাই পান করতে দেওয়া হবে। আর এটা দু' একদিন নয়; সবসময় এমন পানীয়ই দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "অতএব আজকের দিনে এখানে তার কোন সুহৃদ নেই এবং কোন খাদ্য নেই, ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। গুনাহ্গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। (হাক্কাহ্ ঃ ৩৫-৩৭)

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "আমি জালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং মন্দ আশ্রয়!" (কাহাফ ঃ ২৯)

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন, "তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাকে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব।" (ইব্‌রাহীম ঃ ১৬-১৭)

জাহান্নামীদের পানীয় সম্পর্কে আল্লাহ্ আরো বলেন, "নিশ্চয়ই জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। তথায় তারা কোন শৈত্য ও পানীয় আস্বাদন করবে না। কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে-পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। (নাবা ঃ ২১-২৬)

সূরা মুহাম্মদের ১৫ নম্বর আয়াতে এ ফুটন্ত পানি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। মূলত জাহান্নামে জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ, ঘাম একটি স্থানে একত্রিত করে রাখা হবে। এটার নাম হবে গাচ্ছাক। আর আরেকস্থানে তাদের মলমূত্র জমা করে রাখা হবে। এটার নাম হবে গিছলিন। জাহান্নামীদের যখন ক্ষুধা বা পিপাসা লাগবে তখন সেগুলো তাদেরকে খেতে বা পান করতে দেওয়া হবে।

এখন যদি আমরা চোখের সামনে পুঁজ, ঘাম, মল-মূত্র বা ফুটন্ত পানি কল্পিত পাত্রে রেখে খাবার কথা কল্পনা করি তাহলে আমাদের গা শিউরে উঠবে। কিন্তু যেসব আমল করলে এ জাতীয় খাবার বা পানীয় পান করতে না হয় সে ধরনের আমল কি আমরা করছি?

কাঁটাযুক্ত খাবার

দুনিয়াতে কাঁটাকে সবাই ভয় পায়। তাই মাছ অনেক সুস্বাদু হবার পরেও কেউ কেউ মাছের কাঁটার ভয়ে মাছ খান না। অথচ জাহান্নামীদেরকে কাঁটাযুক্ত খাবারই দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, "নিশ্চয় আমার কাছে রয়েছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (মুয্‌যাম্মিল ঃ ১২-১৩)

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন, খাবার হিসেবে কাঁটাযুক্ত খড় ছাড়া আর কিছুই তাদের জন্য থাকবে না। এই খাবারটি যেমন তাদের পুষ্ট করবে না, তেমনি (এ দ্বারা) তাদের ক্ষুধাও মিটবে না। (গাশিয়া ঃ ৬-৭)

সাইয়েদ কুতুব তাঁর তাফসীরে 'দারী' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, "দারী অর্থ কারো কারো কাছে দোযখের এক রকম গাছ। জাহান্নামের গহ্বরে যাক্কুম নামক এক প্রকার গাছ জন্মাবে বলে কুরআনে যে কথা বলা হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীতে উদ্‌গত এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ। এ গাছ কাঁচা অবস্থায় উটের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তখন এর নাম হয় শাব্বাক। যখন এর ফল পাকে, তখন এর নাম হয় 'দারী'। এ সময় এ গাছ বিষাক্ত হয়ে যায়। তাই উট তা খেতে পারে না।" যে বিষাক্ত খাদ্য উট খেতে পারে না তাই জাহান্নামীদেরকে খাদ্য হিসেবে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে কোন খাবার একটু স্বাদ না লাগলে অন্য খাবার খাওয়া যায়, কিন্তু জাহান্নামে সে সুযোগ নেই। যখন যা খেতে দেওয়া হবে তাই আহার করতে হবে। যারা জেলখানায় গেছেন তারা জানেন, জেলে যে বেলায় যা তৈরি হয় তাই খেতে হয়। অবশ্য দুনিয়ার জেলখানায় টাকা-পয়সা দিয়ে বাইরের থেকে খাবার নেওয়া যায়, কিন্তু আখিরাতে সে সুযোগ নেই।

গন্ধকের গন্ধযুক্ত আগুনের কাপড় পরিধান করতে দেওয়া হবে

যে কাপড় পরিধান করলে একটু গন্ধ লাগে সে কাপড় কেউ দুনিয়াতে পরিধান করে না। সাবান দিয়ে ধোয়ার পরও যদি গন্ধ দূর করা না যায়, সে কাপড় ফেলে রাখা হয়। আর আখিরাতে জাহান্নামীদের পোষাক হবে গন্ধকের। আরেক আয়াতে এসেছে জাহান্নামীদেরকে আগুনের পোষাক পরিধান করতে দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "অতএব যারা কাফির, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে।" (হাজ্জ ঃ ১৯-২০)

এ থেকে বুঝা যায়, জাহান্নামীদেরকে আগুনের তৈরি এমন পোষাক পরিধান করতে দেওয়া হবে যাতে গন্ধকের গন্ধ থাকবে।

এবার একটু ভাবুন, যারা দুনিয়াতে চমৎকার পোষাক পরিধান করে আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করছে, তাদের পরিণতি কি হবে। দুনিয়াতে ছেঁড়া পোষাক পরিধানকারী যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তাঁর সন্তোষ অর্জন করতে পেরেছে, সে পরিধান করবে রেশমের কাপড় আর তার বস বা শাসক যিনি

www.pathagar.com

দীনের বিরোধিতা করে আল্লাহর নাফরমান বান্দাদের কাতারে শামিল হয়েছে তাকে পরিধান করতে হবে আগুনের কাপড়। যাতে থাকবে গন্ধকের দুর্গন্ধ। কতই নিকৃষ্ট পরিণাম!

পায়ে আগুনের জুতা

জাহান্নামীদের পায়ে আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। এর উত্তাপে তার মগজ টগবগ করতে থাকবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আযাব হবে আবূ তালিবের। তাকে একজোড়া আগুনের জুতা পরানো হবে, তাতেই মগজ গলে গলে পড়তে থাকবে। (বুখারী)

চাদর ও বিছানা হবে আগুনের

দুনিয়ার জীবনে অনেকেই কী আরামদায়ক বিছানায় ঘুমায়। তুলতুলে নরম বিছানা কিছুদিন পর পর পরিবর্তন করে আরামদায়ক বিছানা খাট-পালংকে সুসজ্জিত করা হয়। কিন্তু জাহান্নামে অপরাধীদেরকে আগুনের বিছানায় থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপরের চাদরও। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি।" (আরাফ ঃ ৪১)

কুরআন ও হাদীসে জাহান্নামীদের শাস্তির অনেক বিবরণ এসেছে। যার সারকথা হল, জাহান্নামীদেরকে সারাক্ষণ আযাবের ভেতরেই থাকতে হবে। তারা শরীরের চারদিক থেকে আযাবই অনুভব করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।" (আনকাবূত ঃ ৫৫)

আমরা দুনিয়াতে আগুনের একটু তাপ সহ্য করতে পারি না। রান্না করার সময় কখনও তাপ লাগলে কী কষ্ট অনুভূত হয়! গ্রীষ্মকালে রাস্তায় চলার সময় সূর্যের উত্তাপ কম লাগার জন্য ছাতা ব্যবহার করতে হয়। ঘরে পাখা থাকে। অনেকেই এয়ার কন্ডিশন ঘরে বসবাস করেন। তারপরও শান্তি পান না। কিন্তু অপরাধীদেরকে জাহান্নামে সবসময় নানা ধরনের আযাবের ভেতরেই থাকতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা দয়াময়। তিনি চান না তাঁর বান্দারা দোযখে জ্বলুক। তাই তিনি কি কি কারণে দোযখে যেতে হবে? কি আমল করলে দোযখ থেকে

www.pathagar.com

নাজাত পাওয়া যাবে সবই বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা নবী ও রাসূলের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। জাহান্নামের চিত্র তুলে ধরেছেন। আর জান্নাতের নিয়ামতের কথাও উপস্থাপন করেছেন। তারপরও যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলবে না। আল্লাহর সাথে নাফরমানী করবে আল্লাহ তাদেরকেই আখিরাতে শাস্তি দিবেন।

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন

জান্নাত ও জাহান্নাম কি এখনও বিদ্যমান এবং স্থায়ী হবে

জান্নাত ও জাহান্নাম এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত। এটা অধিকাংশ উম্মতের অভিমত। অল্পসংখ্যক লোক মনে করেন, জান্নাত ও জাহান্নাম কিয়ামতের পর তৈরি করা হবে। তারা মনে করেন, জান্নাত ও জাহান্নাম আগে তৈরি এবং স্থায়ী হলে আল্লাহ যে এককভাবে আদি ও অন্ত তা ঠিক থাকে না। জান্নাত ও জাহান্নামও আদি ও অন্ত হয়ে যায়। এ যুক্তিতে জাহম ইবনে সাফওয়ান ও তার অনুসারীরা মনে করে, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে নেই। এটা তৈরি হবে কিয়ামতের পর। আর বিচার-ফয়সালার পর মানুষ কিছুদিন নিয়ামত বা শাস্তি ভোগ করলে তারপর তা ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার কারো কারো মতে, জান্নাত স্থায়িভাবে থাকবে কিন্তু জাহান্নাম একটা সময়ের ব্যবধানে শেষ হয়ে যাবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস হল জান্নাত ও জাহান্নাম এখনও বিদ্যমান এবং স্থায়ী।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বক্তব্যের সমর্থনে দলিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ কুরআনের অনেক জায়গায় ইরশাদ করেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম স্থায়ী। সূরা আন নাজমের পনের নম্বর আয়াত থেকে বুঝা যায় "জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নিচে অবস্থিত।" সপ্তম আকাশ হল জান্নাতের ভূমি আর আরশ হল তার ছাদ। সূরা তূরের আয়াত 'ওয়াল বাহরিল মাসজূর' থেকে কোন কোন তাফসীরকারক অভিমত পেশ করেছেন জাহান্নাম সমুদ্রের তলদেশে। বর্তমানে তার উপর কোন ভারী আবরণ রেখে দেওয়া হয়েছে।

২. কুরআনের অনেক আয়াতে জান্নাত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "উয়িদ্দাত লিল মুত্তাকীন" অর্থাৎ জান্নাত খোদাভীরুদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। (আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা এখানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে? তাই আল্লাহর এ কথার অর্থ তিনি জান্নাত তাঁর পেয়ারা বান্দাদের জন্য আগেই প্রস্তুত করে রেখেছেন। অনুরূপভাবে অপরাধীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, "উয়িদ্দাত লিল কাফিরীন" অর্থাৎ জাহান্নাম কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। (আলে ইমরান ঃ ১৩১)

এর অর্থ হল কিয়ামতের পর জান্নাত বা জাহান্নাম তৈরি করা হবে না বর্তমানেই তা প্রস্তুত আছে। আর কুরআনে জান্নাত ও জাহান্নামের যেসব বিবরণ এসেছে তা কাল্পনিক কোন বিবরণ নয়। কুরআনে বর্ণিত সব বিবরণই বাস্তব। যদি জান্নাত ও জাহান্নাম পরে তৈরি করা হয় তাহলে কুরআনে বর্ণিত বিবরণ কাল্পনিক হয়ে যাবে।

৩. রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মি'রাজে গিয়েছিলেন আল্লাহ তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রদর্শন করিয়েছেন। অনেক সহীহ হাদীসেও জান্নাত ও জাহান্নাম সরাসরি দেখেছেন বলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন। একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি যা দেখেছি যদি তোমরা তা দেখতে তাহলে কম হাসতে; অধিক কাঁদতে। সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি দেখেছেন? তিনি জবাব দিলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম। (বুখারী)

৪. মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করলাম, জান্নাত কোথায়? তিনি জবাব দিলেন, সাত আসমানের উপর। এরপর প্রশ্ন করলাম, জাহান্নাম কোথায়? এর জবাবে তিনি বললেন, সাত স্তর জমিনের নিচে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, জান্নাত সাত আসমানের উপর। আল্লাহ কিয়ামতের দিন এটাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে স্থাপন করবেন।

৫. অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, শহীদদের রূহ জান্নাতে বিচরণ করে।

৬. বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে মাটির তলদেশে কি আছে তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী মাটির অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীরে পৌঁছার পর এমন শক্ত পাথরের স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে আর তলদেশে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খনন কার্য করে তারা দেখতে পেয়েছেন

www.pathagar.com

সবখানেই ছয় মাইল গভীরে যাওয়ার পর আর তলদেশে যাওয়া সম্ভব হয় না। যার কারণে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভূগর্ভের ছয় মাইল নিচে এমন এক শক্ত স্তর আছে যা ভেদ করে নিচে যাওয়া সম্ভব নয়। মুফতী শফী (র) লিখেন, যদি কোন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তরাবরণের নিচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

৭. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত মনে করে, কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্যের বিপরীতে কোন ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

কুরআন ও হাদীস দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম বিদ্যমান থাকার কথা প্রমাণিত হবার পর তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

তাকদীরের লিখাই কি জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মানুষের ভাল বা মন্দ সবকিছু তাকদীরে লিখা আছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "বল! আল্লাহর লিখন ছাড়া আমাদের উপর কোন বিপদই আসে না। তিনি আমাদের প্রভু। আর মুমিনরা আল্লাহর উপরই বিশ্বাস রাখে।" (তওবা ঃ ৫১)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি জগৎসমূহের প্রভু আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।" (তাকবীর ঃ ২৯)

আল্লাহ্ আরো বলেন, "পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদসমূহ অবতীর্ণ হয়, তা জগৎ সৃষ্টির বহুপূর্বেই আমি কিতাবে লিখে রেখেছি। এ কাজ আল্লাহর জন্য খুবই সোজা।" (হাদীদ ঃ ২২)

এ ধরনের আরো অনেক আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় দুনিয়ায় যা কিছু সংঘটিত হয় সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। আর সবকিছুই আল্লাহ্ আগেই লিখে রেখেছেন।

অনেক হাদীস থেকেও এ কথার প্রমাণ মিলে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ্ সমস্ত মাখলুকাতের ভাগ্য লিখে রেখেছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।" (মুসলিম)

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহ প্রত্যেকের আবাসস্থল লিখে রেখেছেন, হয় সে জাহান্নামে থাকবে অথবা জান্নাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করবে। এমনকি সে সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য হবে, সে কথাও লিখে রাখা হয়েছে।" (মুসলিম)

এ ধরনের আরো অনেক হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কারা জান্নাতে যাবে আর কারা জাহান্নামে যাবে তা আল্লাহ আগেই লিখে রেখেছেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, আল্লাহ যখন তাকদীরে লিখে রেখেছেন, অমুক ব্যক্তি কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কিংবা পাপী হবে। অমুক ব্যক্তি যিনা করবে বা কাউকে খুন করবে। এভাবে কে কি খারাপ বা ভাল কাজ করবে তাতো আল্লাহ আগেই লিখে রেখেছেন। তাহলে কুফর, শির্‌ক, নিফাক বা পাপ কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করা বা ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়ার অর্থ কি? দুনিয়াতে মানুষ যত খারাপ কাজ করে সব কিছুর স্রষ্টা যদি আল্লাহ হন মানুষ কেন শাস্তি পাবে? দুনিয়াতে সব কিছু যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় তাহলে মানুষকে কেন দোষারোপ করা হয়?

এসব প্রশ্নের জবাবদানের আগেই বলা দরকার, এ সকল প্রশ্ন মূলত তাকদীরের সাথে সম্পৃক্ত। আর অতীতে তাকদীর নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছে। তাই তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়াবলি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা আছে তা দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করা জরুরি। এ নিয়ে প্রশ্ন করে অনেকেই গোমরাহ হয়ে যায়। তাই অনেক আলিম তাকদীর নিয়ে বেশি প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন।

এবার আসুন উল্লিখিত প্রশ্নাবলির জবাব নিয়ে একটু আলোচনা করি।

অতীতে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দু'টি দল বিভ্রান্ত হয়েছে। একটি দল কাদরিয়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাদের বিশ্বাস হল, মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। এ কারণে ভাল বা মন্দ কাজের জন্য সে সাজা বা পুরস্কার পাবে। তাদের যুক্তি, আল্লাহ যদি ভাল-মন্দ সবকিছু সৃষ্টি করেন তাহলে মন্দ কাজের জন্য কেন সাজা দেওয়া হবে? তাই তাদের অভিমত হল জান্নাত বা জাহান্নাম তাকদীরে লিখা নেই। মানুষের কর্মের ভিত্তিতে তা পরে নির্ধারিত হবে।

আরেকটি দল জাবরিয়া হিসেবে পরিচিত। তাদের অভিমত হল মানুষ দুনিয়াতে পাথরের মত। তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা শক্তি বা স্বাধীন কর্মক্ষমতা নেই। আল্লাহর ইচ্ছায় সব কিছুই হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জান্নাতে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে দেবেন। মানুষ দুনিয়াতে শির্‌ক, কুফর যা কিছু

www.pathagar.com

করে সবই আল্লাহ্ তাকদীরে লিখে রেখেছেন। এ ধরনের বিশ্বাস সুদূর অতীতে এক শ্রেণীর মুশরিকেরও ছিল। তাদের কথা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "যারা শির্‌ক করছে, তারা বলবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শির্‌ক করতাম না এবং কোন কিছুই হারাম করতাম না।" (আনআম ঃ ১৪৮)

এ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত পেশ করেছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, আল্লাহ্ দুনিয়ার সব কিছুর স্রষ্টা। কেননা আল্লাহ্ কুরআনে স্পষ্টই বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কার্যাবলিকে সৃষ্টি করেছেন।" (সাফফাত ঃ ৯৬)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ভাল বা মন্দ সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলা। মানুষ ভাল বা মন্দ যা কিছু করে তা আল্লাহ্ আগেই লিখে রেখেছেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "তুমি কি জান না যে, আসমান-জমিনে যা কিছু আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ্র জানা রয়েছে? এসব কিছু একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। এ কাজ তো আল্লাহ্র জন্য খুবই সোজা।" (হজ্জ ঃ ৭০)

দুনিয়াতে যা কিছু হয় সবই আল্লাহ্র ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।" (বুরুজ ঃ ১৮)

মানুষকে আল্লাহ্ জান্নাত বা জাহান্নাম দেবেন তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ভাল বা মন্দ কাজে ব্যয় করার জন্য। আল্লাহ্ কুরআনের অনেক জায়গায় ইরশাদ করেছেন, মানুষ শাস্তি পাবে তার কৃত আমলের কারণে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তাদের কিছু সংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে।" (মায়েদাহ ঃ ৬)

আল্লাহ্ আরো বলেন, "নিশ্চয়ই তারা কাফির, যারা বলে, আল্লাহ্ তিনের এক। অথচ এক উপাস্য ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।" (মায়েদাহ ঃ ৭৩)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, মানুষ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য কিংবা ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি কাজে লাগাতে পারে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, কাদরিয়া ও জাবরিয়া উভয় দলই গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। "আল্লাহকে মন্দ কাজেরও স্রষ্টা" এ থেকে পবিত্র রাখতে গিয়ে কাদরিয়া আকীদায় বিশ্বাসীরা কুরআন ও হাদীসকেই অস্বীকার করেছেন। আর জাবরিয়াগণ কুরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যা করেছেন যে,

www.pathagar.com

তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহর প্রতি যুলুম ও অবিচার আরোপ করা হয়। কেননা তারা মনে করে মানুষ জড় পদার্থের মত। তার কোন কিছু করার শক্তি নাই। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন সে তাই করে।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। তাহলে জাবরিয়াদের বিশ্বাসের গলদ কোথায়? জাব্‌রিয়াদের বিশ্বাসের গলদ হল, তারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে স্বীকার করে না। তাদের মতে, ভাল-মন্দ যা কিছু মানুষ করে একান্ত আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় করে। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত হল, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার পর ভাল বা মন্দ পথের যে-কোন পথে চলার ইখতিয়ার (ইচ্ছাশক্তি) দিয়েছেন। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগিয়ে যখন ভাল বা মন্দ কোন কাজ করতে চায় তখন আল্লাহ্ সে কাজ করার পথ সুগম করে দেন। মানুষের সব কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় হয় বলতে মানুষ কোন ভাল বা মন্দ কাজের ইচ্ছা করলেই কাজটি করতে পারবে না। মনে করুন, একজন মানুষ মসজিদ বা সিনেমা হলে যাওয়ার ইচ্ছা করল, তার ইচ্ছা করার পর তার এ শক্তি নেই যে সে সেখানে যাবে। আল্লাহ্ তাকে চলার শক্তি দিয়ে সেখানে নিয়ে যান। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় সে কাজটি সম্পন্ন হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আল্লাহ্ তো ইচ্ছা করলে মন্দ কাজের ইচ্ছা পোষণকারীকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেন। তিনি তা করেন না কেন? আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ দেখতে চান, তার কোন্ বান্দা তার ইচ্ছাশক্তিকে নেক কাজে ব্যয় করে আর কে মন্দ কাজে ব্যয় করে? যে যে কাজে ইচ্ছাশক্তি ব্যয় করতে চায় আল্লাহ্ তার জন্য সে পথ উন্মুক্ত রাখতে চান।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ তো আগেই সব লিখে রেখেছেন কোন্ মানুষ কি আমল করবে? তাহলে এ জন্য মানুষকে দায়ী করা হয় কেন? এর জবাব হল, আল্লাহ্ আলিমুল গায়ীব হিসেবে জানেন দুনিয়াতে কোন্ মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কোন্ কাজে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ তাঁর ইলমের ভিত্তিতেই লিখে রেখেছেন। আল্লাহ্ অসীম জ্ঞানের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে তিনি কালামে পাকে ইরশাদ করেন, "হে আল্লাহ্! তুমি তো জান, যা আমরা গোপনে করি, আর যা আমরা প্রকাশ্যে করি। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।" (ইব্‌রাহীম ঃ ৩৮)

তাকদীর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল 'কাতাবা' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এর অর্থ হল লিখে রাখা। যার মানে আল্লাহ্ আলিমুল গায়ীব

www.pathagar.com

হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন তার কোন্ বান্দা কি করবে? একজন মানুষ যা করবে বলে তাঁর ইলমে পরিষ্কার, তাই তিনি লিখে রেখেছেন। বিষয়টি এমন নয় যে, আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন বলেই মানুষ করছে। বরং বিষয়টি এমন যে, মানুষ করবে বলেই আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাস্তায় যখন কোন গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তখন যদি, কেউ চিৎকার দিয়ে বলেন এ 'গাড়িটা দুর্ঘটনায় পতিত হল'। তারপর যদি সে গাড়িটা দুর্ঘটনায় নিমজ্জিত হয় তখন কি এ কথা বলা হবে ঐ লোকটির মন্তব্যের কারণেই গাড়িটা দুর্ঘটনায় নিমজ্জিত হয়েছে। না বলা হবে, চালকের নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই লোকটি আগাম মন্তব্য করেছে?

আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, আপনি একটি কম্পিউটার কিনলেন। কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য সাথে একটা লিখিত গাইড লাইনও আপনাকে দেওয়া হল। গাইড লাইনে লিখা আছে, আপনি কম্পিউটারে কোন কিছু কম্পোজ করার পর সুনির্দিষ্ট কোন ফাইলে সংরক্ষণ না করলে কম্পিউটার বন্ধ করার সাথে সাথে লিখা আর থাকবে না। এখন আপনি যদি কম্পিউটারে কিছু কম্পোজ করে যথাযথ নিয়মে সংরক্ষণ না করেন তাহলে আপনার কম্পোজ করা লিখা নষ্ট হওয়ার জন্য কে দায়ী হবে? আপনি না গাইড লাইন? আরেকটি সহজ উদাহরণ লক্ষ্য করুন, একজন পিতা তার ছোট ছেলে বা মেয়েকে আগুনের পাশে খেলতে দেখে বলল, আগুনে হাত দিবে না। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে? এখন যদি সে ছেলে বা মেয়ে আগুনে হাত দেয় তাহলে কি বাপের বলার কারণে হাত পুড়ে যাবে। না আগুনের দাহ্য শক্তির কারণে হাত পুড়বে? আর তার পিতা আগাম কিভাবে বললেন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে। নিশ্চয়ই সবাই বলবেন, পিতা তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন।

উপরিউক্ত উদাহরণ দেওয়া হল বিষয়টি বুঝানোর জন্য। আল্লাহর ইলমের সাথে কোন মানুষের ইলমের তুলনা করার জন্য নয়। কারণ আল্লাহর ইলমের সাথে কোন সৃষ্টির ইলমের তুলনা হয় না। আল্লাহ্ নিজেই তাঁর ইলম সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ্ অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। অণু-পরমাণু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহৎ কিছু এর প্রত্যেকটা আছে কিতাবে।" (সাবা ঃ ৩)

এ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ তাঁর ইলমের ভিত্তিতেই লিখে রেখেছেন, কে কি করবে। কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ ভাল বা মন্দ সবকিছুর স্রষ্টা হলে মানুষ কেন মন্দ কাজের জন্য দায়ী হবে? কেউ কেউ আরেকটু খোলামেলাভাবে বলেন, কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারী কেন শাস্তি পায়? এর জবাবে আল্লামা কুরতুবী তাঁর তাফসীরে লিখেন, হত্যাকারী শাস্তি পায় তার বাড়াবাড়ির কারণে। আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে একজন নিরপরাধ মানুষকে খুন করার কারণে। যদি হত্যাকারীকে সাজা দেওয়া না হয় তাহলে দুনিয়াতে ফিৎনা-ফাসাদ আরো বেড়ে যেত।[৫০]

আল্লাহর হুকুম অমান্য করে কাউকে হত্যা করায় এবং দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই হত্যাকারীকে সাজা দেওয়া হয়।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, তাকদীরে লিখা ছিল বলেই তো সে খুন করেছে? এর জবাবে বলা যায়, তাকদীরে লিখা ছিল বলেই সে খুন করেছে বিষয়টি এভাবে বলার অর্থ হল তাকদীর সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার নয়। আল্লাহ্ আলিমুল গায়ীব। একজন মানুষ দুনিয়ার জীবনে কি করবে তা তাঁর কাছে স্পষ্ট বলেই আল্লাহ্ তাকদীরে লিখেছেন, অমুক ব্যক্তি অমুককে খুন করবে।

এবার একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, কেউ করাত আবিষ্কার করল গাছ কেটে মানুষের আসবাবপত্র তৈরি করার জন্য। এখন ঐ করাত দিয়ে কোন ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে কারো গাছ কেটে ফেলে এর জন্য দায়ী কে হবে? করাত যিনি বানালেন তিনি? না যিনি করাত খারাপ কাজে ব্যবহার করেছেন তিনি? আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, একজন ব্যক্তি বাস তৈরি করল মানুষের চলাচলের জন্য। এখন কোন বাস চালক যদি ইচ্ছা করে কারো গায়ের উপর বাস তুলে দেয় আর তার ফলে ঐ ব্যক্তি মারা যায়, এর জন্য দায়ী কে হবে? বাসচালক দায়ী হবে, না যিনি বাস তৈরি করেছেন তিনি দায়ী হবেন? আল্লাহ ভাল বা মন্দ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর কোন্ বান্দা ভাল কাজ করে আর কোন্ বান্দা খারাপ কাজ করে তা দেখার জন্য। এখন যে ভাল কাজ করবে তাকে ভাল কাজের পুরস্কার দিলে আর যে খারাপ কাজ করবে তাকে খারাপ কাজের সাজা দিলে এটা বলার সুযোগ নেই যে, আল্লাহ্ খারাপ কাজ সৃষ্টি না করলে তো কেউ খারাপ কিছু করতে পারত না।

দুনিয়াতে যত কিছু আছে সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলা। মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা এসব কিছু ভোগ করার জন্য দিয়েছেন। মানুষ কিভাবে ভোগ করলে এসব কিছু কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হবে আর কিভাবে ব্যবহার করলে অকল্যাণ হবে সবই তিনি বাতলে দিয়েছেন। এরপর এসব কিছু কল্যাণকর কাজে বা অকল্যাণকর কাজে ব্যবহার করার ইচ্ছাশক্তিও দান

www.pathagar.com

করেছেন। যে ব্যক্তি যে কাজে ব্যবহার করতে চায় আল্লাহ্ তাকে সেভাবে ব্যবহারের পথ সহজ করে দেন। আল্লাহ্ জোর করে কাউকে কিছু চাপিয়ে দেন না। কিংবা এমনটি নয় যে, "মানুষ পুতুলের মত, কিছুই করার শক্তি নেই।" মানুষ যদি জান্নাতের পথে চলতে চায়, তাকে আল্লাহ্ সে পথে পরিচালিত করেন। আর মানুষ যদি জাহান্নামের পথে চলতে চায় তাকে সে পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ তাঁর ইলমের ভিত্তিতে জানেন একজন মানুষ কোন্ পথে চলবে। আর এর ভিত্তিতেই তিনি লিখে রেখেছেন, কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

যে সব কারণে মানুষ দোযখে যাবে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পর তাদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের মৌলিক বিশ্বাসের আলোকে জীবন পরিচালনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। যাঁরা তাঁদের আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই আখিরাতে সফলকাম হবে। আর যারা ঈমান আনেনি; বরং কুফর, শিরকি ও মুনাফেকী করেছে তারা সেদিন মুক্তি পাবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পাকড়াও করেননি। তাদের রিয্ক বন্ধ করেননি। তাদেরকেও চাঁদের আলো, সূর্যের কিরণ দিয়েছেন। তাদেরকে সুঠাম দেহ ও ধন-দৌলত দিয়েছেন। কিন্তু আখিরাতে তাদের প্রতি কোন ধরনের অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে না। সেদিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর তাদের এ শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। তবে যেসব ঈমানদার বদ আমল বেশি হবার কারণে জাহান্নামে যাবে তারা সাময়িকভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

আমরা দুনিয়াতে দেখি, কোন নাগরিক যদি কোন দেশের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে অথবা গোপনে অন্য দেশের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে কিংবা দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। এক দেশের নাগরিক তার দেশের সরকারের আনুগত্য না করে অন্য দেশের সরকারের আনুগত্য করতে পারে না। অথবা তার সরকারের আনুগত্যের সাথে অন্য কোন দেশের সরকারের যৌথ আনুগত্য করতে পারে না। এসব দুনিয়ার আইনেও দণ্ডণীয় অপরাধ। আল্লাহ্, যিনি একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। দুনিয়াতে যারা তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করছে না, তারাই কাফির। আর যারা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়, তারাই মুশরিক। আবার যারা মুখে তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়; কিন্তু গোপনে অন্য কারো সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারাই মুনাফিক। আল্লাহ্ তাদের এসব কর্মকাণ্ডের জন্য আখিরাতে কঠোর শাস্তি দেবেন।

কুফর

কুফর শব্দের শাব্দিক অর্থ গোপন করা, ঢেকে রাখা। কাফিরকে এ কারণে কাফির বলা হয়, কেননা সে সত্য গোপন করে। আর কৃষককেও কাফির বলা হয়, কেননা কৃষক ফসলের বীজ মাটিতে ঢেকে রাখে। এভাবে কুফর শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে শরীয়তে কুফর বলতে, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা তথা আল্লাহ্ ও রাসূলের সকল বিধি-বিধান বা আংশিক কোন বিধান অস্বীকার করার নামই কুফর। আংশিক অস্বীকার বলতে বুঝানো হয়েছে,

www.pathagar.com

ইসলামের মৌলিক কোন বিধানকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ হালালকে হালাল বলে স্বীকার না করা এবং হারামকে হারাম বলে স্বীকার না করার নামই কুফরী। যেমন সুদ হারাম, এটা যদি কেউ অবিশ্বাস করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু সুদকে হারাম মনে করার পরও কেউ যদি সুদী কারবার করে, সে ফাসিক হবে।

কাফির চিরদিন দোযখের আগুনে জ্বলবে। আর ফাসিক যদি দোযখে যায়, তাহলে সাময়িকভাবে দোযখে জ্বলবে। তারপর নাজাত পাবে। কাফির ব্যক্তির কোন নেক আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সে কখনও আল্লাহর ক্ষমা পাবে না। কিন্তু ফাসিক ব্যক্তিকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। কুফরী কয়েকভাবে হতে পারে।

আল্লাহর জাত ও সিফাতকে মন থেকে অস্বীকার করা

এ ধরনের কাফিরদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের না ধন-সম্পদ, না সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবিলায় কোন কাজে লাগবে। তারা দোযখের ইন্ধনে পরিণত হবে। তাদের পরিণাম ঠিক তেমন হবে যেমন ফিরাউনের সাথী ও তার পূর্বেকার নাফরমানদের হয়েছিল। তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের গুনাহের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আর আল্লাহ যথার্থই কঠোর শাস্তিদানকারী।" (আলে ইমরান ঃ ১০-১১)

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন, "নিশ্চিত যারা কাফির হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন বা না করুন তাতে কিছু আসে যায় না। তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (বাকারা ঃ ৬)

আল্লাহর রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার

আল্লাহ প্রত্যেক যুগে মানবতার হেদায়াতের জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যারা তাঁদের দাওয়াত অস্বীকার করেছে আল্লাহ তাদের শাস্তিদান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "হে মুহাম্মদ! যারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, তাদের বলে দাও, সেই সময় নিকটবর্তী যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আর জাহান্নাম বড়ই খারাপ আবাস।" (আলে ইমরান ঃ ১২)

www.pathagar.com

শুধুমাত্র আখেরী নবী নয়, যে-কোন নবীর রিসালাত অস্বীকারকারীকে জাহান্নামে জ্বলতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ্ তাআলা কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ।" (আল মূলক ঃ ৯)

আল্লাহর কোন নির্দেশকে অস্বীকার করা

আল্লাহকে অস্বীকার না করে আল্লাহর কোন নির্দেশকে অস্বীকার করাও কুফরী। ইবলিস এত ইবাদত করার পরও শুধুমাত্র আদমকে সেজদা করার হুকুম অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যখন আমি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (বাকারা ঃ ৩৪)

এ থেকে প্রমাণিত হয়, কেউ যদি ইসলামের কোন বিধানকে অস্বীকার করে (যেমন যাকাত, দণ্ডবিধি ইত্যাদি) তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। মূলকথা, আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা যদি কেউ হারাম মনে করে আর আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা যদি কেউ হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, তা হল হারাম-হালাল মেনে চলতে না পারা হল ফাসেকী। আর হালাল-হারামকে অস্বীকার করা হল কুফরী।

আচরণের মাধ্যমে কুফরী

মানুষ অনেক সময় আচরণের মাধ্যমে কুফরী করে। যেমন কুরআন-হাদীসকে অবমাননা করা। আমরা মাঝে মাঝে দেখি কুরআন-হাদীসকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। কেউ যদি ইচ্ছা করে কুরআন-হাদীস-এর অবমাননা করার উদ্দেশ্যে ছুড়ে ফেলে, তাহলে এটা কুফরী হবে।

জবানের মাধ্যমে কুফরী

আল্লাহ, রাসূল ও দীনকে গালাগালি করা, আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথা বলা। যেমন কেউ যদি আল্লাহর রাসূলকে সন্ত্রাসী বলে

www.pathagar.com

আখ্যায়িত করে, সে কাফির হয়ে যাবে। এভাবে নানা পন্থায় মানুষ আল্লাহর সাথে কুফরী করে। যে পদ্ধতিতেই কুফরী করা হোক না কেন, কাফিরকে জাহান্নামের আগুনে স্থায়িভাবে জ্বলতে হবে।

শির্ক

শির্ক হল আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা। আল্লাহর জাত ও সিফাতের সমকক্ষ অন্য কাউকে মনে করা। আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা বড় ধরনের অপরাধ। আল্লাহ মুশরিককে ক্ষমা করবেন না। তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়িভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।" (বাইয়িনাহ ঃ ৬) এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, মুশরিকরা দুনিয়াতে যত বেশিই উঁচু পজিশনে থাকুক না কেন, মূলত তারাই সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধম।

শির্ক কয়েকভাবে হতে পারে

১. শির্ক ফিয্যাত ঃ আল্লাহর জাত তথা সত্তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। কেউ যদি আল্লাহর পুত্র আছে মনে করে। তাঁর স্ত্রী, কন্যা আছে বলে বিশ্বাস করে। কিংবা ফেরেশতাদের আল্লাহর বংশধর মনে করে। আর এ ধরনের শির্ক আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

২. শির্ক ফিস্সিফাত ঃ আল্লাহর গুণাবলির সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। যেসব গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, তাতে কোন মানুষ অংশীদার হতে পারে না। যেমন আল্লাহ গায়েব জানেন, কোন মানুষ গায়েব জানে না। কেউ যদি মনে করে, কোন মানুষ গায়েব জানেন তাহলে এটাও শির্ক হবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যিনি সবকিছু জানে। এমনকি নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত সববিষয় জানতেন না। আল্লাহ তাঁদেরকে যতটুকু জানিয়েছেন শুধু ততটুকুই জানতেন।

৩. শির্ক ফিল উলুহিয়্যাত ঃ আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে আর কাউকে অংশীদার করা। আমরা আল্লাহর জন্য নামায-রোযা করি, মানত করি, হজ্জ করি, উমরা করি। সব ইবাদত আল্লাহকে খুশি করার জন্যই করি। অপর দিকে হিন্দুরা দেব-দেবীর নামে পূজা করে, মানত করে। এভাবে যে-কোন পদ্ধতিতেই আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে 'কাউকে অংশীদার করা শির্ক ফিল উলুহিয়্যাত হবে।

৪. শির্ক ফিল এখতিয়ার ঃ আল্লাহর এখতিয়ারে যেসব বিষয় আছে তাতে কাউকে অংশীদার বানানো। যেমন হায়াত দেওয়া, মওত দেওয়া, ছেলে-সন্তান দেওয়া, রিযিক দেওয়া, হুকুম আহকাম দেওয়া ইত্যাদিতে শরীক করা। কেউ

www.pathagar.com

যদি আল্লাহর পরিবর্তে কোন পীর বা মাজারে গিয়ে ছেলে-সন্তান চায় তাহলে এটা শির্‌ক ফিল এখতিয়ার হবে। কেউ যদি আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে হুকুমদাতা মনে করেন তাহলেও শির্‌ক হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, মানুষ আল্লাহর হুকুম মেনে চলার জন্য যেসব ইজতিহাদী মাসয়ালা উদ্ভাবন করে তা দীনের জন্য প্রয়োজন। শির্‌ক হল, আল্লাহকে আইনদাতা মনে করার সাথে সাথে অন্য কাউকে সেই একই পজিশনে সমাসীন করা।

মূলত মানুষ মানুষের জন্য আইনদাতা হতে পারে না। আল্লাহর জমিনে আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর খলীফা। মানুষ আইনদাতা নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, দুনিয়াতে বিভিন্ন দেশের সংসদ যে আইন করে তা কি বৈধ নয়? সংসদ যে আইন করে তা তখন অবৈধ হবে না যদি আল্লাহর আইন দুনিয়াতে বাস্তবায়ন করার জন্য এসব খুঁটিনাটি আইন প্রণয়ন করা হয়। আর এই আইনের উৎস, মানুষের বিবেক বা চিন্তা বুদ্ধি হলেও, মানুষ যদি কুরআন ও হাদীসের মৌলিক নীতিমালার বিপরীত কোন আইন না প্রণয়ন করে, তাহলে তা শুধু বৈধই হবে না; বরং সময়ের অনিবার্য দাবিও হবে। কিন্তু আল্লাহর আইনের সাথে টক্কর লাগে যদি এমন আইন মানুষ প্রণয়ন করে, তাহলেই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শির্‌ক হবে।

পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহর সাথে শির্‌ক করে। এ শির্‌ক মানুষের সব আমল নষ্ট করে দেয়। আর শির্‌কের ক্ষেত্রে জানার বিষয় হল, শির্‌ক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয়। তাই যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। তাদেরকে চিরদিন দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে। দুনিয়ার জীবনে ছোটখাটো এমন অনেক বিষয় আছে যাতে শির্‌কের গন্ধ থাকে। যেমন কারো নাম খালেকজ্জামান রাখা, গণকের কাছে যাওয়া, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম খাওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের শির্‌কও মারাত্মক গুনাহ।

উলামায়ে কেরাম শির্‌ককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

শির্‌কে আকবর

এ ধরনের শির্‌ক এর কারণে স্থায়িভাবে জাহান্নামে থাকতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "দুটি বৈশিষ্ট্য দুটি জিনিসকে আবশ্যকীয় করে তোলে। এ কথা শ্রবণের পর জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে দুটি জিনিস কি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শির্‌ক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করা ছাড়া (খালেস ঈমানদার অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)

www.pathagar.com

শিরকে আকবর বিভিন্নভাবে হতে পারে

১. আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা করা বা কারো কাছে এমন কিছু চাওয়া যা একমাত্র আল্লাহ্ই দিতে পারেন। যারা অনেককে উপাস্য মনে করে, তারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে। আর যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন কিছুর ফরিয়াদ করে, প্রকারান্তরে তারা একথা বিশ্বাস করে যে, যার কাছে যে জিনিস তারা চাচ্ছে তিনি তা দিতে সক্ষম। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না।

২. আল্লাহ ছাড়া আর কারও আনুগত্য করা। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য না করে অন্য কারো আনুগত্য করা। তবে উলিল আমরের আনুগত্য করতে হবে। তাঁরা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কিছু না করলে তাঁদের আনুগত্য করাও ফরয। এখানে সে আনুগত্যের কথাই বলা হয়েছে, যে আনুগত্য করতে গেলে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা হয়।

শিরকে আসগর

এ ধরনের শিরকের কারণে জাহান্নামে দেওয়া না দেওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মানুষ প্রতিনিয়ত এমন অনেক কথা বলে, এমন অনেক কাজ করে যাতে শির্কের ছাপ থাকে। একজন মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে হলে বড়-ছোট সব ধরনের শির্ক থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

শিরকে আসগর বিভিন্নভাবে হতে পারে ঃ

১. আল্লাহর চেয়ে অন্য কাউকে বেশি মহব্বত করা। একজন মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালবাসবে তার মনিব আল্লাহকে। যদি কেউ আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে বেশি ভালবাসে তাহলে বুঝতে হবে তার ভালবাসায় আল্লাহর সাথে অন্য কেউ অংশীদার আছে।

২. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বেশি ভয় করা। একজন মানুষ ভয় করবে শুধুমাত্র আল্লাহকে। আল্লাহর চেয়ে কোন মানুষকে বেশি ভয় করার অর্থ হল, এক্ষেত্রে অন্য কেউ আল্লাহর সাথে শরীক আছে, এটা বুঝানো।

৩. আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপর বেশি নির্ভরশীল হওয়া। মানুষ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকবে। সে কোন ব্যক্তি বা বস্তুগত উপায় উপাদানের উপর নির্ভরশীল থাকবে না।

যেভাবেই শির্ক করা হোক না কেন তা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। এ কারণে আল্লাহ্ শির্কের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে সূরা নিসায় ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ শির্কের গুনাহ মাফ করেন না। এ ছাড়া যে-কোন গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন।" তাই আমাদেরকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের কোন কথা বা কাজে শির্ক হয়ে যায় কিনা?

www.pathagar.com

নিফাক

কাফির তারা যারা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। আর মুনাফিক তারা যারা প্রকাশ্যে অস্বীকার করে না; তবে ভেতরে ভেতরে আল্লাহ্‌র দীনের বিরোধিতা করে। সময় সুযোগ পেলে দীনের মারাত্মক ক্ষতি করে। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে মুনাফিকরা দীনের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি দিবেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন, "সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দেন, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।" (নিসা ঃ ১৩৮)

আল্লাহ্ আরো বলেন, "নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।" (নিসা ঃ ১৪৫)

এ থেকে বুঝা যায়, কুফরীর চেয়ে নিফাকী জঘন্য। আল্লাহ্ মুনাফিকী খুবই অপছন্দ করেন।

এখন আলোচনা করা দরকার, নিফাক কি? নিফাক হল, মনে যা আছে তার বিপরীত প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই।" (ফাতহ্ ঃ ১১)

নিফাককে উলামায়ে কেরাম দু'ভাগে ভাগ করেছেন

নিফাকে আকবর

আকীদাগত বিষয়ে নিফাকী। অর্থাৎ মুখে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়ন করার কথা প্রকাশ করা কিন্তু বাস্তবে ঈমান না আনা। এ কথা আল্লাহ্ এভাবে তুলে ধরেছেন, "আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না; কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না।" (বাকারা ঃ ৮-৯)

এ ধরনের মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "আর যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়; তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে; তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।" (বাকারা ঃ ১৪)

www.pathagar.com

এ ধরনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত, যারা মুখে ঈমানের দাবি করে কিন্তু অন্তরে ঈমান নেই তারা হল মুনাফিক। আর মুনাফিকরা কাফিরদের চেয়ে বেশি ঘৃণিত। কারণ, কাফিরদের বিরোধিতা প্রকাশ্যে বাইরে থেকে আসে আর মুনাফিকদের বিরোধিতা গোপনে ভেতর থেকেই হয়। যখন তাদের কুটিল চক্রান্ত ধরা পড়ে অনেক সময় তা মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের শক্রতা ও বিরোধিতা পরিষ্কার ছিল; কিন্তু কিছু সংখ্যক মুনাফিক এভাবে জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটবে তা আগে পরিষ্কার ছিল না। এ কারণে মুনাফিকরা অনেক সময় কাফিরদের চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। তাই আল্লাহ্ মুনাফিকদেরকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেবেন।

আকীদাগত নিফাকী বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। যেমন আল্লাহর রাসূলের রিসালাতের পূর্ণঅংশ বা আংশিক অস্বীকার করা। আল্লাহর রাসূলের আদর্শের সাথে শক্রতা প্রদর্শন। দীনের ক্ষতি হলে উৎফুল্ল হওয়া এবং দীনের বিজয় দেখলে মন খারাপ হওয়া ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাতে তারা আনন্দিত হয়।" (আলে ইমরান ঃ ১২০)

মুনাফিকরা বিভিন্নভাবে দীনের ক্ষতি করে। তারা দীনের অনুসারী পরিচয় দিয়ে দীন সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এ কারণে ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল তার অনুসারীদের নিয়ে মদীনায় মসজিদে নববীর অনুসরণে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে এবং ঐ মসজিদ আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে উদ্বোধন করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উদ্যোগ নেয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মসজিদটি উদ্বোধন করবেন বলে জানান। পথিমধ্যে আল্লাহ্ জানিয়ে দেন, এ মসজিদ দীনের উপকারের জন্য নয়, বরং দীনের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নির্মিত। আল্লাহ্ এ মসজিদের নাম দেন মসজিদে দ্বেরার।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামের লেবাস পরিধান করে ইসলামের বিরোধিতা আজকে নতুন নয়। রাসূলের সময়ও এ প্রক্রিয়ায় মুনাফিকরা দীনের বিরোধিতা করত। তারা দীনের অনুসারীদের মাঝে বিভিন্ন ফেরকা সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। আর এভাবে ফেরকা সৃষ্টি করে ইসলাম বিরোধীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, আর এমন কিছু লোক আছে যারা ইসলামের ক্ষতিসাধন, আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ, মু'মিনদের মধ্যে বিবেধ সৃষ্টি করা এবং পূর্ব হতে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রামরতদের হাত শক্তিশালী করনের উদ্দেশ্যে (ষড়যন্ত্রের মাখড়া স্বরূপ) একটি সমজিদ নির্মাণ করেছিল। (মসজিদ প্রতিষ্ঠার কারণ পৃসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে) তারা নিশ্চয়ই কসম খেয়ে বলবে যে,

www.pathagar.com

ভাল ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা একেবারেই মিথ্যাবাদী। (তওবা ঃ ১০৭)

শুধু আজকে নয় অতীতেও মুনাফিকরা ইসলাম বিরোধীদের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করেছে এবং তাদের মাধ্যমে দীনের বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "হে রাসূল, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়। যারা মুখে বলে আমরা মুসলমান অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদী, মিথ্যা বলার জন্য তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনই যে, আল্লাহ্ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি। (মায়েদাহ ঃ ৪১)

এ ধরনের মুনাফিকদের কাছে ইসলামের অনুসারীরা প্রিয়ভাজন নয় বরং ইসলামের দুশমনদের সাথেই তাদের মিল-মহব্বত বেশি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদের কাছেই সম্মান প্রত্যাশা করে।" (নিসা ঃ ১৩৯)

তারা ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে সমাজ পরিচালিত হোক তা চায় না। বরং তাদের কামনা-বাসনা থাকে তাগুতী জীবনব্যবস্থা কিভাবে সমাজে চালু করা যায়।

তারা ইসলামের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম নিয়ে হাসি-তামাশা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যখন তোমরা নামাযের জন্য আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলনা মনে করে। কারণ তারা নির্বোধ।" (মায়েদাহ ঃ ৫৮)

তারা নিজেরা তো দীনের পথে অর্থ সম্পদ খরচ করে না; বরং যারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে তাদেরকে নিয়ে উপহাস করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর সেসব লোক যারা ভর্ৎসনা বিদ্রূপ করে সে সব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান খয়রাত করে।" (তাওবা ঃ ৭৯)

তারা শুধু উপহাসই করে না, অনেক সময় আল্লাহর দীনের জন্য মাল খরচ করতে নিষেধ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তারাই বলে, আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় কর না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্রই; কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।" (মুনাফিকুন ঃ ৭)

www.pathagar.com

তারা সমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। আল্লাহ্ বলেন, 'যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' (নূর ঃ ১৯)

এভাবে কুরআনের অনেক জায়গায় মুনাফিকদের সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, কিভাবে তারা দীনের ক্ষতি করে।

নিফাকে আসগর

এটা আমলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শরীয়তের কোন বিষয় নিজে আমল না করে অপরকে উপদেশ দেওয়ার নামই হল নিফাকে আসগর অর্থাৎ ছোট নিফাকী। এটাও আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। তবে এটা আকীদাগত নিফাকীর মত জঘন্য নয়। এ ধরনের নিফাকীও গুনাহ্।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা মানুষকে সৎ কর্মের আদেশ দাও এবং নিজেরা-নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। (বাকারা ঃ ৪৪)

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেউ কোন বিষয় আমল করতে না পারলে কাউকে উপদেশ দিতে পারবে কিনা?

উপরিউক্ত আয়াতের ভিত্তিতে আলেমদের কেউ কেউ মনে করেন, নিজে আমল না করে অপরকে উপদেশ দেওয়া বৈধ নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, উপদেশ দেওয়া নাজায়েয নয়। সে উপদেশ দেওয়ার জন্য সওয়াব পাবে আর নিজে আমল না করার জন্য গুনাহ্গার হবে।

আমাদেরকে জায়েয-নাজায়েযের বিরোধে না গিয়ে শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহ নিজে আমল করা এবং অপরকে উপদেশ দেওয়া উচিত। দীনের উপদেশ দেওয়া ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। আর দীনের উপর নিজে আমল না করে উপদেশ দেওয়া বৈধ হলেও তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।" (ছফ ঃ ৩)

রিদ্দাত

রিদ্দাত হল, দীন কবুল করার পর আবার ত্যাগ করা। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, মুনাফিকরা ঈমান এনে আবার ত্যাগ করত। এর মাধ্যমে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করত যে, "আমরা ঈমান এনে দেখেছি, ইসলামের ভেতর কি আছে? আসলে ইসলামের ভেতর তেমন কিছুই নেই।" দীনের ক্ষতি করার জন্য তারা দীন ত্যাগ করত। আর এভাবে ঈমান কবুল করে আবার ত্যাগ

www.pathagar.com

করার জন্য তারা উৎসাহিত করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর আহ্লে কিতাবগণের একদল বলল, মুসলমানদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা দিনের প্রথমভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষভাগে অস্বীকার কর। হয়ত তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।" (আলে ইমরান ঃ ৭২)

ইসলাম এটাকে কঠোরভাবে দমন করতে চায়। তাই তাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা না করার কথা ঘোষণা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যারা একবার মুসলমান হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফির হয়ে গেছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন।" (নিসা ঃ ১৩৭)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, কেমন করে আল্লাহ্ এমন জাতিকে হেদায়াত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পরও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফির হয়েছে। আর আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।" (আলে ইমরান ঃ ৮৬)

ইসলামে রিদ্দাত মস্ত বড় অপরাধ। এমনকি আংশিকভাবেও ইসলামের কোন মৌলিক বিধান অস্বীকার কারীদেরকেও ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না। তাই হযরত আবূ বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। যারা মুরতাদ হয়ে যায় তাদেরকে শুধু দুনিয়াতে নয়; বরং আখিরাতেও আল্লাহ্ কঠিন আযাব দিবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই অগ্নিবাসী এবং সেখানেই তারা স্থায়িভাবে থাকবে।" (বাকারা ঃ ২১৭)

ইসলাম সমাজকে ইরতিদাদের ফিতনা মুক্ত রাখতে চায়। তাই এ জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেছে। যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তাকে প্রথমত তিনদিনের সময় দিয়ে এর ভেতরেই ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানাতে হবে। সে যদি এর মধ্যে ফিরে না আসে তাহলে তাকে হত্যা করাই হল ইসলামের নির্দেশ।

ইসলামের সমালোচনা করে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন, ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। কেউ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা বা না করা তার ব্যক্তি স্বাধীনতা। ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ ঠিক নয়। ইসলাম জোর করে কারো উপর ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেয় না। আল্লাহ্ কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" অর্থাৎ দীন

www.pathagar.com

কবুল করার ক্ষেত্রে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম বুদ্ধি-বিবেকের স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে ধর্মবিশ্বাস লালন করার সুযোগ দিয়েছে। তাই কোন ইসলামী দেশে অমুসলিম নাগরিককে জোর করে মুসলমান বানাবার নজির নেই।

ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাস লালন করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়ার সাথে সাথে ঘোষণা করেছে, কেউ স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে ইসলামকে জীবন-দর্শন হিসেবে গ্রহণ করার পর ইসলাম অনুসরণ করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন, "উদখুলু ফীস সিলমি কাফফাহ" অর্থাৎ তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হও। একজন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করার অর্থ হল ইসলামকে দীনে হক মনে করে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করার স্বীকৃতি প্রদান। এরপর যদি এ পথ উন্মুক্ত রাখা হয় যে, কোন ব্যক্তি যে-কোন সময় ইসলাম ত্যাগ করতে পারবে এতে কোন দোষ নেই, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, ইসলাম যে একমাত্র দীনে হক এ কথা ঠিক নয়। আর এটাকে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে ইহুদী-খ্রিস্টানসহ ইসলাম বিদ্বেষীদের পরিকল্পনায় অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবে। কারণ, কোন অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে লিখা বা মন্তব্য করা যতটুকু ক্ষতিকর তার চেয়ে অনেক মারাত্মক হল একজন মুসলমান কর্তৃক ইসলামের বিরুদ্ধে লিখা বা মন্তব্য করা। ইসলাম বিরোধীরা প্রচুর অর্থ দিয়ে এ ধরনের লোকদেরকে লালন করবে। এ কারণে ইসলাম এ ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেছে। শুধু ইসলাম কেন, ইহুদী-খ্রিস্টানরাও তাদের ধর্মের অবমাননা সহ্য করে না। ব্রিটেনসহ অনেক দেশের আইন অনুযায়ী ইহুদী বা খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে অমাননাকর বক্তব্য প্রদান আইনত দণ্ডনীয় । তারা গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার তথাকথিত ধ্বজাধারী হয়েও যদি তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে টু শব্দ সহ্য করার মানসিকতা না রাখে, তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ অবমাননাকর উক্তি করলে ইসলাম তার জন্য শাস্তি দিলে এটাকে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্ত ক্ষেপ বলে সমালোচনা করার হেতু কি?

ভ্রান্ত ধর্ম, দর্শন বা আকীদা অনুসরণ

আল্লাহ্ চান তাঁর বান্দারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের পূত-পবিত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনে পূত-পবিত্র জীবন-যাপন করুক। তাঁর দেওয়া বিধানের আলোকেই দুনিয়াকে ঢেলে সাজাক। এ কারণেই আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। আর অনেক কিতাবও নাযিল করেছেন। নবী-রাসূলগণের আগমনের ধারায় সর্বশেষ আল কুরআন নিয়ে এসেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর আগমনের সাথে সাথে পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

রাসূলেগণে শরীআত রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ সকলকে তাঁর সর্বশেষ রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করাকেই অপরিহার্য করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ চান তাঁর বান্দারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত করুক। আর তাঁর আদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবী পরিচালিত হলেই তামাম পৃথিবীতে বিরাজ করবে শান্তি, শৃঙ্খলা। আল্লাহ্ দুনিয়াতে শান্তির সমাজ চান। তিনি অশান্তি পছন্দ করেন না। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পরও আগেকার নবী রাসূলগণের অনুসরণ বৈধ রাখা হলে ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি হত, কোন্ নবী শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে কলহ হত। আর একই সমাজে নানা ধরনের নিয়ম প্রচলিত থাকত। কেননা যদিও সব নবীর দীন এক; কিন্তু শরীয়তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ্ সবাইকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, "তিনিই হলেন আখেরী নবী"। আর তিনিই হলেন নবীদের সেরা। আল্লাহর এ ঘোষণার পরও যারা নিজেদেরকে আহলে কিতাব দাবি করে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করছে না তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর কথাকেই মানছে না। আর যারা আখেরী নবীকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করার পর তাঁর আদর্শ গ্রহণ না করে অন্য কোন আদর্শ বা জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে ব্যক্তিজীবন, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। কিংবা মনে করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন উত্তম বিধান প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ) একজন মানুষকে আখিরাতে নাজাত পেতে হলে আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে স্বীকার করার সাথে সাথে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শকে জীবন আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি আল্লাহকে ইলাহ্ হিসেবে স্বীকার করার পর আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন না করে কিংবা সমাজ না চালায় তাহলে বুঝতে হবে তার বিশ্বাসের মধ্যে গলদ আছে। আর আল্লাহ্ 'গলদ বিশ্বাস' পছন্দ করেন না।

আল্লাহ্ তাআলা গলদ বিশ্বাসের কারণে আখিরাতে অনেককে শাস্তি দিবেন। তাদের মধ্যে রয়েছে বর্তমানে আহলে কিতাবের দাবিদার ইহুদী-খ্রিস্টানসহ আরো অনেক জাতি বা সম্প্রদায়। তারা ধর্ম বিশ্বাসী হলেও দীনে হকের অনুসারী নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ ভ্রান্ত ধর্ম, দর্শন বা মতবাদের পরিবর্তে দীনে হকের অনুসরণই তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে কামনা করেন। আর ইসলামই হল একমাত্র দীনে হক। তাই যারা ইসলাম অনুসরণ করছে না তারা অন্য যে-কোন ধর্মই পালন করুক না কেন আখিরাতে তারা নাজাত পাবে না।

www.pathagar.com

ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসরণ

আল্লাহর রাসূলের আগমনের সাথে সাথেই পূর্ববর্তী সকল ধর্ম মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। তাই সকলকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, "যদি মারইয়াম পুত্র ঈসাও জীবিত থাকত তাহলে তাকেও আমার আনুগত্য করতে হত। এ কারণে, বর্তমানে ইহুদী, নাসরাসহ যারা আহলে কিতাবের দাবিদার তাদেরকেও দোযখে জ্বলতে হবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, "সেই আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। আমার দাওয়াতী উম্মতের মধ্যে যারাই আমার কথা শুনবে না, তারা ইহুদী হয়ে মরুক বা খ্রিস্টান হয়ে মরুক। আমি যা নিয়ে এসেছি তারা যদি তার উপর ঈমান না আনে তাহলে জাহান্নামী হবে।"-(মুসলিম) আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে তাদেরকে মাগদূব (অভিশপ্ত) ও দাল্লীন (পথভ্রষ্ট) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন, "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

সকল ধর্মইতো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, এ যুক্তিতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করা সুস্পষ্ট গোমরাহী।

আমরা নিম্নে কয়েকটি ধর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। কেন এসব ধর্ম বর্তমানে অনুসরণযোগ্য নয়? কেন এসব ধর্মের অনুসরণ করলে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে? এ আলোচনার শুরুতেই ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে দেখি, এ দুটি ধর্ম বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে?

ইহুদীবাদ

ইহুদী ধর্ম বর্তমানে বিকৃত ধর্ম বৈ আর কিছুই নয়। হযরত ইয়াকুবের চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার বংশধররা যখন রাজ্য ক্ষমতা পায় তখন এ পরিবারের লোকদেরকে 'ইয়াহুদিয়া' নামে অভিহিত করা হয়। বনী ইসরাঈলের অন্যান্য গোত্রগুলো 'সামিরিয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে শুধু ইয়াহুদা ইবনে ইয়ামিন বংশেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বাকি থাকে। ইয়াহুদার বংশধরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি থাকায় তাদেরকে 'ইহুদী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৫১]

প্রথম পর্যায়ে ইহুদীদের চিন্তা ও দর্শনে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের কিছুটা সংমিশ্রণ থাকলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পাদ্রী ও পুরোহিতদের বিকৃত ধারণা, বিশ্বাস ও রীতি-নীতি এ মতবাদের দর্শনে পরিণত হয়। এমনকি তারা তাওরাতের মধ্যেও রদবদল করে। আর এ বিকৃত তাওরাতই ইহুদীবাদের

www.pathagar.com

উৎস। তারা মূল বিষয় ছেড়ে দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের কোন সম্ভ্রান্ত লোক অপরাধ করলে তার জন্য শরীআতকে বিকৃত করা শুরু করে দেয়। এমনকি হালাল ও হারামে পর্যন্ত রদবদল করে। তারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের আগে তাঁর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো; কিন্তু তাঁর আগমনের পর তাঁর সাথে খারাপ আচরণ শুরু করে দেয়। তারা তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে না নিয়ে গোঁড়ামি প্রদর্শন করলো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "আর যখন একখানা কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নিকট এলো, যে কিতাব পূর্ব থেকে তাদের নিকট যা আছে তারই সত্যতার সাক্ষ্য দেয় এবং এ কিতাবের আগমনের পূর্বে তারা কাফিরদের মোকাবিলায় যার দ্বারা বিজয় ও সাহায্য প্রার্থনা করত। এতদসত্ত্বেও সে জিনিস যখন তাদের সামনে এসে গেল এবং তাকে তারা চিনতেও পারলো, তথাপি তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করল।" (বাকারা ঃ ৮৯)

তাদের ইন্ধনেই আল্লাহর রাসূলের যুগে অনেক ফিতনা সৃষ্টি হয়। আর বর্তমানে ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিম নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাদেরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ইহুদীরা অতীতের মত এখনও খুনের নেশায় মত্ত। সুদূর অতীতে তারা হযরত ইয়াহইয়াকে হত্যা করে তাঁর ছিন্ন মস্তক তাদের বাদশাহর রক্ষিতাকে উপহার দেয়। বর্তমানে তারা কি করছে? ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিরপরাধ মুসলিম নারী-শিশু, আবাল-বৃদ্ধা-বনিতাকে অহরহ খুন করছে। কাশ্মীর, চেচনিয়া, বসনিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম নির্যাতনের ক্ষেত্রে ইহুদী পরিকল্পনা কাজ করছে। এমন কি যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ ঠেকাতে ইসলামপ্রিয় মানুষের উপর যুলুম নির্যাতন করা হয়, সেক্ষেত্রেও ইহুদী চক্রান্ত দায়ী। অপরদিকে তারা বিভিন্ন গরীব দেশে এনজিও প্রতিষ্ঠার মাধমে সমাজসেবার ছদ্মাবরণে ইসলাম ধর্মের প্রতি মুসলিম যুব সমাজ ও মহিলাদেরকে বিশেষভাবে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করছে। নাইট ক্লাব, লায়ন ক্লাব-এর মাধ্যমে চরিত্র ধ্বংস করার কাজে তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। তারা বিভিন্নভাবে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করে। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (মায়েদাহ্ ঃ ৫১)

এ আয়াতে আল্লাহ বন্ধুত্ব বলতে গভীর বন্ধুত্বের কথা বুঝিয়েছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ইহুদী ও নাসারাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা মুসলমানদের জন্য উচিত নয়। তবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সাধারণ সম্পর্ক রক্ষা করা বৈধ।

www.pathagar.com

ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আকীদাগত মারাত্মক গলদ রয়েছে। তারা মনে করে, তারা আল্লাহর সন্তান ও খুবই প্রিয়ভাজন। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে কুরআনে বলেন, "ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়ভাজন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দেবেন?" (মায়েদাহ ঃ ১৮)

এ শাস্তির ব্যাপারেও তাদের মধ্যে চিন্তার বিভ্রান্তি রয়েছে। তারা মনে করে তাদেরকে জাহান্নামে অল্প কয়েকদিনই থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ ধরনের বিশ্বাসের কথা কুরআনে এভাবে চিত্রিত করেছেন, "তারা বলে আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, কিন্তু হাতে গোনা কয়েকদিন। বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ কখনও তার খেলাফ করবেন না। না, তোমরা যা জান না তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছ। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।" (বাকারা ঃ ৮০-৮২)

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, ইহুদী নাসারাসহ যারা ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর রয়েছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এটা হাতে গোনা কয়েকদিনের জন্য হবে না, এটা হবে তাদের স্থায়ী আবাস। জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যথাযথ ঈমান আনতে হবে।

খ্রিস্টবাদ

খ্রিস্টানদেরকে আরবীতে 'নাসারা' বলা হয়। নাসারা শব্দটি কিভাবে তাদের সাথে যুক্ত হয় এ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। কারো কারো ধারণা, 'নাসেরা' ছিল হযরত মসীহ (আ)-এর জন্মভূমি। এ কারণে পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরা 'নাসারা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কারো কারো মতে, 'নাসারা' শব্দটি আরবী 'নুসর' শব্দ থেকে এসেছে। হযরত ঈসা (আ) যখন ঘোষণা করলেন, 'মান আনসারী ইলাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে? তখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, 'নাহনু আনসারুল্লাহ' অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।

নাসারা শব্দটি যেভাবেই উৎপত্তি হোক না কেন খ্রিস্টানরা নিজেদেরকে কখনও এ নামে ডাকেনি। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেন্টপল এবং বার্নাবাস যখন এন্তাকিয়ার মুশরিক অধিবাসীদেরকে ৪৩ বা ৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঈসা মসীহ (আ)-এর ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান, তখন বিরোধীরা তাদেরকে বিদ্রূপ করে এ নামে ডাকা শুরু করে। তারা প্রথমে এ নামে নিজেদেরকে পরিচয় না দিলেও পরবর্তীতে এ নামকে গ্রহণ করে নেয়।[৫২]

www.pathagar.com

আরো অনেক পরে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস একটি মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আর তা বর্তমানে খ্রিস্টবাদ হিসেবে পরিচিত। এ থেকে বুঝা যায়, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করলেও হযরত মসীহ (আ)-এর সময় এটার অস্তিত্ব ছিল না। যার কারণে খ্রিস্টবাদ কিছু অদ্ভুত বিশ্বাসে রূপ নেয়। তারা হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই তাদের মধ্যে এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্ম নেয়।

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বই-পুস্তক থেকে জানা যায়, তারা আকীদাগত মারাত্মক ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের মৌলিক দর্শন হল-ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্ত। তারা মনে করে, বনী আদম সকলেই পাপী। আর দুনিয়াতে পাপের সূচনা হযরত হাওয়ার মাধ্যমেই হয়েছে। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ আদম বংশধর হওয়ার কারণে তারা কেউ পাপ মুক্ত নন। একমাত্র হযরত ঈসা (আ) নিষ্পাপ। কেননা তিনি আল্লাহর পুত্র। তাদের আরো ধারণা হল তিনি সকল পাপীদের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ক্রুশে আরোহণ করেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল নবী-রাসূলই নিষ্পাপ। আর কেউ কারো অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে না। কেননা আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "কোন বহনকারী ব্যক্তি কখনও অন্যের বোঝা বহন করতে পারে না।"

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে সম্মান দিতে গিয়ে ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র ও তিন খোদার এক খোদা মনে করে। (নাঊযুবিল্লাহ) এভাবে তারা গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনেক উদাহরণ কুরআনে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তাদের এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে ইরশাদ করেন, "মারইয়াম পুত্র মসীহ-ঈসা আল্লাহর রাসূল ও একটি ফরমান, এ ছাড়া আর কিছু নয়।" (নিসা ঃ ১৭১)

খ্রিস্টানরা মনে করে যেহেতু হযরত ঈসার কোন পিতা ছিল না। হযরত মারইয়াম (আ)-এর সাথে কারো বিয়ে হয়নি। তাই হযরত ঈসা আল্লাহরই পুত্র। (নাঊযুবিল্লাহ)

মজার ব্যাপার হলো, খ্রিস্টানরা তাদের বিশ্বাসের আলোকে তাদের ধর্মগ্রন্থ পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলে। তারা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণের পরিবর্তে পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণ করেই চলছে। এভাবে তারা আল্লাহর দীন নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ ইরশাদ করেন, "বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা দীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি কর না এবং তোমাদের পূর্বে যারা স্বয়ং পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের চিন্তাধারা অনুসরণ কর না। (মায়েদাহ ঃ ৭৭)

www.pathagar.com

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস যে বাড়াবাড়ির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত তা এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। যার কারণে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহ্‌লে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফিরে পরিণত করবে।" (আলে ইমরান ঃ ১০০)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, ইহুদী-নাসারাদের কথা বিশ্বাস করা কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয়। কারণ তারা ঈমানদারদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, হে আহ্‌লে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ঈমানদারদিগকে বাধা দান কর। তোমরা তাদের দীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর। অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ।" (আলে ইমরান ঃ ৯৯)

বস্তুত তারা যদি ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করত, তাহলে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত স্বীকার করে নিত। কেননা হযরত ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর স্মরণ কর মারইয়াম পুত্র ঈসার সে কথা যা সে বলেছিল। হে বনী ঈসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। আমি সত্যতা স্বীকারকারী সেই তাওরাতের যা আমার পূর্বে এসেছে এবং বিদ্যমান আছে এবং আমি সুসংবাদদাতা এমন এক রাসূলের যে আমার পরে, আসবে যার নাম হবে আহমদ। (সফ ঃ ৬)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। তারা বর্তমানে বিকৃত ধর্ম প্রচার করে অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আল্লাহ্‌র রাসূলের আবির্ভাবের পর তাঁর আনুগত্য না করে তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছে। এ কারণে তারা আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

আমরা দুনিয়াতে দেখি, এক সরকারের পরিবর্তন হয়ে নতুন সরকার এলে জনগণকে নতুন সরকারেরই আনুগত্য করতে হয়। নতুন সরকার এসে আগের সরকারের যেসব আইন বহাল রাখে তা কার্যকর থাকে আর যেসব আইন বাতিল ঘোষণা করে তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। আর বাতিল হওয়া কোন আইনের ভিত্তিতে দুনিয়াতে কোন বিচার-ফয়সালা হয় না। বিচার-ফয়সালা হয় বিদ্যমান আইনের ভিত্তিতে। এমতাবস্থায় নতুন আইন গ্রহণ না করে বাতিলকৃত আইন অনুসরণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

আল্লাহ্ তাআলা যুগে যুগে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে যে বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তা প্রত্যেক যুগের মানুষের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এক নবীর

www.pathagar.com

তিরোধানের পর আবার যখন নতুন নবী বা রাসূল আসেন তখন তাঁর অনুসরণ করাই কর্তব্য। নতুন রাসূল আসার পর আগেকার রাসূলের যেসব বিধি-বিধান আল্লাহ্ বহাল রাখেন তা অনুসরণ করতে হয়। আর যা রহিত হয়ে যায়, তার অনুসরণের পরিবর্তে নতুন শরীয়তের অনুসরণ করা অপরিহার্য। দুনিয়াতে দেখা যায়, একই সংবিধানের অনুসরণ করে একেক সরকার একেক ধরনের খুঁটিনাটি আইন করেন। অনেক সময় দেখা যায়, এক সরকারের আমলে প্রণীত আইন নিজেরা বাতিল করে তাঁরাই আবার নতুন আইন প্রণয়ন করছেন।

প্রত্যেক নবী বা রাসূল একই দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁদের দাওয়াতের মূলকথা সবসময় এক ছিল। আর তা হলো, লা শারীক আল্লাহ্র ওয়াহ্দানিয়্যাত ও রবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি। তাঁদের সকলের দাওয়াতের মূলকথা এক হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে শরীয়তের মধ্যে ফারাক দেখা যায়। তাই প্রত্যেক যুগের মানুষদের সে যুগের নবী বা রাসূলের অনুসরণ করা অপরিহার্য।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরী নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করবে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবতাকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। কোন মানুষ আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য না করে যতই ধর্ম-কর্ম করুক না কেন তা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

হিন্দু ধর্ম

বিশ্বের প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্ম অন্যতম। এ ধর্মের সাথে আল্লাহ্র কোন নবী বা রাসূলের সম্পর্ক অতীতে ছিল কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, হযরত নূহ (আ)-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে এ ধর্মের কিছু কিছু মিল আছে। কিন্তু অধিকাংশ গবেষকের মতে, এ ধর্মের সাথে আল্লাহ্র কোন নবী বা রাসূলের সম্পর্ক অতীতে কখনও ছিল না। গবেষকদের কারো কারো মতে, সিন্ধু নদীর তীরবর্তী স্থান থেকে এ ধর্মের জন্ম হয়। এ কারণেই 'সিন্ধ' শব্দের পরিবর্তে 'হিন্দ' শব্দ থেকেই এ ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। মহাত্মাগান্ধী এ সম্পর্কে বলেন, "আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, হিন্দু ধর্ম নয়। মুসলমানগণ আমাদেরকে এ নামে পরিচিত করে।" সরকার শাস্ত্রী বলেন, সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আর্যরা বসবাস করত। পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাদেরকে 'সিন্দুস্থানের' অধিবাসী না বলে হিন্দুস্তানের অধিবাসী বলে ডাকতো। তাদের থেকেই এ ধর্মের সূচনা বলে এ ধর্ম 'হিন্দু ধর্ম' নামেই পরিচিতি লাভ করে।

যেখান থেকে যেভাবেই এ ধর্মের সূচনা হোক না কেন, বর্তমানে ভারত ও নেপালসহ কয়েকটি দেশে এ ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। আর

www.pathagar.com

এ ধর্মের অনুসারীরা যে বিশ্বাস লালন করে তার মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের অনেক ভ্রান্তি রয়েছে। হিন্দু ধর্ম মূলত কতিপয় বিশ্বাসের সমষ্টি। আর্যগণের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে এ বিশ্বাসের গোড়াপত্তন হয়। আর্যরা প্রথমত বৈদিক ধর্মের অনুসারী ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের 'ধর্মগ্রন্থ বেদ' হারিয়ে যেতে থাকে। এক সময় বৈদিক ধর্ম লোপ পায় এবং জৈনিক ধর্মের আবির্ভাব হয়। এ ধর্মের মধ্যেও কুসংস্কার ঢুকে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে। আর এ পৌত্তলিকতা থেকেই হিন্দু ধর্মের গোড়াপত্তন হয় বলে অনেকে মনে করেন।

হিন্দু ধর্মে অনেকগুলো মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে বেদ, মহাভারত, গীতা, সংহিতা, রামায়ণ, অর্থবেদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদের গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায় যে, তারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাস হল ভাল বা মন্দ কর্মের উপর ভিত্তি করে মানুষ দুনিয়াতে আবার জন্ম নেয়। যেমন তাদের কারো কারো ধারণা, পানি চুরি করলে পাখি আর দুধ চুরি করলে কাক হয়ে দ্বিতীয়বার জন্ম নেয়।

কবি জীবনানন্দের কবিতায় পুনর্জন্ম লাভের কথা এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

> আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এ রূপসী বাংলায়
> হয়ত মানুষ নয়—হয়ত শঙ্খচিল শালিকের বেশে।

পুনর্জন্মলাভের এ বিশ্বাস ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলাম মনে করে, মানুষ দুনিয়াতে দ্বিতীয়বার আর জন্ম নেয় না। কিয়ামতের পর ইসরাফীলের শিঙ্গা ধ্বনির মাধ্যমে মানুষ হাশরের ময়দানেই আবার মিলিত হবে। আর বিচার-ফয়সালার পর জান্নাত বা জাহান্নামে যাবে। অবশ্য হিন্দুদের পুনর্জন্মলাভের উপরক্ত ধারণার সাথে অনেক হিন্দুপণ্ডিত এখন আর একমত পোষণ করেন না।

হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসীদের আরো ধারণা হল এক স্রষ্টা ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হয়। বিশ্বস্রষ্টা 'ব্রহ্ম', ধ্বংসকারী 'সীতা' এবং সংরক্ষণকারী হল 'বিষ্ণু'। তারা মনে করে, রামের স্মরণে তাদের পাপ মোচন হয়। এ কারণে বিপদাপদে তারা 'রাম রাম' জপমালা জপে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী 'গরু' পবিত্র। তাই তারা গো-ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে। তাদের যুক্তি হল জন্মদাত্রী মা এক বছর বা দু'বছর দুধ দেয়। আর গো-মাতা যতদিন জীবিত থাকে ততদিন দুধ দেয়। জন্মদাত্রী মায়ের মৃত্যু হলে অর্থ ব্যয় করে শেষকৃত্য করতে হয় আর গো-মাতার মৃত্যু হলেও চামড়া ও হাড় দিয়ে অর্থ উপার্জন করা যায়। তাই তারা গো-মাতাকে খুবই ভক্তি করে। তারা যে-কোন শক্তিধর জিনিসকে পূজনীয় মনে করে। এ কারণে তারা তুলসী গাছকেও পূজা করে।

www.pathagar.com

হিন্দুরা অনেক দেব-দেবীর পূজা করে। তারা নিজেরাই দেব-দেবী বানায় আবার তাদেরকেই বিভিন্ন নামে ডাকে ও তাদের পূজা করে। এভাবে দেব-দেবীর পূজা শুধু বর্তমান সময়ে নয় আল্লাহর রাসূলের সময় ও তার আগেকার নবী-রাসূলদের সময়ও ছিল। যেমন হযরত নূহ (আ)-এর সময়ও দেব-দেবীর উপাসনার নজির রয়েছে। হযরত নূহ (আ)-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করে তারা দেব-দেবীর পূজা করত। এমনকি দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য তারা সহ্য করত না। এ দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেন, "তারা বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ কর না এবং ত্যাগ কর না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।" (নূহ ঃ ২৩)

ইমাম বাগভী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন, এরা পাঁচজন খুব নেককার বান্দা ছিল। তাঁরা হযরত আদম ও নূহ আ-এর মধ্যবর্তী সময়ে ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর অনেকদিন তাঁদের ভক্তরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করত। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর শয়তান এসে বলল, তোমরা যাদেরকে অনুসরণ করো, যদি তাদের মূর্তি বানিয়ে উপাসনালয়ে রাখ তাহলে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে। এ কথা বলার পর মূর্তি বানানো সম্পন্ন হয় এবং তাদের প্রতিকৃতি উপাসনালয়ে টাঙিয়ে উপাসনা শুরু হয়। আর এভাবেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়।

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সময়েও মূর্তি পূজা ব্যাপকতা লাভ করে। এ কারণে হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁর দোয়ায় মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন, "যখন ইব্রাহীম বললেন, হে পালনকর্তা! এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে এবং আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।" (ইব্রাহীম ঃ ৩৫)

হযরত ইব্রাহীম (আ) মূর্তিপূজারী পিতাকে লক্ষ্য করে কি বলেছিলেন, তা আল্লাহ কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য ভ্রষ্ট।" (আনআম ঃ ৭৪) একজন মানষের কেন মূর্তিপূজা করা উচিত নয় তার কথা কুরআনে এভাবে উল্লেখ আছে, "আপনি বলে দিন, আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে আহ্বান করব যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না।" (আনআম ঃ ৭১)

হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর প্রতিমাপূজারী পিতার আরেকটি কথোপকথন। আল্লাহ কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন, "যখন তিনি (ইব্রাহীম) তার

www.pathagar.com

পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কর কেন? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান আছে, যা তোমার কাছে আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরলপথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত কর না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করি দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। পিতা বললেন, হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। ইব্‌রাহীম বললেন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদেরকে। আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব। আশা করি আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সউচ্চ সুখ্যাতি।" (মারইয়াম ঃ ৪২-৫০)

এবার একটু লক্ষ্য করুন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) কিভাবে তার পিতাকে দরদভরা মনে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় মূর্তিপূজা না করার আহ্বান জানালেন। আর তার জবাবে তার পিতা প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক কথা বললেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দিলেন। এরপরও ইব্‌রাহীম (আ) ক্ষেপে গেলেন না, ভীরু হলেন না। তিনি আবার শান্ত কণ্ঠে মূর্তিপূজা না করার দাওয়াত দিলেন। যখন তাঁর পিতা তাঁকে চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন তবু তিনি মূর্তিপূজা গ্রহণ করলেন না। সে সময় তিনি পিতার মহব্বতে আদর্শচ্যুত হননি। পিতাকে ত্যাগ করলেন। আর আল্লাহ্ এর জন্য কী চমৎকার পুরস্কার দিয়ে দিলেন।

হযরত ইব্‌রাহীম ও মূতিপূজারী তাঁর পিতার কথোপকথন থেকে আমাদেরকেও শিক্ষা নিতে হবে, আজকে যারা মূতিপূজা করছে তাদেরকে দরদভরা কণ্ঠে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে। আর কোন অবস্থাতেই তাদের প্রতিমাকে গালাগালি করা যাবে না। আল্লাহ্ কুরআনে স্পষ্টভাষায় অন্যদের দেব-দেবীকে গাল-মন্দ করতে নিষেধ করেছেন। আক্রমণাত্মক কিংবা মন্দভাষা প্রয়োগের পরিবর্তে মিষ্টভাষায় দীনের দাওয়াত অন্যদের কাছে তুলে ধরা দীনে হকের অনুসারীদের কর্তব্য।

www.pathagar.com

বর্তমানে যারা প্রতিমাপূজা করছে, তারা আমাদের সাথে একই সমাজে বসবাস করছে। কিন্তু তারা জানে না এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে আখিরাতে তাদেরকে কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে মারাত্মক গলদ রয়েছে। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে তারা আল্লাহর সাথে অন্য দেব-দেবীকে উপাসনায় অংশীদার বানাচ্ছে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করাকে তিনি পছন্দ করেন না। এ কারণে তিনি তাঁর রাসূলকেও লক্ষ্য করে বলেছেন, "আপনি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন।" (শু'আরা ঃ ২১৩)

আল্লাহর রাসূল হলেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তিনি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার প্রশ্নই উঠে না। তবু রাসূলকে সম্বোধন করে আল্লাহর এ কথা বলার অর্থ হল, আল্লাহর রাসূল প্রিয় বন্ধু হবার পরও আল্লাহর সাথে অন্যকে উপাসনায় শরীক করলে আযাব থেকে রক্ষা পাবেন না। তাহলে সাধারণ মানুষ যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে উপাসনায় শরীক করে তারা কিভাবে পরিত্রাণের আশা করে?

ভ্রান্ত জীবন-দর্শন বা মতবাদের অনুসরণ

একজন ব্যক্তিকে আখিরাতে নাজাত পেতে হলে সব ধরনের ভ্রান্ত চিন্তা ও দর্শন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এ ভ্রান্ত দর্শন ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হতে পারে। আকীদাগত হতে পারে কিংবা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে হতে পারে। ইসলাম একজন মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পূত-পবিত্র জীবন-দর্শনের অনুসারী করতে চায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করার জন্য আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাই সেই আদর্শের অনুবর্তী হওয়া ছাড়া আখিরাতে নাজাত আশা করা যায় না।

বর্তমানে আমরা কিছু মতবাদ বা জীবন-দর্শনের সাথে পরিচিত। এ মতবাদ বা জীবন-দর্শন অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক হওয়ায় এর সাথে মানব জীবনের অনেকগুলো দিক ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অন্য ধর্মাবলম্বীরা এসব মতবাদকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করছে। কারণ তাদের বিকৃত ধর্ম-দর্শনে এ সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ নেই। এ কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীরা এসব মতবাদের শুধু অনুসরণই করছে না, কোন কোন ক্ষেত্রে তারাই এসব ভ্রান্ত মতবাদের ধারক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

যারা ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত দীন হিসেবে বিশ্বাস করছেন, তাদের কারো কারো মধ্যেও চিন্তা ও দর্শনের বিভ্রান্তি রয়েছে। যেমন কেউ কেউ

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী হয়েও ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। কেউ কেউ ব্যক্তিজীবনে নামায-রোযা পালন করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দর্শনে বিশ্বাসী। একজন মুসলমান ব্যক্তিজীবনে ইসলাম তথা আল্লাহর দীন অনুসরণ করে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে মানব রচিত অন্য দর্শনের অনুসরণ করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্ এ ক্ষেত্রে কোন বিধান প্রদান করেননি। অথবা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের চেয়ে মানব রচিত বিধান উত্তম। যদি বলা হয়, আল্লাহ্ এ ক্ষেত্রে কোন বিধান প্রদান করেননি তাহলে বুঝতে হবে তিনি হয়ত আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানেন না। অথবা জেনেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা কথা বলছেন। আর যদি বলা হয়, তাঁর কাছে আল্লাহর বিধানের চেয়ে মানব রচিত বিধান উত্তম মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ঈমানেই ত্রুটি আছে। আর ত্রুটিপূর্ণ ঈমান বা গলদ বিশ্বাস নিয়ে আখিরাতে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়।

এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার এসব দর্শন অনুসরণ করে কেন আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে না?

আলোচনার শুরুতেই পুঁজিবাদী দর্শন নিয়ে আলোচনা করা যাক। পুঁজিবাদ কেন ইসলাম সমর্থন করে না? কেন এ দর্শন একজন মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না?

পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে জন্ম নেয়। এ দর্শনের মূল কথাই হল পুঁজি সঞ্চয় করা। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্পদের একচ্ছত্র মালিক। উপার্জিত সম্পদে অন্য কারো অংশ নেই। সম্পদ আয় বা ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈধতা বা অবৈধতার কোন সীমারেখা নেই। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা সম্পদ আয়ত্ত করতে পারবে এবং যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা রয়েছে।

পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি হল সুদ। অথচ আল্লাহ্ সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ কুরআনে ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।" (বাকারা ঃ ২৭৬)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, সুদ নেওয়া বা দেওয়া পাপ। আল্লাহ্ তাআলা সুদী কারবার ত্যাগ করার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।" (বাকারা ঃ ২৭৭-২৭৮)

www.pathagar.com

এ আয়াতে সুদের কারবারকে আল্লাহ্ কঠোর ভাষায় পরিত্যাগ করতে বলেছেন। এমন কি সুদ ত্যাগ না করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর বলে উল্লেখ করেছেন। সুদ যারা খায় তাদের আখিরাতের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদের মতই।" (বাকারা ঃ ২৭৫)

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। যারা সুদী কারবার করে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে তা ত্যাগ করার কথা বলার পরও যারা ত্যাগ করছে না তারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র বিরোধিতা করছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম চালু নেই, সেসব দেশের মুসলমানরা কিভাবে ব্যাংকিং লেনদেন করবে? এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের অভিমত হল সেসব দেশের মুসলমানরা ব্যাংকের সাথে ততটুকু লেনদেন করবে যতটুকু না করলেই নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত লেনদেন করা যাবে না। আর এ ধরনের লেনদেনের মাধ্যমে যেসব মুনাফা হয় তা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সমাজকল্যাণমূলক কোন কাজে ব্যয় করে দিতে হবে। তার পাশাপাশি মুসলমানদেরকে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে হবে। এছাড়া নিজেরাই কোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুদমুক্ত লেনদেনের ব্যবস্থা করতে পারে।

আখিরাতের শাস্তি ছাড়াও সুদের সামাজিক অনেক কুফল আছে। সুদের কারণে মানুষের মনে স্বার্থপরতা সৃষ্টি হয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয় এবং সমাজে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোক কালো টাকার বদৌলতে প্রচুর অর্থের মালিক হয় আর সমাজের বিরাট অংশ অতি দুঃখে-কষ্টে দিন কাটায়। কারণ পুঁজিবাদী দর্শনে সম্পদ আহরণের জন্য গুদামজাতকরণ, ঠকানো, প্রতারণা কোন অপরাধ নয়। অথচ ইসলাম এগুলো কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। তবে তা অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়। ইসলাম ঘোষণা করেছে, একজন মানুষের সম্পদে অভাবগ্রস্তদের হক রয়েছে। এ কারণে ইসলাম যাকাত ফরয করেছে ও দান-সদকার প্রতি উৎসাহিত করেছে। পুঁজিবাদী দর্শনে অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন গর্হিত নয়। কিন্তু ইসলামে সম্পদ আয়ের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ সীমারেখা আছে। ইসলামে বৈধভাবে আয় করার পর ব্যয়ও বৈধভাবে করতে হবে। একজন মানুষের সম্পদ আছে বলেই পাপ কাজে সম্পদ ব্যয় কিংবা অপচয় করতে পারবে না। আল্লাহ্ বলেন, "অপব্যয় কর না। অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার মনিবের চরম অকৃতজ্ঞ।" (বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭)

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পদ অপব্যয়ের পরিবর্তে গরীব মানুষের প্রয়োজনে ব্যয় করতে বলেছে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুমিন নয়, যে পেট ভর্তি করে খায় আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।" ইসলাম এখানে 'প্রতিবেশী' শব্দ উল্লেখ করেছে। কারো প্রতিবেশী অমুসলিম হলেও তার মানবিক প্রয়োজন পূরণ করা একজন সচ্ছল মুসলমানের কর্তব্য।

পুঁজিবাদীরা প্রবৃত্তিপূজা ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত। তাদের পাশে কেউ অভাব অনটনে কষ্ট পেলেও তারা বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ি নিয়ে আমোদ-ফুর্তিতে লিপ্ত থাকে। ইসলাম মনে করে, কোন সমস্যাগ্রস্ত বা অভাবগ্রস্তের সমস্যা সমাধানে যদি সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা হয় তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কঠিন সময়ে তার সমস্যা সমাধান করবেন। এভাবে ইসলাম অর্থকে সমাজের প্রয়োজনে খরচ করতে উৎসাহিত করেছে। ইসলাম সম্পদের আসক্তি ও সম্পদ নিয়ে গর্ব অহংকারকে নিন্দা করেছে। আল্লাহ বলেন, "এমন বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যার অধিবাসীরা নিজেদের জীবিকার গর্বে অহংকারী হয়ে পড়েছিল। এখন দেখ, তাদের বসতবাড়িগুলো বিরান হয়ে পড়ে আছে। তাদের পর খুব কম লোকই সেখানে বসবাস করছে। শেষ পর্যন্ত আমিই তাদের উত্তরাধিকার হয়েছি।" (কাসাস ঃ ৫৮)

এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুঁজিবাদী দর্শনের সাথে ইসলামের বিরাট ফারাক। ইসলাম পুঁজিবাদী দর্শনকে স্বীকার করে না। তাই একজন মানুষ পুঁজিবাদী দর্শনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে পারে না। আর আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যার পক্ষে সম্ভব হবে না তার পরিণাম যে জাহান্নাম তাতো সুনিশ্চিত।

সমাজতন্ত্র

পুঁজিবাদী দর্শনের ঠিক বিপরীত হল সমাজতান্ত্রিক দর্শন। সমাজতন্ত্র অর্থ-সম্পদ আয় উপার্জনের অধিকার ব্যক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জাতীয় মালিকানায় অর্পণ করেছে আর ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী দেওয়ার দায়িত্ব সমাজ সংগঠনের উপর অর্পণ করেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের মুখরোচক শ্লোগান দিয়ে সমাজতন্ত্রীরা মানব প্রকৃতির সাথে সুবিচার করেনি। মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী আয় উপার্জনের অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে মুনাফায় ব্যক্তির অংশ দিতে অস্বীকার করায় মানুষের মধ্যে কর্মস্পৃহা লোপ পায়। যার ফলে সমাজতন্ত্র অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তার আবেদন হারিয়ে ফেলে।

www.pathagar.com

সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দর্শন নিয়ে সমাজতন্ত্র জন্ম নেওয়ার কারণে সুকৌশলে তারা অনেক মুসলমানকে এই বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে যে, ইসলাম সামাজিক সুবিচার চায় আর সমাজতন্ত্র সামাজিক সাম্য চায়। তাই ইসলামের স্যাথে সমাজতন্ত্রের কোন বিরোধ নাই। আমরা মূলত ইসলামী সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। প্রফেসর খুরশীদ আহমদ তাঁর 'সমাজতন্ত্র না ইসলাম' বইতে লিখেন, "এ পরিভাষাটি অত্যন্ত প্রতারণামূলক। যেসব কমিউনিস্টরা মনে করে যে, সমাজতন্ত্রের বইটি মুসলমানদেরকে গেলাতে হলে এ ধরনের প্রতারণার বেসাতী ছাড়া উপায় নেই, তারাই মূলত এ ধরনের কথা বলছে। আর এর মাধ্যমে ধর্ম সম্পর্কে যাদের জ্ঞান সীমিত, কিংবা যারা না ইসলামকে অধ্যয়ন করছে, না সমাজতন্ত্রকে, তারা বিভ্রান্ত হল।"[৫৩]

মূলত ইসলাম সমাজতন্ত্রকে স্বীকার করে না। কেননা সমাজতন্ত্র বস্তুবাদী ও জড়বাদী দর্শনের ভিত্তিতে রচিত। তার সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামের দর্শনগত কোন মিল নেই। সমাজতন্ত্রীরা আল্লাহ্র সত্তাকে অস্বীকার করে। এমনকি তারা ধর্মকে আফিম মনে করে। অপরদিকে ইসলাম আল্লাহ্র একত্ববাদের উপর ভিত্তি করে মানব জীবনের সকল কিছুর ভিত রচনা করতে চায়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামের টার্গেট। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির কোন মালিকানা স্বীকৃত নয় বলে তারা ব্যক্তিকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করে। আর ইসলাম ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে ব্যক্তির সম্পদে সমাজ বা রাষ্ট্রের অধিকার সংরক্ষণ করেছে।

সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক দর্শন হল রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তন করতে হবে আর ইসলাম মানুষের চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন বা বিপ্লব সাধন করতে চায়।

এভাবে বিচার করলে দেখা যায়, সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে সাংঘাতিক বিরোধ রয়েছে। তাই একজন ব্যক্তি যদি আখিরাতে নাজাত পেতে চায়, তাহলে তাকে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামকেই অনুসরণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ্র বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানের ভিত্তিতে মানুষের নিজের জীবন পরিচালনার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তাদের জীবনব্যাপী কাজ-কর্ম ও চেষ্টা সাধনা চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। মারাত্মক ভ্রান্ত পথে চলাই তাদের কাজ। অথচ তারা খুব ভাল কাজ করছে বলে মনে মনে ধারণা করে, তাদের কথাই বলছি। এরা তারাই, যারা সৃষ্টিকর্তার বিধান এবং তাঁর পরকালীন সাক্ষাৎ-সম্ভাবনাকে অমান্য ও অস্বীকার করেছে এবং কেবল এ জন্যই তাদের কাজ-কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমরা তাদের কাজের কোন মূল্যই দিব না।" (কাহাফ ঃ ১০৩- ১০৫)

www.pathagar.com

এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত যে, মানব রচিত মতবাদ বাহ্যত যত সুন্দর ও চমকপ্রদই হোক না কেন তার ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করলে আখিরাতে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

বর্তমানে যেসব মতবাদ বা দর্শন পৃথিবীতে অধিক পরিচিত তার মধ্যে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অন্যতম। ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যেসব ফন্দি-ফিকির করছে তার ফসল হল সেক্যুলারিজম। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে যেমনি লিপ্ত রয়েছে ঠিক তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক তথা স্নায়ুযুদ্ধেও লিপ্ত। মুসলমানদের ঈমান আকীদা নষ্ট করার জন্য চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে তারা নানা দর্শন পেশ করছে। যার সাথে মুসলমানদের সম্পৃক্ত থাকার প্রশ্নই উঠে না।

ধর্মনিরপেক্ষতা এমন একটি মতবাদ যা অমুসলিমদের সৃষ্ট হলেও অনেক মুসলিম দেশে তার সক্রিয় চর্চা রয়েছে। অনেক সাধারণ মুসলমান এ মতবাদ কি তা জানে না বলে এ মতবাদকে সমর্থন দিচ্ছে। তাই সংক্ষেপে এ মতবাদের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হল, ইংরেজি Secularism-এর বাংলা অনুবাদ। ফরাসি ভাষায় বলা হয় Sucularite যার মূল শব্দ হল Secular। এর অর্থ "**Oxford Advanced Learner's Dictionary**"তে লিখা হয়েছে, "not concerned with spiritual or religious affairs; Secularism: the belief that laws, education, etc should be based on facts, science etc rather than religion".

সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা Encyclopedia America-তে এভাবে উল্লেখ আছে, An etical system-founded on the principles of natural morality and independent of revealed religion or supernaturalism. "সেক্যুলারিজম এমন একটি নৈতিক ব্যবস্থা যা প্রাকৃতিক নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা সর্বপ্রকার প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম বা অতিপ্রাকৃতিক কোন ধারণা হতে মুক্ত।" এভাবে পাশ্চাত্যের লেখকের লিখা অভিধান ও অনেক বইতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় রচিত 'আলমাওসুয়াতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব আল মুয়াসেরা' গ্রন্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে, "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হল দীন বিবর্জিত জীবন ধারা প্রতিষ্ঠার আহ্বান।" আল্লামা মান্না খালিল কাত্তান লিখেন, "সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন

www.pathagar.com

ক্ষেত্র থেকে দীনকে পৃথকীকরণের নাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ"। বাংলা ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক লেখক লিখেন, "ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে নিরপেক্ষ শব্দ বিদ্যমান। 'যার কোন পক্ষ নাই' তাকেই নিরপেক্ষ বলা হয়। যদি এ নিরপেক্ষ শব্দটির পূর্বে ধর্ম যুক্ত হয় তাহলে অর্থ হয় 'যার কোন ধর্ম নাই'। তাই একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা।"[৫৪]

অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সেক্যুলারিজম এর ব্যাখ্যায় বলে, religion is the private relation between man and God. তাদের এ ব্যাখ্যা সেক্যুলারিজমের উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে একটু ভিন্ন হলেও এর মাধ্যমে ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হয়। অথচ ইসলাম বলে একজন মানুষকে তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণ করে চলতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাব শুধু আক্ষরিক তিলাওয়াত বা কিতাবে বর্ণিত বিধানাবলি শুধু ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণের জন্য নাযিল করেননি। আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন কুরআনের ভিত্তিতে যাবতীয় বিচার-ফয়সালা করার জন্য। আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে নিজেই বলছেন, "নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন শরীফ পরম সত্যতার সাথে এ জন্যই নাযিল করেছি যে, তুমি তদনুযায়ী মানুষের উপর ঠিক আল্লাহ্ প্রদর্শিত পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচারে ইনসাফ কায়েম করবে। (কুরআনকে যারা এ কাজে ব্যবহার করতে চায় না তারা এ মহান কাজে খেয়ানত করে) তুমি এই খেয়ানতকারীদের সাহায্য ও পক্ষ সমর্থনকারী হয়ো না।" (নিসা ঃ ১০৫) সমাজ জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের মন মত কোন কিছু করার এখতিয়ার আল্লাহ্ কাউকে প্রদান করেননি। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী মানুষের উপর হুকুমাত কায়েম কর। তাদের মনের খেয়াল খুশি ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ কর না।" (মায়েদাহ ঃ ৪৮)

আল্লাহ্ কুরআনের অনেক জায়গায় ইরশাদ করেছেন, যারা আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুসারে বিচার-ফয়সালা করে না, তারা জালেম-কাফির-ফাসিক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালনের কথা বললেও সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার কারণেই ইসলামের সাথে তাদের বিরোধ।

সেক্যুলারিজমের এ ভাবধারা অনেক পুরাতন হলেও একটি মতবাদ হিসেবে মধ্যযুগের শেষ দিকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে এর উন্মেষ ঘটে। ইউরোপে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পায় তখন পাদ্রিদের মনগড়া মতবাদের সাথে বিজ্ঞানীদের টক্কর লাগে। সে সময় পাদ্রিরা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য

www.pathagar.com

ধর্মকে ব্যবহার করে। আর বিজ্ঞানীরা যুক্তি দিয়ে পাদ্রি দের মনগড়া কথার খণ্ডন করতে থাকে। ফলে পাদ্রিরা ক্ষেপে যায়। এ কারণে গ্যালিলিওর মত নামকরা বিজ্ঞানীদেরকে চরম দণ্ড ভোগ করতে হয়। ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। পাদ্রিরা ধর্মের নামে তাদের অপকর্ম ঢাকবার চেষ্টা করার কারণে এক পর্যায়ে ধর্মের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত 'গীর্জা বনাম পাদ্রি' বিরোধ চলে। অতঃপর মার্টিন লুথার আপস প্রচেষ্টা চালান। তার আপস প্রস্তাবের মূলকথা ছিল, "ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থাকবে পাদ্রিদের হাতে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষেত্রে ধর্ম বা পাদ্রিদের কোন ভূমিকা থাকবে না। রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। তবে তারা চার্চে শপথ নেবেন। কিন্তু চার্চ রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন কর্তৃত্ব করবে না।"[৫৫] এভাবেই রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা হয়ে যায়।

সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার ক্ষেত্রে মূলত ভূমিকা পালন করে নাস্তিকতাবাদী শক্তিগুলো। তারা এ আন্দোলনের শুরুতে আল্লাহর অস্তিত্বের বিরুদ্ধেও বক্তব্য দিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলো, সাধারণ মানুষ তাদের নাস্তিকতাবাদী দর্শনকে গ্রহণ করছে না, সেই সময় তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে বলে, "ধর্মের সাথে আমাদের কোন লড়াই নেই। আমাদের লড়াই হল চার্চের অনাচারের বিরুদ্ধে।" আর চার্চের অনাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষেরা পর্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল।

ইসলামের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংঘাত কখনও সৃষ্টি হয়নি। কারণ ইসলাম জ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে। আর খ্রিস্টান পাদ্রিরা যেভাবে চার্চকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে শোষণ করেছে, ইসলাম তা সমর্থন করে না। ইসলাম কোন প্রকারের যুলুম বা অন্যায় সমর্থন করে না। অন্যায় কে করছে ইসলামের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কি অন্যায় করছে তার আলোকে ইসলাম শাস্তি বিধান করে। তাই ইসলামে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের মত ধর্মের অপব্যাখ্যার সুযোগ নেই। আফসোসের বিষয়, তারপরও মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা আজ প্রচারিত হল। আর তা যারা প্রচার করছে তাদের মধ্যে একশ্রেণীর মুসলিমও রয়েছে। যারা হয়ত ইসলাম সম্পর্কে জানে না এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আসল রূপ তাদের জানা নেই। এই না জানার কারণেই তারা আজ বিভ্রান্ত। অথবা তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ ভ্রান্ত দর্শন প্রচার করছে। অথচ ইসলাম এ দর্শনকে আদৌ স্বীকার করে না। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা জীবনের বিভাজনে বিশ্বাসী আর জীবনের এককেন্দ্রিকতায় বিশ্বাসী। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষের বৈষয়িক জীবন ও ধর্মীয় জীবনের পৃথক অস্তিত্ব নেই। ইসলাম মনে করে বৈষয়িক জীবনও ধর্মের আলোকে পরিচালিত হতে হবে। কারণ আল্লাহ

www.pathagar.com

আমাদেরকে যে বিধান দিয়েছেন তা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্যই দিয়েছেন। আমাদেরকে আখিরাতে কল্যাণ পেতে হলে দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহর বিধান মতই পরিচালনা করতে হবে। আর দুনিয়ার জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে আল্লাহর বিধান নেই। কারণ আল্লাহ্ যে বিধান আমাদেরকে দিয়েছেন তা হল পূর্ণাঙ্গ দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এ কথা আল্লাহ্ কুরআনে নিজেই ঘোষণা করেছেন, "আজ আমি তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (মায়েদা ঃ ২-৩)

আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দীনকেই বিজয়ী আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা এ কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন, "আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এটাকে অন্যান্য মতাদর্শের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তা মুশরিকদের নিকট পছন্দনীয় নয়।" (ছফ ঃ ৯, তওবা ঃ ৩৩)

সেক্যুলারিজমের তত্ত্ব অনুযায়ী ধর্ম যদি ব্যক্তিগত ব্যাপার হয় তাহলে কুরআনের অনেক বিধান অকার্যকর হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক অনেক নীতির কথা কুরআনে ইরশাদ করেছেন। যদি ধর্মকে শুধু ব্যক্তিজীবনে অনুসরণ করার কথা বলা হয় তাহলে কুরআনের সেসব আয়াতের অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যার ফলে কুরআনের আংশিক অনুসরণ হয়। অথচ আল্লাহ্ কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে যেসব বিধি-নিষেধ নাযিল করেছেন তা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ না করলে আখিরাতে শাস্তিদানের কথা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করবে আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করবে? তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এমন করে তাহলে এ দুনিয়ায় তাকে অপমানিত করা হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে কঠোর আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।" (বাকারা ঃ ৮৫)

এভাবে আমরা যদি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংঘাত প্রতিটি ক্ষেত্রেই। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে পরিহার করা উচিত।

www.pathagar.com

ভ্রান্ত আকীদার অনুসরণ

আল্লাহ্ তাআলা ধর্মীয় দর্শন বা জীবন-দর্শনের মত আকীদাগত দর্শনের ক্রটি পছন্দ করেন না। এ ক্রটি যাদের কাছ্ থেকেই প্রকাশিত হবে আল্লাহ্ তাদেরকে সাজা দেবেন। শুধু ধর্ম বিশ্বাসের কারণে যেমন অন্য ধর্মাবলম্বীরা পার পাবে না এবং তাদের গলদ বিশ্বাসের কারণে আখিরাতে শাস্তি পাবে। তেমনিভাবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের উপর মৌখিক ঈমান এনেও কারো বিশ্বাসে গলদ থাকলে সে প্রকারান্তরে ঈমানদার হবে না। তাকে গলদ বিশ্বাসের কারণে সাজা পেতে হবে। যেমন কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

কাদিয়ানী মতবাদ

কাদিয়ানী মতবাদের প্রবক্তারা আল্লাহ্র রাসূলকে স্বীকার করে, কিন্তু আখেরী নবী হিসেবে স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহ্র রাসূলকে খাতামুন্নাবীয়্যীন (সব নবীদের শেষ নবী) হিসেবে স্বীকার করা প্রত্যেকের উপর ফরয। যেহেতু কাদিয়ানীরা আল্লাহ্র রাসূলকে আখেরী নবী হিসেবে মানে না, তাই তারা কাফির। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকলেই একমত। বিশ্বের কয়েকটি মুসলিম দেশে তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফির ঘোষণা করা হয়েছে।

তারা মুসলিম নাম ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাদের পরিচালিত 'আহমদিয়া জামাআত' ইহুদী-খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বব্যাপী তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করছে। মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। তাদের বই-পুস্তক বর্জন করতে হবে। যেসব মুসলিম দেশে তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে এখনও কাফির ঘোষণা দেওয়া হয়নি, সেসব মুসলিম দেশের জনগণকে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

এভাবে যারাই ভ্রান্ত আকীদার অনুসরণ করবে তাদের প্রত্যেকের আবাস হবে জাহান্নাম।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

আরো যেসব কারণে মানুষ দোযখে যেতে পারে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসের পবিত্রতার সাথে সাথে কর্মের পবিত্রতা চান। কাফির মুশরিক ও মুনাফিকসহ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হলেও অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী, আল্লাহ্ তাদেরকে বিশ্বাসহীনতা বা গলদ বিশ্বাসের কারণে শাস্তি দিবেন। আর যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হয়েও কর্মে বিশ্বাসের প্রতিফলন নেই তাদের অনেককেও সাজা ভোগ করতে হবে। তবে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের নিখুঁত বিশ্বাসের কারণে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফও করতে পারেন। আবার তাদের কর্মে বিশ্বাসের প্রতিফলন না থাকার কারণে সাজাও দিতে পারেন। কিন্তু তাদেরকে সবসময় সাজা ভোগ করতে হবে না। যেমনটি কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, মুরতাদ ও ভ্রান্ত আকীদার অনুসারীদেরকে ভোগ করতে হবে।

খারেজী সম্প্রদায়সহ যারা মনে করে, ঈমানদার ব্যক্তি কোন গুনাহ্ করলে তাকেও চিরদিন দোযখে জ্বলতে হবে, এ আকীদা ঠিক নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, কবীরা গুনাহ্কারীকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে বিচার-ফয়সালার সময়ই মাফ করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে পাপ অনুযায়ী কিছুদিন শাস্তিও দিতে পারেন। তারপর তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশে একদিন না একদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

এখন আলোচনা করা দরকার, কি কি কারণে একজন ঈমানদার জাহান্নামে যেতে পারে? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হল, যারা হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) নষ্ট করে ও হক্কুল্লাহ (আল্লাহ্‌র হক) ঠিকমত পালন করে না, তাদের জন্য কুরআন ও হাদীসে দোযখের শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। এককথায়, কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলে (তওবা করে আল্লাহ্‌র ক্ষমা অর্জন করতে না পারলে) দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কবীরা গুনাহ্ কি

এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আরোপিত ফরয কাজ না করা এবং হারাম (নিষিদ্ধ) কাজ থেকে বিরত না থাকাই কবীরা গুনাহ। এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীসে যেসব নির্দেশ এসেছে তা কখনও ফরয আবার কখনও ওয়াজিব, কখনও মুস্তাহাব আবার কখনও মুবাহ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে উলামায়ে কেরাম মনে করেন। তাই যেসব নির্দেশ পালন করা ফরয বা ওয়াজিব তা লঙ্ঘন করাই কবীরা গুনাহ। আর এধরনের ফরযকে যদি ফরয হিসেবে মেনে

www.pathagar.com

নিতে অস্বীকার করা হয় তাহলে শুধু কবীরা গুনাহই হবে না, বরং কুফরী হয়ে যাবে।

যেসব কারণে একজন ঈমানদার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার পরও দোযখে যেতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ ঃ

হক্কুল্লাহ্ তথা আল্লাহর হক আদায় না করা

আল্লাহর যে বান্দা আল্লাহকে ইলাহ্ হিসেবে স্বীকার করে তাকে তো এ বিশ্বাসের প্রতিফলন তার কর্মের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটলেই বুঝা যাবে যে, তিনি তাঁর বিশ্বাসে খাঁটি। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ঘাটতি নেই। আল্লাহর যে বান্দা আল্লাহকে ইলাহ্ ও রব হিসেবে স্বীকার করার পরও কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আখিরাতে তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। কারণ, একজন ঈমানদার আর একজন কাফিরের মধ্যে আল্লাহ্ শুধু বিশ্বাসের পার্থক্য নয়; কর্মের পার্থক্যও সৃষ্টি করতে চান। এ কারণেই আল্লাহ্ কুরআনে ঈমানের সাথে সাথে আমলের কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ কুরআনে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তার অনেকগুলো সরাসরি তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত। একজন ঈমানদার যদি এসব নির্দেশ পালন না করে তাহলে বুঝা যায়, সে ঈমানের দাবিদার হলেও আল্লাহর নির্দেশ পালনের প্রতি উদাসীন। এ কারণে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন। আল্লাহর নির্দেশ পালনে উদাসীনতা অনেকভাবে হতে পারে।

নামায তরক করা বা নামাযে শিথিলতা প্রদর্শন করা

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের অনেক জায়গায় ইরশাদ করেছেন, 'আকীমুসসালাত' অর্থাৎ, তোমরা নামায কায়েম কর। এ কারণে একজন ঈমানদারকে নামায আদায়ের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয় তিনি দুনিয়ার কোন শক্তির কাছে নয়, শুধু আল্লাহর কাছেই মাথানত করতে প্রস্তুত। সকল ঈমানদার নামায আদায়ের সময় সেজদায় গিয়ে এ কথার প্রমাণ দেন, ব্যক্তি হিসেবে দুনিয়াতে যত উঁচু পজিশনে থাকুন না কেন আল্লাহর সামনে খুবই নীচ ও হীন। যারা আল্লাহকে সেজদা করতে প্রস্তুত নয়, তারা মূলত শয়তানেরই অনুসরণ করে। এ কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোর সাজা দিবেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে।" আরেক হাদীসে আছে, "মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ করা।" ফরয নামায

www.pathagar.com

না পড়া মারাত্মক গুনাহ্। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল, যারা পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং অচিরেই তারা পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।" (মারইয়াম ঃ ৫৯)

মুফতী শফী (র) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নামায নষ্ট করার কথা বলেছেন। এর তাফসীর প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, মুজাহিদ, নখয়ী প্রমুখ বলেন, নামায নষ্ট করা দ্বারা অসময়ে নামায পড়া বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে, নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা নামায নষ্ট করার শামিল। আবার কারো মতে, নামায নষ্ট করা বলতে জামাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বুঝানো হয়েছে।

উল্লিখিত তাফসীর থেকে এ কথা মনে বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, নামায তরক করাতো দূরের কথা নামায ঠিকমত আদায় না করাও গোনাহ্। কিন্তু আমাদের সমাজে এমন অনেকেই আছেন যারা নামায অহরহ্ তরক করেন। আবার কেউ কেউ আছেন, যারা নামায পড়েন তবে, ঠিকমত নামাযের আরকান আদায় করেন না।

একটু চিন্তা করলে কয়েক শ্রেণীর লোকের ছবি আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে ঃ

১. যারা নামায ফরয বলে বিশ্বাসই করে না।

২. যারা নামায ফরয বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু নামায পড়ে না।

৩. যারা নামায পড়ে; কিন্তু সকল ওয়াক্তের নামায পড়ে না। এমন অনেক মুসলমান আছে, যারা শুধু ঈদের নামায কিংবা জুমআর নামায পড়ে। আর কখনও যদি এমন কোন পরিবেশে যায়-যেখানে নামায না পড়ে উপায় নেই, তখন নামায পড়ে।

৪. এমনও লোক আছে যারা লোক দেখানো নামায পড়ে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে ইরশাদ করেন, "অতএব দুর্ভোগ সে সব নামাযীর, যারা লোক দেখানোর জন্য নামায় আদায় করে।" (মাঊন ৪-৫)

   তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এটা মুনাফিকদের অভ্যাস। নামায যে ফরয এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে নামাযের সময়ের প্রতিও তারা লক্ষ্য রাখে না। নামায সম্পর্কে তারা বেখেয়াল থাকে। লোক দেখানোর জন্য তারা কখনও কখনও নামায পড়ে। নতুবা নামায পড়া ছেড়ে দেয়।

৫. যারা নামায পড়েন, কিন্তু ঠিক মত আদায় করেন না, কাযা করেন। যারা নামায কাযা করে আল্লাহ্ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

www.pathagar.com

৬. নামায পড়েন সত্য, নামাযের আরকান তথা রুকূ-সিজদা ঠিকমত আদায় করেন না। হযরত আবূ মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির নামায হয় না যে ঠিকমত ইকামাত করে না।" অর্থাৎ যার রুকূ-সিজদা ঠিকমত আদায় হয় না। (তিরমিযী)

হযরত হুযায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, নামাযের রুকন ঠিকমত আদায় করছে না। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কতদিন থেকে এভাবে নামায পড়। সে ব্যক্তি জবাব দিল, চল্লিশ বছর যাবত। হুযায়ফা (রা) এতদশ্রবণে বললেন, তুমি চল্লিশ বছর যাবত কোন নামাযই পড়নি। যদি এভাবে নামায পড়ে তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে। (মাআরেফ আল কুরআন ঃ সূরা মারইয়াম এর তাফসীর)

৭. এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা জামাআতের সাথেই সকল নামায ঠিকমত আদায় করার চেষ্টা করেন। মূলত তাঁরাই হলেন খাঁটি ঈমানদার।

এখন চিন্তা করা দরকার, যারা নামায পড়ে না; তাদের কি পরিণতি হবে? যারা নামায তরক করে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে জাহান্নামে কঠিন সাজা দানের কথা উল্লেখ আছে। সূরা মারইয়ামের ৫৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যারা নামায নষ্ট করবে তারা 'গাই' প্রত্যক্ষ করবে। 'গাই' শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "গাই জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চেয়ে অধিক আযাবের সমাবেশ রয়েছে।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এ থেকে বুঝা গেল, নামায সঠিকভাবে যারা আদায় করে না তাদের কি ভয়াবহ শাস্তি হবে। আর যারা আদৌ নামায আদায় করে না; তাদের নিজেদেরই পরিণতির কথা একটু চিন্তা করা দরকার।

যাকাত আদায় না করা

আল্লাহ দুনিয়াতে সকলকে সমান সম্পদ দিয়ে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সব মানুষের জন্য সমানভাবে সম্পদ দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ বিশেষ কারণে তা করেননি। আল্লাহ দুনিয়াতে কাউকে অধিক সম্পদ দিয়েছেন। আর কাউকে কম সম্পদ দিয়েছেন। যাদেরকে কম সম্পদ দিয়েছেন তারাও আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর সে বান্দার প্রতি আল্লাহর কোন ক্ষোভের কারণে তাদেরকে সম্পদ কম দিয়েছেন, বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ

www.pathagar.com

যাদেরকে সম্পদ বেশি দিয়েছেন তাদের মন মানসিকতা পরীক্ষার জন্যই কিছু সংখ্যক বান্দাকে অর্থনৈতিকভাবে গরীব করেছেন। আর তাদের দরিদ্রতার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ তাদেরকে বিচার-ফয়সালার দিন ধনীদের আগেই জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দিবেন।

আল্লাহ্ যাদেরকে ধন দিয়েছেন তাদের অনেককে জন দেননি। আবার অনেককে জন দিয়েছেন কিন্তু, সে অনুযায়ী ধন দেননি। আল্লাহ্ এভাবে কম ধন দিয়ে ধনশালীদের মনে এ কথা জাগরূক করতে চান যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকেও সম্পদ কম দিতে পারতেন। তাই তার সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করে ভোগ বিলাসে ডুবে থাকার সুযোগ নেই। সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ্ তাআলা। এ কারণে আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে খরচ করতে হবে।

আল্লাহ্র পথে সম্পদ খরচের ক্ষেত্রে প্রথমেই যাকাতের কথা আসে। আল্লাহ্ নামায ফরয করার মত যাকাতকেও ফরয করেছেন। তাই কেউ যাকাত আদায় না করলে তাকে এ কারণে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "সেই সব লোকদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও, যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে খরচ করে না। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে আগুনে দগ্ধ করা হবে (সে দিন বলা হবে) এগুলো তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন জমা করে রাখা সম্পদের স্বাদ আস্বাদন কর।" (তওবা ঃ ৩৪-৩৫)

মুফতী শফী (র) বলেন, "যে অর্থ-সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তাতে যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের রূপ ধারণ করবে।" তিনি আরো বলেন, "এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার কথা উল্লেখ আছে, তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে। কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায় কিংবা যাকাত তলব করে, তখন প্রথমে সে ভ্রুকুঞ্চন করে। তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্য বিশেষ করে এ তিন অঙ্গের আযাব দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।" (মাআরেফ আল কুরআনঃ সূরা আত তওবার তাফসীর)

এভাবে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় যাকাত আদায় না করার শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। এর মাধ্যমে এ কথা ফুটে উঠেছে যে, ধনীদের যাকাত দেওয়ার বিষয়টি গরীবদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ কিংবা অনুকম্পা নয়। ধনীদের বৃহত্তর প্রয়োজনেই গরীবদের যাকাত দিতে হবে।

www.pathagar.com

রমযানের রোযা পালন না করা

নামায ও যাকাতের মত রোযাও একজন ঈমানদারের জন্য ফরয। আল্লাহ তাআলা কুরআনে সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল।" এ আয়াতের আলোকে প্রমাণিত যে, রোযা রাখা ফরযে আইন। কেউ রোযার ফরযিয়াত অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। আর শরীআতসম্মত ওযর ছাড়া রোযা না রাখলে ফাসিক এবং গুনাহগার হবে।

মূলত নামাযের মাধ্যমে মানুষের মনে আল্লাহর নির্দেশ পালনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আর রোযার মাধ্যমে সে প্রেরণা আরো শাণিত হয়। নামায ও রোযা মুসলিম সমাজে একতা ও সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। রোযার মাধ্যমে ধনীরা গরীবদের দুঃখ কষ্ট কিছুটা বুঝার সুযোগ পায়। ফলে তারা যাকাত দিতে আরো বেশি তৎপর হয়। আল্লাহর যেসব বান্দা রোযা রাখে আল্লাহ তাদের প্রতি খুব খুশি হন। এ কারণে রোযাদারের পুরস্কার আল্লাহ নিজেই দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আর যে বান্দা রোযা রাখে না আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

হজ্জ না করা

আল্লাহ তাআলা তাঁর সামর্থ্যবান বান্দার উপর হজ্জ ফরয করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি সামর্থ্য যে রাখে, সে যেন হজ্জ করে। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরের আচরণ করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্বপ্রকৃতির উপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন।" (আলে ইমরান ঃ ৯৭)

এ আয়াতের আলোকে স্পষ্ট যে, সামর্থ্যবানদের উপর হজ্জ ফরয। যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইহুদী ও নাসারার সমতুল্য বলেছেন। হযরত হাসান (র) বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, আমার খুব ইচ্ছা হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সব রাষ্ট্রে কিছু লোক পাঠিয়ে দেব। তারা অনুসন্ধান করে দেখবে যে, কারা হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করছে না। আমি তাদের উপর জিযিয়া কর নির্ধারণ করে দেব।" (আল মুনতাকা) এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, সামর্থ্যবানদের জন্য হজ্জ না করা বড় ধরনের অপরাধ।

www.pathagar.com

হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক নষ্ট করা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বিশ্বাসীর বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য যেসব কর্মের কথা বলেছেন তার অনেকগুলো শুধু আল্লাহর সাথেই সম্পৃক্ত। আর এমন অনেক কাজ আছে যা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেও তা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ, আল্লাহ যেসব বান্দাকে আখিরাতে উঁচু মর্যাদা দিতে চান তারা শুধু আল্লাহর কাছে ভাল হলে চলবে না; তাদের আচার-আচরণ এমন হতে হবে, যেন তারা মানব সমাজেও ভাল বলে বিবেচিত হন। যাদের সাথে তাদের বিশ্বাসের বিরোধ আছে তারাও যেন তাদের আচরণে মুগ্ধ হয়। হয়তবা বিশ্বাসের বিরোধের কারণে তারা তাদেরকে প্রকাশ্যে খারাপ জানবে; কিন্তু তাদের মন যেন নীরব সাক্ষ্য দেয় যে, এ লোকগুলো আসলেই পরোপকারী, এরা কাউকে কষ্ট দেয় না, কোন মানুষের ক্ষতি করে না। তারা আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সাথে মানুষের পরস্পরের অধিকার আদায়েও সচেতন।

আল্লাহ তাঁর সেই বান্দাকে পছন্দ করেন যার দ্বারা অন্য কোন বান্দার হক নষ্ট হয় না। আর যে বান্দা ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও অন্য বান্দার অধিকার নষ্ট করে, আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন। একজন মানুষের কথা, আচরণ ও ভূমিকাসহ বিভিন্নভাবে আরেকজন মানুষ কষ্ট পেতে পারে বা তার অধিকার নষ্ট হতে পারে। আল্লাহর এক বান্দা দ্বারা আরেক বান্দার হক কিভাবে নষ্ট হয় তার কতিপয় উদাহরণ নিচে দেওয়া হল ঃ

কারো উপর যুলুম করা

আল্লাহ দুনিয়াতে কারো প্রতি যুলুম পছন্দ করেন না। আল্লাহ চান আল্লাহর বান্দারা একে অপরের প্রতি সুন্দর আচরণ করুক। এ কারণে আল্লাহর যে বান্দা কারো প্রতি যুলুম করবে, আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দু'শ্রেণী কখনও আমার শাফায়াত পাবে না, অত্যাচারী ও ধোঁকাবাজ শাসক এবং ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারী। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আযাব ভোগ করবে অত্যাচারী শাসক।

কারো সাথে তিনদিন কথা না বলা

এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করবে। এটা উখুওয়াহ তথা ভ্রাতৃত্বের দাবি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.pathagar.com

এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের জন্য একই দেহের অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই একজন মানুষ যেভাবে নিজের দেহের প্রতিটি অঙ্গের যত্ন গুরুত্বের সাথে নেয়, সেভাবে গুরুত্ব দিয়েই আরেকজন মুসলিম ভাইয়ের খোঁজ-খবর নিতে হবে। এখন যদি দেখা যায়, একজনের সাথে আরেকজনের কথাবার্তা বন্ধ, তাহলে খোঁজ-খবর নেওয়ার মাধ্যমে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের হক আদায় করা সম্ভব হয় না। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। কেউ যদি এভাবে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে দোযখে প্রবেশ করবে।"

রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

যেকোন মুসলমানের সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করা তার অধিকার নষ্ট করার শামিল। কিন্তু কুরআনে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। কারণ, সাধারণ মুসলমানের একে অপরের প্রতি হক যতটুকু একজন আত্মীয়ের হক তার চেয়ে অনেক বেশি। একজন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা মানে তার অধিকার নষ্ট করা। তার রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। কেউ যদি এ হক আদায় না করে তাহলে সে গুনাহ্গার হবে।

পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ

আল্লাহ্ কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের উপর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা ফরয করা হয়েছে।" আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "আমি মানুষকে তাগিদ করেছি, তারা যেন পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে বহন করেছে, প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করেছে আর ত্রিশ মাসকাল যাবত তাকে বহন ও দুধ পান করিয়েছে।" (আহকাফ ঃ ১৫)

এ ধরনের আরো অনেক আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, পিতা-মাতার সেবা করা সন্তানের উপর ফরয। কেউ যদি তার পিতামাতাকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল।" তাই প্রত্যেককে পিতামাতার সাথে সদাচরণ করতে হবে। এমনকি, অমুসলিম পিতামাতার সাথেও সদাচরণ করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পিতামাতার সাথে এমন আচরণ করা যাবে না যার কারণে তাদের মুখ দিয়ে

www.pathagar.com

'উহ্' শব্দ উচ্চারিত হয়। কুরআন ও হাদীসে পিতা-মাতার খিদমত করা সম্পর্কে অনেক বেশি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি তা জানাব না? এ প্রশ্ন তিনি তিনবার করেছেন। আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ অবশ্যই আপনি তা আমাদের বলবেন'। তখন তিনি বললেন, তা হল আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

তিনি অন্যত্র বলেন, "তিনজন লোক কখনও জান্নাতে যাবে না। তারা হল, পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকারী, খারাপ ব্যবহারকারী, যে পুরুষ নিজের স্ত্রী দ্বারা খারাপ কাজ করায় এবং পুরুষালী চাল গ্রহণকারী নারী।"

কুরআন হাদীসের নির্দেশের কারণেই একজন ঈমানদার ব্যক্তি তার মা-বাপকে কখনও কষ্ট দেয় না, কটু কথা বলে না। সুখে-দুঃখে সবসময় তাদের পাশে থাকে। অপরদিকে পাশ্চাত্যে বছরে একবার 'মাদার ডে'তথা-মাতৃদিবস পালন করেও মাতা-পিতার সেবার প্রতি সন্তানকে আগ্রহী করে তোলা যায় না। কারণ, তাদের মূল দর্শনেই গলদ আছে।

গীবত করা

গীবত হল কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা। আল্লাহ কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যেন পরস্পরের গীবত না কর। তোমাদের কেউ কি পছন্দ কর মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া? তা তোমরা অপছন্দই কর।" (হুজুরাত ঃ ১২) আল্লাহ তাআলা এখানে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে বুঝাতে চেয়েছেন গীবত কত নিকৃষ্ট।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন, "তোমার ভাইয়ের কোন কথা এভাবে উল্লেখ করা যা সে নিজে পছন্দ করে না। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি যা বলি তা যদি আমার সে ভাইয়ের মধ্যে প্রকৃতই থাকে, তাহলেও কি গীবত হবে? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা বললে তা যদি তার মধ্যে থাকে তবেই তো গীবত হবে। আর যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে বুহতান অর্থাৎ তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হবে।"

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে কেউ গীবত করলে তিনি শক্ত ভাষায় তাকে নিষেধ করতেন। একবার এক ব্যক্তি সম্পর্কে জনৈক

www.pathagar.com

লোক খারাপ মন্তব্য করেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি খেলাল কর। লোকটি বলল, আমি কেন খেলাল করব? আমি তো গোশত খাইনি। এতদশ্রবণে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই মাত্র তোমার ভাইয়ের গোশত খেয়েছ।

একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে নসীহত করবে। সে খারাপ কিছু করলে তাকে উপদেশ দিবে। এটা তার হক। কিন্তু কেউ যদি তাকে উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে তার অনুপস্থিতিতে দোষ চর্চা করে তাহলে প্রকারান্তরে মানুষের কাছে তাকে হেয় করা হয়। এর মাধ্যমে তার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

এখন প্রশ্ন হল, সরকারের তথা জালেম শাসকের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় যেসব প্রচার প্রচারণা চলে তা কি গীবত হবে? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কি বলেছেন তা আগে শুনুন, "আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি যুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী ও বিজ্ঞ।" (মায়েদাহ ঃ ১৪৮)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, জালেমকে তার যুলুম থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে বা জালেম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রচারণা বৈধ। তবে এক্ষেত্রেও শালীনতা বজায় রাখা দরকার।

সুদী কারবার করা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মতিতে ব্যবসায় হলে দোষ নাই।" (নিসা ঃ ২৯)

সুদের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা হয়। তাই সুদ কম হোক বা বেশি হোক তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। আল্লাহ সুদের পরিবর্তে করজে হাসানার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কেউ কাউকে করজে হাসানা দিলে আল্লাহ তাকে এর কয়েক গুণ বেশি সওয়াব দান করেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, "মানুষের রক্তের যে মর্যাদা তাদের ধনমালেরও ঠিক সেই মর্যাদা।" তিনি আরো বলেন, "সুদ ও ব্যভিচার যখন কোন শহরে ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে।" এ কারণেই আল্লাহর নবী ঘোষণা করেছেন, "যে সুদ খায়, সুদ খাওয়ায়, তার সাক্ষী হয় এবং তার দলীল লিখে, তাদের সকলের উপর আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত দান করেছেন।" কুরআন ও হাদীসে সুদী কারবারকে সম্পূর্ণরূপে

www.pathagar.com

নিষেধ করা হয়েছে। তাই সুদী কারবার ও লেনদেন পরিহার করে চলতে হবে। যারা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অমান্য করে তা করবে, আল্লাহ্ এ জন্য তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

চোগলখুরী করা কিংবা কারো দোষ খুঁজে বেড়ানো

গীবতের ন্যায় কারো দোষ খুঁজে বেড়ানো গুনাহ্। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারো কথাবার্তা তার সম্মতি ছাড়া আড়ি পেতে শুনে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সিসা ঢালা হবে।" তাই আমাদেরকে এ ধরনের গুনাহ্ থেকে সবসময় দূরে থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "চোগলখোর জান্নাতে যাবে না।"

ওজনে কম দেওয়া

অনেককে দেখা যায়, নিজে কোন জিনিস গ্রহণের সময় মাপে বেশি নেয় আবার কাউকে দেওয়ার সময় ওজনে কম দেয়। এটা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ বলেন, "যারা ওজনে ও মাপে কম দেয় তার জন্য সর্বনাশ। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয় তখন পুরোপুরি গ্রহণ করে। আর যখন লোকজনকে ওজন করে বা মেপে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না যে, তারা সেই কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে? যেদিন সকল মানুষ রাব্বুল আলামীনের নিকট দাঁড়িয়ে যাবে।" (মুতাফ্ফীন ঃ ১-৬)

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, এভাবে মাপে কম দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের কাজের দ্বারা অন্যের অধিকার দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এ কারণে এ ধরনের কাজ যারা করবে আল্লাহ্ তাদেরকে কঠিন সাজা দিবেন। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "তোমরা পরিমাপ পূর্ণ কর এবং যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না। আর সুদৃঢ় পাল্লায় ওজন কর, লোকদের দ্রব্যাদি কম দিও না এবং পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে বিপর্যয়কারী হইও না।" (আশ শুআরা ঃ ১৮১-১৮৩)

মজুতদারি করা

যে-কোন পণ্য মজুতদারির মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে দ্রব্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। এতে মুষ্টিমেয় বিক্রেতা অধিক মুনাফা পায় আর অধিকাংশ ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম এটাকে নিষেধ করেছে। এ সম্পর্কে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশি গোলাজাত করে রাখবে, সে উক্ত খাদ্য সদকা করে দিলেও তার গোলাজাত করার গুনাহ্ মাফ হবে না।"

www.pathagar.com

চোরাচালান করা

যে মাল অন্যায়ভাবে নেওয়া হয় তা অবৈধ মাল। কোন ব্যক্তির ঘর থেকে চুরি করে মাল বিক্রয় যেমনি নিষেধ, তেমনি কোন দেশের সম্পদ চোরাই পথে ক্রয়-বিক্রয়ও সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। ব্যক্তির মাল চুরি করলে একজন ব্যক্তির হক নষ্ট হয়। আর চোরাই পথে মাল এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিলে জাতীয়ভাবে সকলের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। তাই চোরাই পথে আনা কোন মাল ক্রয় করাও ঠিক নয়। এতে করে যারা চোরাচালানী করে তাদেরকে মদদ দেওয়া হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চোরাই মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ্ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল।"

ব্যবসায়ে কসম ও ধোঁকাবাজি করা

অনেক সময় দেখা যায়, খারাপ মাল বিক্রির জন্য কসম করা হয়। এটাও হারাম। একজন মানুষকে খারাপ মাল দেওয়ার জন্য কসম করে নিখুঁত মাল বলার মাধ্যমে তার সাথে ধোঁকাবাজি করা হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কসম নিষেধ করে ইরশাদ করেন, "কিরা-কসম দ্বারা পণ্য হয়ত বিক্রি করা যায়; কিন্তু বরকত পাওয়া যায় না"। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "কোন পণ্য বিক্রয়ে পণ্যের দোষ-ক্রটি বলে দেওয়া না হলে কারো জন্যই হালাল হবে না। আর যে তা জানে, আর জানা সত্ত্বেও যদি না বলে তা তার জন্য হালাল নয়।"

দালালি করা

বাজারে কোন মাল ক্রয় করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায়, দালালরা দাম বৃদ্ধি করে দেয়। কোন মানুষ দাম কত জিজ্ঞেস করার পর একজন দালাল এসে চড়া দাম বলে ফেলে। তখন ক্রেতা মনে করে ঐ লোকটি যত দাম বলেছে এর থেকে কম তো আর বলা যায় না। তাই নিজে যত দাম বলত তার চেয়ে বেশি দাম বলতে বাধ্য হয়। এভাবে তার হক নষ্ট হয়। এ জন্য দালালি সম্পূর্ণরূপে হারাম। দালালি ছাড়াও একজন মানুষ কোন জিনিস কেনার সময় সে তার স্থান ত্যাগ করার আগে আরেকজনের দাম বলা ঠিক নয়। এমনকি হাদীসে আছে কোন ব্যক্তির সাথে কারো বিবাহের কথা চললে অপর কারো সে সময় প্রস্তাব দেওয়াও বৈধ নয়। এতে তার হক নষ্ট হয়। দালালি অবৈধ হলেও কেউ কোন জিনিস বিক্রির জন্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা অবৈধ নয়। যেমন মনে করুন, একজন বলল, আমার এ জিনিস এত টাকা বিক্রি করে দাও। এর চেয়ে বেশি বিক্রি করতে পারলে সেটা তোমার। ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য এভাবে কাউকে প্রতিনিধি বানানো জায়েয আছে।

www.pathagar.com

ঘুষ

বর্তমানে ঘুষ ছাড়া অনেক অফিস-আদালতে কাজ করা কঠিন। আমি এটা বলছি না যে, সব অফিসেই ঘুষ দিতে হয়। এখনও অনেক অফিসার আছেন যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেন। এমনকি অনেক অমুসলিমও আছেন যারা কর্মজীবনে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এমন অনেকের কথাও পত্রিকায় রিপোর্ট হয় যে, তারা কোটি কোটি টাকার ঘুষ নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন করেন। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যারা ঘুষ খায় এবং যারা ঘুষ দেয় উভয়ের উপর অভিসম্পাত।" তাই ঘুষের লেনদেন থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু নিজের ন্যায্য প্রাপ্য পাবার জন্য অনন্যোপায় হয়ে কোন কিছু দেওয়ার কথা আলাদা।

খিয়ানত

কোন মানুষ কারো কাছে যদি কোন কিছু আমানত রাখে তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা দরকার। আমানত সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, "যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে।" (মুমিনূন ঃ ৮)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানতের খিয়ানতকে মুনাফিকের চরিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। জাহেলী যুগে কাফির ও মুশরিক নেতারা আমানতের টাকা খিয়ানত করত বলে অনেক কাফিরও আল্লাহর রাসূলের কাছে টাকা আমানত রাখতো। তারা আল্লাহর রাসূলের রিসালাতে বিশ্বাসী না হলেও তাঁকে আমানতদার বলে বিশ্বাস করত। তাই আমাদেরকেও আমানত সম্পর্কে যত্নবান হতে হবে। এক্ষেত্রে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, শুধু অর্থ-সম্পদই আমানত হয় না, মানুষকে আল্লাহ্ যে মেধা-যোগ্যতা দিয়েছেন তাও আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একটি আমানত। এ আমানতকে আল্লাহর পথে কাজে লাগাতে হবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা প্রশাসনিক যেকোন দায়িত্বও আমানত। এসব আমানত যথাযথভাবে পালন না করলে আমানতের খিয়ানতকারী হিসেবে দায়ী হতে হবে এবং আল্লাহর কাছে এ জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

কোন সাহাবীকে গালি দেওয়া বা কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া

কোন সত্যিকার মুসলমান কাউকে কষ্ট দেয় না। কাউকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক গুনাহ। একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল, অমুক মহিলা রাত জেগে ইবাদত করে এবং দিনের পর দিন রোযা রাখে, কিন্তু

www.pathagar.com

তার পার্শ্ববর্তী লোকজনকে কটু কথা দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কোন লাভ হবে না। সে জাহান্নামে যাবে। এ কারণে আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের জবান বা হাত দ্বারা কেউ যেন কষ্ট না পায়।

ইয়াতীমের হক নষ্ট করা

জাহিলী যুগে ইয়াতীমদের লালন-পালন করার ভার যাদের উপর ন্যস্ত হত, তারা সুকৌশলে তার সম্পদ কুক্ষিগত করত। বর্তমান সময়েও দেখা যায়, নানা ফন্দি-ফিকির করে ইয়াতীম বালক বা বালিকার সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, "নিশ্চয় যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ঢুকায় না। অচিরেই তারা জাহান্নামে জ্বলবে।" (নিসা ঃ ১০)

আমাদের সমাজে অনেক ইয়াতীম আছে, তাদের জন্য যেসব 'ইয়াতীমখানা' আছে সেসব ইয়াতীমখানা পরিচালনাকারী যদি ইয়াতীমদের হক নষ্ট করেন এজন্য তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা

আমাদের সমাজে বর্তমানে চাঁদাবাজির ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হয়। চাঁদাবাজি করতে গিয়ে নিরপরাধ অনেক মানুষকে খুন পর্যন্ত করা হয়। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অবৈধ চাঁদা আদায়কারী জান্নাতে যাবে না।" অবৈধ চাঁদাবাজি করার মাধ্যমে অপর মানুষের প্রতি যুলুম করা হয়। আল্লাহ যুলুম পছন্দ করেন না।

এখন প্রশ্ন হল, কেউ যদি কখনও কারো হক নষ্ট করে তার প্রতিকার কি? মানুষ হিসেবে কখনও এ ধরনের গুনাহ হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। আর যার হক নষ্ট করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার হক ফিরিয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর হক যেমন নামায না পড়ে থাকলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ মাফ করতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাফ না করলে আল্লাহও মাফ করবেন না। এ কারণে আমাদেরকে বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার আমাদের দ্বারা কোন মানুষের হক নষ্ট হয়েছে কিনা? জানামতে কারো হক নষ্ট করলে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার হক ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বেঁচে না থাকে তাহলে তার ওয়ারিসগণের কাছে ফেরত দিতে হবে। যদি সে ব্যক্তির নাম জানা না থাকে কিংবা কোনভাবেই তার কাছে পৌঁছা সম্ভব না

www.pathagar.com

হয়, তাহলে তার নামে সদকা করে দিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, যারা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করেন তাদের প্রতিকার কিভাবে হবে? যারা জাতীয় অর্থ আত্মসাৎ করেন কিংবা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করেন তাদেরকে গোটা জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আর যে পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বা নষ্ট করা হয়েছে তার সমপরিমাণ টাকা রাষ্ট্রীয় ফান্ডে জমা দিতে হবে। আর আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে।

হুদূদ-কিসাস তথা দণ্ডযোগ্য অপরাধ করা

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ দুই ধরনের। প্রথমতঃ আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা না করা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা। আর এ ধরনের অপরাধের শাস্তিও দুই ধরনের। কিছু অপরাধের শাস্তি আল্লাহ কুরআনে নিজেই উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ যেসব শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকে হুদূদ (একবচনে 'হদ') বলা হয়। এতে কম-বেশি করার এখতিয়ার কারো নেই। যেমন চুরি, যিনা-ব্যভিচার, খুন, অপবাদ ইত্যাদি। আর কিছু অপরাধের শাস্তি কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই। এ ধরনের অপরাধের সাজা পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে নির্ধারণ করার এখতিয়ার সমাজ বা রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তারা ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমতকে সামনে রেখে তা নির্ধারণ করবেন এ ধরনের শাস্তি বিধানকে 'তাযীরাত (একবচনে 'তাযীর' বলা হয়।

তাযীর এর ক্ষেত্রে একেক দেশের অবস্থাকে সামনে রেখে একেক ধরনের শাস্তি হতে পারে। যেমন ব্যবসায় ধোঁকাবাজি করা, মাল খিয়ানত করা, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের অপরাধের সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্র বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে সাজায় কম-বেশি হতে পারে। হুদূদ ও তাযীরের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য হল, হুদূদ এর দণ্ড রহিত করার জন্য সুপারিশ করাও বৈধ নয় তবে তাযীরের দণ্ড মওকুফের জন্য সুপারিশ করা যায়। হুদূদের প্রয়োগ আল্লাহ যেভাবে করতে বলেছেন সেভাবে করতে হবে। আর তাযীরের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত, কারাগারে প্রেরণ, নির্বাসন দান, অর্থদণ্ড, ধমক দেওয়া, ওয়াজ নসীহত করে ছেড়ে দেওয়াসহ যেকোন ধরনের দণ্ড দেওয়া যায়।

এখন এমন কতিপয় অপরাধ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব যার শাস্তি আল্লাহ কুরআনে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

যিনা করা

যিনা-ব্যভিচার একটি মারাত্মক গুনাহ ও সামাজিক ব্যাধি। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার পর নিষিদ্ধ নারীর সাথে সহবাস করার মত বড় গুনাহ আর নেই।" (আহমদ)

হাদীসে আরো আছে, "যে ব্যক্তি কোন নিষিদ্ধ নারীকে স্পর্শ করবে, কিয়ামতের দিন তার হাত ঘাড়ের সাথে যুক্ত থাকবে। আর কেউ যদি কোন নিষিদ্ধ নারীকে চুমু দেয় কিয়ামতের দিন তার ঠোঁট কাঁচি দিয়ে কাটা হবে।"

সহবাস ছাড়াও বিভিন্নভাবে যিনা হতে পারে। এক হাদীসে আছে, "কোন বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চোখের যিনা, অশ্লীল কথা বলা জিহ্বার যিনা, স্পর্শ করা হাতের যিনা, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া পায়ের যিনা, খারাপ কথা শুনা কানের যিনা আর যিনার কল্পনা করা মনের যিনা।" (বুখারী)

আল্লাহ্ তাআলা যিনাকে হারাম ঘোষণা করে বলেন, "তোমরা যিনার কাছেও যাবে না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং খারাপ কাজ।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৩২)

বিশেষ প্রয়োজনে তাদের সাথে কথাবার্তা বলা যাবে। তবে তা করতে হবে পর্দার সীমারেখার ভেতরে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন, "তোমরা যদি নবীর বেগমগণের নিকট কোন কিছু চাও তাহলে পর্দার আড়াল থেকেই চাইবে। তোমাদের ও তাদের দিল পবিত্র রাখার জন্য এটা এক উত্তম ব্যবস্থা।" (আহযাব ঃ ৫৩)

নারীদের প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে শারীরিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে যাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, আর তারা তাদের সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ করবে না। তবে যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথা স্বতন্ত্র।" (নূর ঃ ৩১)

বাইরে যাওয়ার সময় কিভাবে যেতে হবে সে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, "এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর নিজেদের দোপাট্টা আঁচল ফেলে রাখবে।" (নূর ঃ ৩১)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, নারীকে তার বিপদসৃষ্টিকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত করেই বাইরে যেতে হবে। আবৃতকরণের এ কাজ বোরকার মাধ্যমেও হতে পারে আবার বড় কোন চাদরের মাধ্যমেও হতে পারে। তবে এমন কোন কাপড় পরিধান করা যাবে না, যার ভেতর দিয়ে মেয়েলোকের শারীরিক কাঠামো ও দেহের কমনীয়তা ফুটে উঠে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেসব মেয়েলোক কাপড় পরেও উলঙ্গ, পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট এবং পুরুষদেরও আকৃষ্টকারী, তারা জাহান্নামী। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীস থেকে বুঝা যায়, যিনা এত মারাত্মক অপরাধ যে, এমন কিছুই করা যাবে না যা যিনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই আল্লাহ্ শুধু যিনাকে নিষেধ করেননি; বরং যিনার কাছে যেতেই নিষেধ করেছেন। তাই এমন সব কিছু হারাম যা যিনার দিকে ধাবিত করে।

আল্লাহ্ যিনা-ব্যভিচার সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে চান। একবার কেউ যিনা করলে দ্বিতীয়বার যেন কেউ যিনা করার সাহস না পায়, এ কারণে তিনি নিজেই যিনার শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইসলাম বৈবাহিক বন্ধন ছাড়া অননুমোদিত যেকোন প্রকারের যৌনমিলনকে যিনা বলে গণ্য করে। যিনাকারী নারী ও পুরুষের উভয়ের সম্মতিতে হোক কিংবা জোরপূর্বক হোক অবৈধ মিলনই যিনা। এ ধরনের যিনাকারী যদি বিবাহিত হয় তাহলে রজম তথা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করাই তার দণ্ড। আর যদি অবিবাহিত হয় তাহলে একশত বেত্রাঘাত দণ্ড ভোগ করতে হবে। অবশ্য এ ধরনের সাজা দেওয়ার জন্য চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর প্রামাণ্য নিদর্শনের ভিত্তিতে দণ্ড কার্যকর করতে হবে।

বর্তমানে অনেকেই এ ধরনের দণ্ডকে মানবতাবিরোধী বলে প্রচার করছেন। অথচ তাদের কাছে তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণ করা মানবতাবিরোধী হয় না। পত্রিকায় অনেক সময় দেখা যায়, ধর্ষণ করে আলামত নষ্ট করার জন্য একজন নারীকে হত্যা করার পর লাশ টুকরো টুকরো করে বস্তাবন্দি করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এটা কী জঘন্য অন্যায়! এ ধরনের জঘন্য পাপ যারা করে তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শনের অর্থ হল, সমাজের নিরপরাধ মানুষদের প্রতি অবিচার করা এবং অপরাধীকে পাপ কাজে আরো উৎসাহিত করা।

বর্তমানে রাস্তাঘাটে নারীরা নিরাপদে চলতে পারে না এবং প্রতিনিয়ত অনেক যিনার ঘটনা সংঘটিত হল। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূলের সময় হাতে গোনা কয়েকটি ঘটনা ছাড়া এ ধরনের অন্যায় সংঘটিত হবার নজির নেই। সমাজে এভাবে ব্যভিচার প্রসারের পেছনে বেশ্যাবৃত্তিও অন্যতম কারণ। আফসোসের বিষয় হল, বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশের আইন অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কা নারী বা পুরুষ বিবাহ্ ছাড়াও পারস্পরিক সম্মতিতে মেলামেশা করা অবৈধ নয়। তাই সরকারিভাবে পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়া হয়। এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। সরকারিভাবে পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়ার পরিবর্তে সরকারি উদ্যোগে ‘বিবাহ’ দেওয়ার ব্যবস্থা করাই জরুরি।

www.pathagar.com

কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা

বর্তমানে দেখা যায়, একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে খুন করছে। এভাবে কেউ কাউকে খুন করা মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের অপরাধীর আবাস হবে জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। (নিসা ঃ ৯৩)

কোন মুসলমানকে শুধু নয়, যেকোন মানুষকে অন্যায়ভাবে খুন করা হারাম। আল্লাহ্ কুরআনে ইরশাদ করেন, "তোমরা মানুষকে হত্যা করবে না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন। তবে সত্যতা সহকারে হত্যা করার কথা স্বতন্ত্র।" (আনআম ঃ ১৫১)

এ আয়াতে সত্যতার কথা বলা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, কিছু হত্যা অবৈধ নয়। যেমন কিসাস নেওয়ার জন্য কাউকে হত্যা করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "কিসাস তথা হত্যার দণ্ডরূপে হত্যা করাতে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত।" (বাকারা ঃ ১৭৯)

প্রকাশ্য যিনার দণ্ড ও মুরতাদের দণ্ড হিসেবে হত্যার বিষয়টি অন্যায় নয়। তবে এ ধরনের দণ্ড রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া কোন ব্যক্তি বা সংস্থা দিতে পারে না।

বর্তমানে এত খুন-খারাবি কেন? এর কারণ, খুনের বিচার হয় না, তাই খুনীরা একটি খুন করার পর আরো দশটি খুন করতে সাহস পায়। কিন্তু একজন খুনীকে কিসাস-এর দণ্ড দেওয়া হলে অনেক খুনীরা ভয়ে খুন ছেড়ে দিত। এভাবেই সমাজে হাজারো খুন কমে যেতো।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন কারণে খুনের ঘটনা সংঘটিত হয়। এমনকি সন্তান কর্তৃক পিতামাতা এবং পিতামাতা কর্তৃক সন্তানকে খুনের ঘটনা সংঘটিত হয়। বর্তমানে দেখা যায়, কেউ অভাব অনটনে বা পারিবারিক কলহে ছোট ছেলে-সন্তানকে হত্যা করে। এটা মারাত্মক গুনাহ্। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনটি গুনাহ্ সবচেয়ে মারাত্মক, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করা এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা। (বুখারী ও মুসলিম)

চুরি

আল্লাহ্ কারো জিনিস অন্যায়ভাবে নেওয়াকে অপছন্দ করেন। এভাবে কেউ কারো জিনিস অন্যায়ভাবে নেওয়ার পর সাজা না দিলে সমাজে কারো ধন-মালের

www.pathagar.com

নিরাপত্তা থাকবে না। তাই আল্লাহ্ জানের নিরাপত্তার জন্য কিসাসের শাস্তি বিধানের সাথে সাথে মালের নিরাপত্তার জন্য 'চুরির শাস্তি' নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "যে পুরুষ চুরি করে আর যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে।" (মায়েদাহ্ ঃ ৩৮)

এ আয়াতের আলোকে প্রমাণিত যে, কেউ যদি কারো মালিকানাভুক্ত কোন সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ চুরি করে তাহলে তার হাত কেটে দিতে হবে। অবশ্য ইসলামের এ শাস্তি তখন কার্যকর হবে যখন রাষ্ট্র অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ মৌলিক সমস্যার সমাধান করার পরও কেউ অভাবের পরিবর্তে স্বভাবের কারণে চুরি করে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণের পরও যারা চুরি করবে তাদেরকে কঠোর সাজা দেওয়া না হলে সমাজে চুরি, ডাকাতি বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর রাসূলের সময় এ ধরনের দণ্ড থাকার কারণেই মানুষ ঘরের দরজা খুলে ঘুমাতে পারতো। আর বর্তমানে প্রাসাদের ভেতর অনেক নিরাপত্তা-প্রহরী নিয়ে বসবাস করার পরও চুরি, ডাকাতি হয়। আমাদের সমাজে যদি ইসলামী আইন কার্যকর থাকতো তাহলে অল্প সময়েই এ ধরনের অপরাধ লোপ পেত।

কারো প্রতি অপবাদ দেওয়া

কোন মানুষের প্রতি দোষারোপ করা জঘন্য অপরাধ। যেমন কারো প্রতি যিনা, চুরি বা ডাকাতির অপবাদ দেওয়া। এ ধরনের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার পর কঠিন শাস্তি না দিলে সমাজের ভাল মানুষদেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপবাদ দিয়ে তাদের চরিত্রে কালিমা লেপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেত। তাই আল্লাহ্ কুরআনে নিজেই এ ধরনের অপরাধের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান। কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।" (নূর ঃ ৪-৫)

এ আয়াত থেকে অপবাদ দেওয়ার দণ্ড স্পষ্ট। অপবাদদানকারী নারী বা পুরুষকে আশিটি বেত্রাঘাত করার আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশের কম-বেশি করার সুযোগ নেই। তবে সে তওবা করলে তার সাক্ষ্য কবুল হবে কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, তার সাক্ষ্য কখনও কবুল করা যাবে না। আবার কারো মতে সে তওবা করলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

www.pathagar.com

মাদকদ্রব্য সেবন

মাদকদ্রব্য বিশ্ব সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এর ব্যবহার চলে আসছে। তবে বর্তমানে কোকেন, হেরোইন, ক্যানাবিস, মারোয়ানা, মদ, এ্যালকোহলসহ নানা ধরনের মাদকদ্রব্য নৈতিকতা বিধ্বংসী কামানের ন্যায় কাজ করছে। এর ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ মাদকতার শিকার। এর ফলে প্রতিবছর অনেকের অকাল মৃত্যু হয়।

আল্লাহর রাসূলের সময়ও মদ চালু ছিল। মানুষ মদের প্রতি এত বেশি আসক্ত ছিল যে, আল্লাহ্ মদকে এক সাথে হারাম ঘোষণা করেননি। তিনি প্রথমে জানালেন "মদে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি"। তারপর বললেন, "তোমরা মাদকাসক্ত অবস্থায় নামায পড়তে যেয়ো না।" এরপর তিনি মদ পানকে শয়তানের কর্ম বলে আখ্যায়িত করে এর থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা। নিশ্চিতভাবে জানবে, মদ, জুয়া, বলিদানের নির্দিষ্ট স্থান এবং ভাগ্য জানার নিয়ম নিতান্তই অপবিত্র শয়তানী তৎপরতা মাত্র। অতএব তোমরা তা পরিহার কর। আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।" (মায়েদাহ ঃ ৯০)

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ খাওয়াতে অভ্যস্ত থেকেছে এবং তওবা ছাড়াই মারা গেছে, সে আখিরাতে জান্নাতের পানীয় থেকে বঞ্চিত থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

বর্তমানে মাদকতা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যার কারণে বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চলছে। কিন্তু অনেক মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়। সরকারি লাইসেন্স নিয়ে মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় প্রায় সব দেশেই বৈধ। অপরদিকে পাশ্চাত্যে মাদকদ্রব্য সেবন তখনই অবৈধ হয়, যখন কেউ ম্যদপান করে রাস্তায় এমনভাবে মাতলামি করে যার কারণে অপরের ক্ষতি হয়। এ ছাড়া ম্যদপান বৈধ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক মদ্যপানকে সর্বাবস্থায় হারাম করেছেন। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর অভিশাপ মদ্যপানকারী ও পরিবেশনকারীর উপর এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের উপর।" এ কারণে মদ্যপান যেমনিভাবে অপরাধ ঠিক অনুরূপভাবে মদের ব্যবসাও মহাপাপ।

কেউ মদ্যপান করেছে বলে প্রমাণিত হলে ইমাম আবূ হানিফার মতে, তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করতে হবে। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে, চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতে হবে। মদ্যপানের দণ্ডের পরিমাণের ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ থাকলেও সকলে এ বিষয়ে একমত যে, মদ কম বা বেশি যাই পান করুক তা দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

www.pathagar.com

সমকামিতা

যিনার ন্যায় সমকামিতাও মারাত্মক গুনাহ। হাদীসে আছে, সাত শ্রেণীর মানুষের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকাবেন না এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশের আদেশ দেবেন। (তারা হল) সমকামী, জীবজন্তুর সাথে সঙ্গমকারী, কোন মহিলা ও তার কন্যাকে এক সাথে বিবাহকারী এবং হস্তমৈথুনকারী। তবে তওবা করলে তারা সবাই ক্ষমা পেতে পারে।

সমকামিতার শাস্তি সম্পর্কে আলেমগণের মাঝে মতবেদ আছে। কারো কারো মতে, সমকামিতার শাস্তি যিনার মত। আর কারো মতে, যেহেতু এর শাস্তির কথা কুরআনে সরাসরি নেই, তাই এর শাস্তি রাষ্ট্র কর্তৃক নিধারিত হবে। আবার কারো মতে, সমকামীকে আগুনে জ্বালিয়ে মেরে ফেলতে হবে।[৫৬]

অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হল সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য এমন কি সমকামীদের বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার জন্য পাশ্চাত্যের অনেক দেশে জোর দাবি উঠছে। ব্রিটেন ও আমেরিকায় সমকামীদের ক্লাব আছে। যারা সেখানে মিলিত হয়ে আমোদ-ফুর্তি করে। সুদূর অতীতে হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের ব্যাধি ছিল। আল্লাহ এটাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাই কোন ঈমানদার এ ধরনের অপরাধ করলে আল্লাহ তাকে কঠোর সাজা দিবেন।

এখন প্রশ্ন হল, কেউ দুনিয়াতে দণ্ডযোগ্য অপরাধের জন্য সাজা ভোগ করার পর আখিরাতে তার শাস্তি হবে কিনা?

এ প্রশ্নের জবাবে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, দুনিয়াতে শাস্তিভোগ করলে আখিরাতের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তিনি এ প্রসঙ্গে হযরত উবাদা ইবনে সামেতের একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, এ হাদীসে শাস্তিকে কাফ্ফারা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে ইমাম আবূ হানিফার মতে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। দুনিয়ার শাস্তি হল দুনিয়ার নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য। আখিরাতের শাস্তি থেকে রেহাই পেতে হলে তাকে তওবা করতে হবে। তওবা যদি আল্লাহ কবুল করেন তখনই সে আখিরাতের শাস্তি থেকে নাজাত পাবে।[৫৭]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা করা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের অনেক জায়গায় অনেক কিছু করার জন্য বলেছেন এবং কিছু জিনিস করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনেক আদেশ ও নিষেধ করেছেন। এসব আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা অপরিহার্য। এ ধরনের আবশ্যকীয় আদেশ ও নিষেধ মেনে না চলা গুনাহ।

নিম্নে এ ধরনের কিছু বিষয় উল্লেখ করা হল ঃ

মীরাস বণ্টনে আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করা

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে কেউ কেউ মেয়েদেরকে প্রাপ্য সম্পদ থেকে কম দিয়ে মৃত্যুর আগে সম্পদ বণ্টন করে যান। তাদের ধারণা মেয়েরা যে অংশ পায় তা পরের ঘরে চলে যায়। আর ছেলেরা যা পায় তা তার নিজের কাছে থাকে। ছেলে ও মেয়েদের মীরাসের সম্পদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ ইনসাফ করেছেন। পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, পরিজনকে দেখাশুনাসহ ছেলেদের অনেক দায়িত্ব আছে। তাই তাদেরকে মেয়েদের দ্বিগুণ দিয়েছেন। মেয়েদের কোন দায়িত্ব নেই; কিন্তু তাদের একান্ত প্রয়োজনে খরচ করার জন্য আল্লাহ তাদের জন্যও অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেন তাদের সমস্যার সময় কারো উপর নির্ভর করে থাকতে না হয়। অবশ্য সর্বাবস্থায় কেউ না কেউ তাদের দেখাশুনা করার দায়িত্বে রয়েছে। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায়, তাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হয় না। আল্লাহ তাদের যে হিস্‌সা দিয়েছেন অনেক সময় তা দেওয়া হয় না বা কম দেওয়া হয়। এমনকি কোন কোন পিতা তার মেয়েকে প্রাপ্য অংশ থেকে কম দিয়ে যান। তাদেরকে প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা মারাত্মক গুনাহ। আবার কোন মেয়ের স্বামী মারা গেলে বা তালাকপ্রাপ্তা হলে তাকে বোঝা মনে করা হয়। এটা ঠিক নয়।

ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কে পিতা-মাতার বেশি উপকারে আসবে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। এখানে উপকার বলতে শুধু দুনিয়ার টাকা-পয়সা বুঝানো হয়নি। পিতামাতা মারা যাবার পর কে বেশি দোয়া করবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। তাই মেয়েদেরকে কম উপকারী মনে করার সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তোমরা জান না, তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে তোমাদের অধিকতর নিকটবর্তী কে? এ অংশ বণ্টন ও হিস্‌সা নির্ধারণ স্বয়ং আল্লাহরই। আর আল্লাহ হলন সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী।" (নিসা ঃ ১১)

আল্লাহ ছেলে ও মেয়ের জন্য যে হিস্‌সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা রদবদল করার অর্থ হল, আল্লাহর বণ্টন সঠিক হয়নি। কারো মনে জাহান্নামের আগুনের ভয় থাকলে তার পক্ষে মেয়েকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে কুরআনে যাদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে তাতে কম বেশি করা বৈধ নয়। তবে কোন ওয়ারিস যদি তার সম্পদ স্বেচ্ছায় কাউকে দিয়ে যায় তার কথা আলাদা।

www.pathagar.com

গণকের কাছে যাওয়া

সমাজে এক ধরনের লোক আছে যারা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য গণকের কাছে যায়। এভাবে গণকের কাছে যাওয়া জায়েয নাই। যারা এসব করবে তারা কঠিন শাস্তি পাবে। সহীহ্ হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে গেল, তাকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করল এবং সে যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল, চল্লিশদিন পর্যন্ত তার কোন নামাযই কবুল হবে না। (মুসলিম)

মূলত আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না। আল্লাহ্র রাসূলও গায়েব জানতেন না। তাঁকে আল্লাহ্ গায়েবের খবর যতটুকু জানিয়েছেন ততটুকুই জানতেন। আল্লাহ্ পাক হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার আছে। আর আমি গায়েব জানি না।" বর্তমানে কিছু মানুষ জিন-শয়তানের মাধ্যমে কিছু তথ্য বলতে পারে। এটা গায়েবের ইলম নয়। শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার জন্য গণকদেরকে সাহায্য করে। তাই গণকের কাছে গিয়ে শয়তানের শিকার হওয়া মানেই হল টাকা দিয়ে জাহান্নাম খরিদ করা।

হারাম কিছু ভক্ষণ করা

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা খাওয়া কবীরা গুনাহ্। যেমন-শূকরের গোশত, মৃতজন্তু, কুকুর, শৃগালসহ সকল নিষিদ্ধ প্রাণীর গোশত খাওয়া।

মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

বর্তমান সমাজে মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অথচ মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা কথা বলাকে নিফাকের নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের মুসলিম সমাজের অনেকেই অহরহ মিথ্যা কথা বলছেন। এমনকি ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অনেক নিরপরাধ মানুষকে অপরাধী বানাবার ঘৃণ্য চেষ্টাও অনেকে করছেন।

স্বর্ণালংকার ব্যবহার ও রেশমের কাপড় পরিধান করা

পুরুষের জন্য স্বর্ণালংকার ব্যবহার ও রেশমের কাপড় পরিধান করা হারাম। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি

www.pathagar.com

দেখে খুলে ফেলতে বলেন এবং ইরশাদ করেন, "তোমাদের এ ব্যক্তির হাতে জাহান্নামের আগুন পরিধান করার সখ হয়েছে।"

দুনিয়াতে অনেক সময় দেখা যায়, অনেক পুরুষ স্বর্ণের আংটি পরিধান করে। যেসব পুরুষের স্বর্ণের আংটি আছে তা মুহাররাম কোন মহিলা আত্মীয়াকে দিয়ে দেওয়া উচিত।

যাদু করা

সমাজে একে অপরের বিরুদ্ধে যাদু করতে দেখা যায়। এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যাদু করা কবীরা গুনাহ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ থেকে বিরত থাকো। আসহাবে রাসূল (রা) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সে সাতটি কাজ কি কি? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু বিদ্যা, আল্লাহ যে প্রাণী হত্যা হারাম করেছেন (ইনসাফের ভিত্তিতে হত্যা করা ছাড়া) তা হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের ধন-মাল হরণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন এবং ঈমানদার পবিত্র মহিলার উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)

জুয়া খেলা ও লটারি

যেসব খেলায় জুয়া আছে ইসলাম সে সকল খেলাকে হারাম ঘোষণা করেছে। জুয়া ও লটারির মাধ্যমে ভিত্তিহীন আশা আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করা হয়। আর এতে বৈধপন্থায় সম্পদ আহরণ হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, জুয়া খেলতে গিয়ে অনেকেই নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এ কারণে জুয়া খেলা অনেক ব্যক্তির জন্য বিপদ ডেকে আনে। তাই এটা হারাম।

অহংকার ও রিয়া

অহংকার আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে, সে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন অহংকারীর দিকে তাকাবেন না। তবে অহংকার ছাড়া স্বভাব-প্রকৃতিগতভাবে হঠাৎ কাপড় নিচে ঝুলে পড়াতে দোষ নেই। যেমন হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাপড় নিচে ঝুলে পড়তো। অহংকারের ন্যায় রিয়া বা অন্য মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করাও গুনাহ। যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন সৎ কাজ করে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন জনসমাবেশে অপমানিত করবেন।

www.pathagar.com

সিনেমা দেখা

অনেক মুসলিম নর-নারীকে সিনেমা দেখতে দেখা যায়। সিনেমাতে অশ্লীল ছায়াছবিসহ এমন অনেক জিনিস প্রদর্শন করা হয় যা একজন মুসলমানের পক্ষে দেখা বৈধ নয়। আখিরাতে নাজাতের প্রত্যাশী আল্লাহর বান্দাকে এ ধরনের অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতে হবে।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও কাউকে ধোঁকা দেওয়া

বর্তমান সমাজে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অথচ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং কাউকে ধোঁকা দেওয়া কবীরা গুনাহ। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি বাদী হব। যে ব্যক্তি ওয়াদা করে তার খেলাফ করেছে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার অর্থ ভোগ করেছে এবং যেকোন কর্মচারী নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করেছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয় না। (বুখারী)

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মত কাউকে ধোঁকা দেওয়াও কঠিন গুনাহ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের ব্যাপারে ধোঁকা দেয় সে জাহান্নামী। তিনি আরো বলেন, কোন ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও খোটাদানকারী জান্নাতে যাবে না।

যৌতুক নেওয়া

বর্তমান সময়ে দেখা যায়, যৌতুকের চাহিদা মেটাতে না পারার কারণে অনেক মেয়ের বিবাহ দেওয়া তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এমনকি বিয়ে হওয়ার পরও যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। আল্লাহ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহরকে ফরয করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌতুক নেওয়াকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করেছেন। তাই যৌতুক নিয়ে বিবাহ করা জায়েয নেই। অনেক সময় দেখা যায়, ছেলের চাহিদার চেয়ে ছেলের পিতার চাহিদা অনেক বেশি থাকে।

যাকে আল্লাহ ছেলে দিয়েছেন তাকে চিন্তা করা দরকার, আল্লাহ যদি ছেলে না দিয়ে মেয়ে দিত তাহলে তার কাছে যৌতুক দিতে কেমন লাগতো? আর যারা যৌতুকের কারণে স্ত্রীকে নির্যাতন করছে তারা কি স্ত্রীর পরিবর্তে যৌতুককে বেশি ভালবাসে? তাদের কাছে কি স্ত্রী শুধু ভোগের জন্য? আফসোসের বিষয় হল, মুসলমানদের অনেকেই এ ধরনের মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। তাই আমাদেরকে যৌতুক বিরোধী অভিযান চালাতে হবে। যৌতুক যারা দাবি করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

www.pathagar.com

যৌতুক না চাওয়ার পর মেয়ের অভিভাবক কর্তৃক মেয়ের জামাইকে সামর্থ্যের আলোকে উপঢৌকন দেওয়া সুন্নাত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে উপাঢৌকন দিয়েছিলেন।

জিহাদের ময়দান থেকে পালানো

আল্লাহ তাআলা জিহাদের ময়দান থেকে পালানো প্রসঙ্গে বলেন, "যে ব্যক্তি যুদ্ধের দিন শত্রুদের মোকাবিলা থেকে পালাবে, সে আল্লাহর গযবে পতিত হবে এবং তার প্রত্যাবর্তনস্থল হবে জাহান্নাম।" (আনফাল ঃ ১৬) আল্লাহ চান আল্লাহর বান্দারা তাঁরই মনোনীত আদর্শ ইসলামকে বিজয়ী করুক। যারা ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য জিহাদে যায় তাদের পক্ষে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ। তবে সেনাপতির নির্দেশে কৌশলগত পশ্চাৎপদ হওয়ার বিষয়টি আলাদা।

মুহরিম বা মুহরিমাত ছাড়া বাকিদের সাথে পর্দা পালন না করা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি দেবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সিসা ঢালা হবে।" তাই নারীদেরকে পর্দাসহকারেই বাইরে বের হতে হবে। কোন নারী যদি পর্দা ছাড়া বের হবার কারণে কোন পুরুষ গুনাহে লিপ্ত হয় এ কারণে মহিলাকে অধিক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অপচয় ও অপব্যয় করা

যাদের সম্পদ আছে, তারা সম্পদ আছে বলেই অপচয় করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন তাদের সম্পদে গরীব মানুষের হক আছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ধনী মানুষ তাদের কুকুরের পেছনে যে অর্থ ব্যয় করে, তা দিয়ে অনেক গরীব মানুষের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়। আল্লাহ এভাবে সম্পদ অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। যারা সম্পদ অপচয় করে, তাদেরকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।

আত্মহত্যা করা

আত্মহত্যা করা মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জিহাদে একজন জিহাদরত লোকের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, সে জাহান্নামী। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন সে জাহান্নামী হবে? সেতো আমাদের সাথে জিহাদ করছে। কিছুক্ষণ পর দেখা

www.pathagar.com

গেল, সে আহত হবার পর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নিজের বর্শা দ্বারা নিজকে আঘাত করে মারা গেল। তখন সাহাবায়ে কেরামের বুঝতে কষ্ট হল না যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন তাকে জাহান্নামী বললেন। আমাদের সমাজেও দেখা যায়, অনেকে অভাব-অনটনে কিংবা মান-অভিমানের কারণে বা ক্ষোভে-দুঃখে আত্মহত্যা করে। এভাবে যারা আত্মহত্যা করবে আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা অনুযায়ী তারা দোযখে জ্বলবে।

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা

কারো যদি একাধিক স্ত্রী থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে। কাউকে অগ্রাধিকার দান ঠিক নয়। আল্লাহ্ এ কারণে কুরআনে একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যদি ইনসাফ রক্ষা করার ক্ষেত্রে ভয় হয় তাহলে এক স্ত্রী রাখা দরকার। তবে স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা বা পুরুষের শারীরিক প্রয়োজনে কিংবা যুদ্ধে পুরুষের সংখ্যা কমে গেলে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী এক সাথে রাখা বৈধ। তবে এ বৈধতার সুযোগে কেউ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে যদি স্ত্রীদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে আল্লাহ্ শাস্তি দান করবেন।

সন্তানাদির মধ্যে সমতা রক্ষা না করা

কারো যদি একাধিক সন্তান থাকে তাহলে সকল সন্তানকে সমান চোখে দেখা অপরিহার্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের পুত্রদের যে অধিকার তোমাদের উপর তার মধ্যে এও একটি যে, তুমি তাদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ বণ্টন করবে।"

ভাস্কর্য নির্মাণ করা

ইসলাম প্রতিকৃতি হারাম ঘোষণা করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ছবি বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করবে তাতে রূহ দেওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দান করবেন। কিন্তু সে তাতে কখনও রূহ দিতে পারবে না।" এ থেকে বুঝা যায়, ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করা মস্তবড় গুনাহ।

অবৈধ গর্ভপাত ঘটানো

অবৈধ গর্ভপাত জায়েয নাই। অনেক সময় দেখা যায়, ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চার হবার পরও অনেকে গর্ভপাত ঘটান এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ কারণে

www.pathagar.com

ফকীহগণ বলেছেন গর্ভপাত ঘটানোর সময় যদি ভ্রূণ জীবন্ত মারা যায় তাহলে রক্তমূল্য দিতে হবে। আর যদি ভ্রূণ মৃত হয় তাহলে জরিমানা দিতে হবে। তবে কখনও যদি মায়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য গর্ভপাত ছাড়া কোন বিকল্প না থাকে, সে সময় ভ্রূণের জীবন রক্ষার চেয়ে মায়ের জীবন রক্ষা অধিক জরুরি বলে ফকীহগণের অভিমত।[৫৮]

নিষিদ্ধ পেশা গ্রহণ করা

এমন চাকরি করা জায়েয নয় যেখানে হারাম কিছু উৎপাদন করা হয়। যেমন মদের কারখানা, পতিতালয়।

ইসলামের মূলনীতি হল যা খাওয়া হারাম তা উৎপাদন করা, বিলি-বন্টন করা, তার প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখা সবই হারাম। অতএব একজন মানুষকে আখিরাতে নাজাত পেতে হলে দুনিয়ার জীবনে এমন পেশা গ্রহণ করতে হবে, যে পেশায় হারাম কোন কিছুর সংমিশ্রণ নেই।

এ ধরনের অনেক গুনাহ্ আছে যা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম যাহাবী তাঁর **'কবীরা গুনাহ্'** শীর্ষক গ্রন্থে ৭০টি কবীরা গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কেউ যদি কোন ধরনের কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে তওবা করতে হবে। আর সবসময় গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

আখিরাতে সফলতা লাভের পথ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহ চান তার বান্দারা আখিরাতে আরাম-আয়েশে থাকুক। জান্নাত হোক তাদের স্থায়ী আবাস। তাই তিনি জান্নাতের পথ বাতলে দিয়েছেন। কোন্ পথে চললে আমরা আখিরাতে নাজাত্ পাব তা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

ঈমান

আখিরাতে নাজাতের জন্য মৌলিক শর্ত হল ঈমান। কারো যদি ঈমান না থাকে সে যত ভাল কাজই করুক না কেন আখিরাতে তার কোন মূল্য নেই। কোন জমিতে ফসল হওয়ার জন্য যেমন বীজ দরকার তেমনিভাবে কারো ভাল কাজ গ্রহণযোগ্য হবার জন্য ঈমান দরকার। ঈমানবিহীন আমলের কোন গুরুত্ব নেই।

কারো ঘরে যদি অনেকগুলো বাল্ব থাকে; কিন্তু ইলেকট্রিক সুইচ অফ থাকে, তাহলে আলো জ্বলবে না। তেমনিভাবে কেউ অনেক ভাল কাজ করার পরও তা কোন কাজে আসবে না, যদি তার হৃদয়ে ঈমান না থাকে। মূলত একজন মানুষের ঈমানই হল সবচেয়ে বড় সম্পদ। সে দুনিয়াতে কত বেশি ধন-সম্পদের অধিকারী তার কোন মূল্য নেই। আখিরাতে তার মর্যাদা নির্ণয়ের প্রধান মানদণ্ড হল সে ঈমানদার কিনা? এ কারণেই আল্লাহ্ সূরা আল মুমিনূনে ইরশাদ করেছেন, "মুমিন যারা তারাই সফলকাম হয়েছে।" তিনি সূরা আল আসরে ইরশাদ করেন, "সময়ের কসম (করে বলছি), মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত আছে), একমাত্র সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তাআলার উপর) ঈমান এনেছে, (এবং ঈমানের দাবি মোতাবেক) নেককাজ করেছে, (সামাজিক জীবনে) একে অপরকে সে মহাসত্যের অনুসরণের কথা বলেছে, (সর্বোপরি ঈমানের পরীক্ষায়)-এরা একে অপরকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।" আল্লাহ্ আখিরাতে ঈমানের মূল্য দিবেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, "তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আর আল্লাহ্ হলন সমুচিত মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।" (নিসা ঃ ১৪৭)

এখন চিন্তা করা দরকার ঈমান কি? ঈমান হল আল্লাহ্র যাত, সিফাত ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উপস্থাপিত জীবন আদর্শের উপর গভীর বিশ্বাসের নাম। এটা শুধু মৌখিক স্বীকৃতির নাম নয়। হৃদয়ের গভীরে এ বিশ্বাস লালন ও কর্মের মাধ্যমে এ বিশ্বাসের প্রতিফলন

www.pathagar.com

ঘটানোর মাধ্যমে ঈমানের প্রকাশ ঘটে। কেউ হৃদয়ের গভীরে বিশ্বাস স্থাপন না করে মুখে মুখে যতই ঈমানদার বলে দাবি করুক না কেন সে সত্যিকার মুমিন নয়। যারা মুখে ঈমানের দাবি করে আর হৃদয়ে ঈমান থাকে না তারাই হল মুনাফিক। আর আল্লাহর যাত, সিফাত ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থাপিত আদর্শ পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে যারা অস্বীকার করে তারা কাফির। আর যারা আল্লাহর যাত ও সিফাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তারা মুশরিক। আর যাদের হৃদয়ে গভীর ঈমান থাকার পরও আমলের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকে তারা হল ফাসিক। যারা ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করে তারাই হল খাঁটি ঈমানদার-মুমিন।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল, আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলার স্বীকৃতি প্রদান। আর আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করতে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। নিজের ইচ্ছা মত আল্লাহর বিধি-বিধান পালনের সুযোগ নেই। আল্লাহর হুকুম আল্লাহর রাসূলের তরীকা অনুযায়ী পালন করার নামই ইবাদত। এ কারণে ঈমানের জন্য অপরিহার্য শর্তের অন্যতম হল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে আখেরী নবীর প্রতি ঈমান। কেউ যদি আল্লাহকে স্বীকার করে কিন্তু আখেরী নবীকে স্বীকার না করে, তাহলে সে ঈমানদার নয়। ঈমানদার হওয়ার জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতামুন্নাবিয়্যীন হিসেবে স্বীকার করার সাথে পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে। সকল নবীই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহর কোন নবী বা রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার সুযোগ নেই। বর্তমানে যারা ইহুদী বা খ্রিস্টবাদে বিশ্বাসী তারা তাদের বিকৃত ধর্মের বিকৃতরূপেরই অনুসরণ করছে। যদি তারা সত্যিকারভাবে তাদের ধর্মের অনুসরণ করত তাহলে তারাও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী হিসেবে স্বীকার করত। কারণ তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিলে আখেরী নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের সুসংবাদ আল্লাহ আগেই দিয়েছেন। যা পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণ তাদের অনুসারীদেরকে জানিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ) প্রদত্ত সুসংবাদ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা সে সময়কে স্মরণ কর, যখন মারইয়াম তনয় ঈসা (আ) বলল, হে বনী ঈসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল তখন তারা বলল, এত এক প্রকাশ্য যাদু।" (সফ ঃ ৬)

www.pathagar.com

অন্যান্য ধর্মাবলম্বনকারীরা বিকৃত ধর্মের অনুসরণ করছে বলেই তাদের মধ্যে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। আমরা যারা আখেরী নবীর উম্মত, তাদেরকে পূর্ববর্তী নবী ও রাসূল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করতে হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী নবী বা রাসূলদের কোন বিধি-বিধান অনুসরণ করা যাবে না। আগেকার নবী ও রাসূলদের সময়কার শরীয়তের যেসব দিক কুরআন ও হাদীসে অনুমোদন করা হয়েছে কেবল তারই অনুসরণ করতে হবে। আখিরাতে নাজাতের জন্য এটা অপরিহার্য। আগেকার নবী ও রাসূলের সময়কার শরীআত আগেকার লোকদের জন্য ছিল। আমাদের জন্য আল্লাহর পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেখে যাওয়া শরীয়তেরই অনুসরণ করা অপরিহার্য। আখেরী নবীর আনীত শরীয়তের পরিবর্তে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের শরীআত অনুসরণ করলে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে না। এখন একটু চিন্তা করা দরকার, আমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর রাসূলকে নবী হিসেবে স্বীকার করার পর তাঁর আদর্শ বাদ দিয়ে অন্য কোন মানুষের আদর্শ অনুসরণ করে তাদের অবস্থা কি হবে?

আমাদেরকে বিশ্বাস পোষণ করতে হবে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শরীয়াত আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা তাঁর উদ্ভাবিত কোন নতুন জীবনপদ্ধতি নয়। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল মানুষদেরকে একই দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ চান তাঁর বান্দারা একই দীনের অনুসরণ করেই আখিরাতে এক সাথে জান্নাতে বসবাস করুক। কিন্তু স্থান, কাল ও সময়ের প্রেক্ষাপটে শরীয়তের মধ্যে কিছুটা রদবদল করেছেন। এ রদবদল অবস্থার প্রেক্ষাপটে জরুরি ছিল বলেই তিনি করেছেন। বর্তমানেও কোন কোন রাষ্ট্রে মাঝে মাঝে আইনের পরিবর্তন করতে দেখা যায়। আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে যে শরীআত আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে তা কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবতার জন্য উপযোগী। এতে আর কোন রদবদল হবে না। আল্লাহ আর কোন নবী বা রাসূল পাঠাবেন না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষদেরকে আখিরাতে নাজাত পেতে হলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শকেই অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল এর আদর্শ অনুসরণ করতে গেলে নফসের বাধা, শয়তানের বাধা, তাগুতি শক্তির বাধাসহ নানা ধরনের বাধা আসবে। সকল বাধা মোকাবিলা করেই দীনের পথে অটল ও অবিচল থাকতে হবে। তাহলেই আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের

www.pathagar.com

পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত এটা তারই প্রতিফল।" (আহকাফ ঃ ১৩-১৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহকে ইলাহ ও রব হিসেবে স্বীকার করার পর নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হবে। কারণ, ইলাহ ও রব শুধু মৌখিক স্বীকৃতির নাম নয়। ইলাহ ও রব হিসেবে মৌখিক স্বীকৃতির পর এ বিশ্বাসের প্রতিফলন কর্মের মাধ্যমে ঘটাতে হবে। আর কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে গেলেই অবিশ্বাসীদের সাথে টক্কর লাগবে। সে সময় আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা রেখে ঈমানের দাবিতে অটল ও অবিচল থাকতে পারলেই আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। এ থেকে বুঝা যায়, ঈমানের প্রমাণ মিলে আমলের মাধ্যমে। তাই ঈমানের সাথে সাথে আমলে সালেহ করার কথা আল্লাহ বলেছেন।

আমলে সালেহ

একজন ঈমানদারের ঈমানের দাবি কতটুকু খাঁটি তার প্রমাণ কর্মের মাধ্যমে ফুটে উঠে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কর্মহীন ঈমানের কি কোন গুরুত্ব আছে? এ প্রশ্নটি আজকে নতুন নয়। অতীতে এ প্রশ্নের জবাবে কয়েকটি দল বিভ্রান্ত হয়েছে।

মুরজিয়া নামক একদল আছে যাদের মতে ঈমান হল শুধু তাসদিক বিল কালব তথা হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসের নাম। মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঈমানের অপরিহার্য শর্ত নয়। তাই কোন ঈমানদার পাপ করলেও শাস্তিভোগ করতে হবে না। কাররামিয়া সম্প্রদায়ের মতে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি দানই আখিরাতে নাজাতের জন্য যথেষ্ট। অন্তরের গভীর বিশ্বাস বা কর্মে বিশ্বাসের প্রতিফলন জরুরি নয়। খারেজীদের মতে ঈমান হল মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের গভীর বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে ঈমানের দাবি পূরণের নাম। তাদের মতে, যারা আমল করে না তারা দোযখে জ্বলবে। কারণ তারা মনে করে আমল ছেড়ে দেওয়া হল কুফরী।

মুতাযিলাদের মতে, ঈমান অন্তরের গভীর বিশ্বাস, কর্মে বিশ্বাসের প্রতিফলন ও মৌখিক স্বীকৃতির নাম। তবে তাদের আকীদা হল ঈমানদার ব্যক্তি কোন পাপ করলে কাফিরও হয় না, আবার ঈমানদারও থাকে না। পাপী ব্যক্তি কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝি অবস্থান করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, অন্তরের গভীর বিশ্বাস, কর্মে প্রতিফলন ও মৌখিক স্বীকৃতির সমন্বয়ই ঈমান। তবে আমল না করা তথা পাপ কাজ করলে ঈমানহারা হবে না এবং কাফিরও হবে না; বরং ফাসিক হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, অন্তরে গভীর বিশ্বাস না থাকলে মুখে ঈমানের যতই স্বীকৃতি প্রদান করা হোক না কেন, আল্লাহর কাছে সে ঈমানদার হবে না। আল্লাহর কাছে সে মুনাফিক হিসেবেই পরিচিত হবে। তবে মৌখিক স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুনিয়াতে ঈমানদার হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। কার অন্তরে কি লুক্কায়িত আছে মানুষ তা বলতে পারে না। তাই মৌখিক স্বীকৃতির উপর নির্ভর করেই ঈমানদার কিনা তা নির্ধারিত হবে। আর কেউ পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে মুখে স্বীকার না করেও অন্তরে যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাহলে আল্লাহর কাছে সেও ঈমানদার হবে। এক্ষেত্রে নাজ্জাশীর ঘটনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়। নাজ্জাশীর দরবারে জা'ফর ইবনে আবী তালিব (রা) রাসূল (স) প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের মুখ্য বক্তব্য উপস্থাপন করলে নাজ্জাশী মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি পূর্ণাঙ্গ সমর্থন প্রদান করেন এবং জা'ফর (রা)-এর নেতৃত্বে হিজরতকারী অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করেন।

এখন প্রশ্ন হল, আমল কি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম শাফেয়ী ও মুহাদ্দেসীনদের অনেকেই অভিমত পেশ করেন, আমল ঈমানের অংশ। তাঁরা তাদের মতের সমর্থনে কুরআনের সেসব আয়াত উল্লেখ করেন যেখানে ঈমানের সাথে আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আসরে ঈমানের পরপরই আমলের কথা উল্লেখ আছে। আর এ ধরনের উল্লেখ করার সময় 'ওয়াও' তথা হরফে আতফ বা সংযোগকারী অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় আমল ঈমানের অংশ।

ইমাম আবূ হানিফার মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। আমলের মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা সাধিত হয়। ইমাম আবূ হানিফার মতে, আল্লাহ কুরআনে ঈমানের স্থান কলব বলে উল্লেখ করেছেন। আর আমল করতে হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে আমল করার মাধ্যমে ঈমানের দাবির পূর্ণতা সাধিত হয়। এ কারণে যিনি যত বেশি আমল করেন তিনি তত বেশি কামিল ঈমানদার। যেহেতু ইমাম আবূ হানিফার মতে আমল ঈমানের অংশ নয়, তাই তাঁর মতে ঈমানে কম-বেশি হতে পারে না। আর ইমাম শাফেয়ীসহ যারা মনে করেন আমল ঈমানের অংশ তাঁদের মতে ঈমানে কম-বেশি হতে পারে। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে কুরআনের এ আয়াত উল্লেখ করেন, "যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।" (আনফাল ঃ ২)

www.pathagar.com

অনেক হাদীস দ্বারাও তাঁরা প্রমাণ পেশ করেন, যেসব হাদীসে নেক আমল দ্বারা ঈমান বাড়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে। ইমাম আবূ হানিফার অনুসারীরা এর জবাবে বলেন, মৌলিক ঈমানের ক্ষেত্রে কম-বেশি হয় না। তবে ঈমানের পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে কম-বেশি হয়। তাঁদের মতে একেক ধরনের নেক আমলের মাধ্যমে একেক ধরনের নূর বা আলো ঈমানের সাথে যোগ হয়। যিনি যত বেশি আমল করেন তার ঈমানের সাথে তত বেশি নূর বা আলো যোগ হয়। আর আমলের কম বেশির কারণেই জান্নাতে জান্নাতীদের মর্যাদায় কম বা বেশি হয়।[৫৯]

আমল ঈমানের অংশ কিনা এ প্রশ্নে ইমামদের মধ্যে দার্শনিক বা তত্ত্বগত কিছু কথা থাকলেও এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, ঈমানের দাবিই হল আমল। কেউ যদি ঈমান আনার পর আমলে সালেহ না করে তাহলে বুঝতে হবে তার ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা আছে। কোন মানুষ ঈমান আনার পর আমলে সালেহ করার মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হয়, সে ঈমানের খাঁটি দাবিদার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, “যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।” (মায়েদাহ ঃ ৯)

কুরআন ও হাদীসে ঈমানের কথা বলার সাথে সাথে আমলের কথা বলা হয়েছে। তাই যারা ঈমানের দাবিদার তাদেরকে আমলে সালেহ করার মাধ্যমেই আল্লাহ্র প্রতি গভীর বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হল, আমলে সালেহ বলতে কি বুঝায়? আমলে সালেহ বলা হয় সেসব নেক আমলকে যা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয়। শুধু আমল করার কথা আল্লাহ্ বলেননি। আল্লাহ্ আমলের সাথে ‘সালেহ’ শব্দ যোগ করেছেন। এর অর্থ হল সঠিক পদ্ধতিতে যদি আমল করা হয় তাহলেই আমলে সালেহ হবে। আর আমলের জন্য সঠিক পদ্ধতি হল আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাত বা পদ্ধতি। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে ইবাদত বন্দেগী করেছেন আমাদেরকে ঠিক সেই পদ্ধতিতে ইবাদত বন্দেগী করতে হবে। আমরা যদি নেকী হাসিলের জন্য মনগড়া পদ্ধতিতে ইবাদত করি তাহলে নেকী হাসিলের পরিবর্তে গুনাহ হাসিলের সম্ভাবনা আছে। তাই আমাদের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকা সবকিছু আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী করতে হবে। তাহলেই এসব আমল আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হবে। আর এভাবে আমরা যদি আমলে সালেহ করতে পারি তাহলেই আখিরাতে নাজাত পাওয়ার আশা করতে পারি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কোন্ কোন্ আমল করলে আল্লাহ্ অধিক খুশি হন, তা কিভাবে জানা যাবে? আল্লাহ্ এমন দয়ালু ও মেহেরবান সত্তা যিনি তাঁর

www.pathagar.com

বান্দাদেরকে এত বেশি ভালবাসেন, যার কারণে কিতাব নাযিল করে এবং নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর বান্দারা কোন্ ধরনের আমল করলে আল্লাহ্ অধিক খুশি হন। আমরা দুনিয়াতে দেখি, কোন রাজা-বাদশাহ এক দেশ থেকে আরেক দেশে গেলে জানার চেষ্টা করা হয়, তিনি কি খেতে পছন্দ করেন? কি ধরনের জিনিস বেশি পছন্দ করেন? এসব জিনিস জানার পর তাঁর রুচির আলোকে তাঁকে মেহ্মানদারী করা হয় যাতে করে তিনি বেশি খুশি হন। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি এত বেশি অনুকম্পা করেছেন যে, আমরা কি কাজ করলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারব তা আল্লাহ্ আগেই বলে দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসে সে সব আমলের কথা উল্লেখ আছে।

আফসোসের বিষয় হল, দুনিয়াতে কোন রাজা-বাদশাহকে খুশি করার জন্য মানুষ অতিশয় পেরেশান থাকে। কি করলে রাজার নৈকট্য লাভ করা যাবে তা জানার জন্য যত বেশি আগ্রহী থাকে, সে তুলনায় আল্লাহকে খুশি করার জন্য পেরেশানী লক্ষ্য করা যায় না। অথচ একজন মানুষ যদি কাউকে খুশি করার জন্য কিছু করতে হয় প্রথমেই আল্লাহকে খুশি করার জন্য কিছু করা দরকার। আল্লাহর কোন বান্দার উপর যদি আল্লাহ্ রাজি ও খুশি থাকেন, দুনিয়ার সকল রাজা ও বাদশার যদি তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার কিসের ভয়? আল্লাহ্ তো সেই সত্তা যাঁর হাতেই সকল রাজা বাদশাহর ক্ষমতা। যিনি ইচ্ছা করলে কাউকে 'সালতানাত' দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে কারো কাছ থেকে 'সালতানাত' ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাই দুনিয়াতে কোন মানুষকে ভয় করার পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা দরকার। পৃথিবীর কাউকে খুশি করার চেয়ে আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে যেসব আমল করতে বলেছেন তা মৌলিকভাবে দুই প্রকার। কিছু আমল আছে যেগুলো করা বান্দার জন্য বাধ্যতামূলক। এ ধরনের আমলকে ফরয ও ওয়াজিব বলা হয়। এসব আমল না করলে আল্লাহ্ গুনাহ্ দিবেন। আর কিছু আমলের কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে যেসব আমল করলে আল্লাহ্ খুশি হন। কিন্তু এসব আমল না করলে আল্লাহ্ গুনাহ্ দেন না। এ ধরনের আমলকে সুন্নাত বা নফল বলা হয়। ফরয হল সেসব আমল যা আল্লাহ্‌র নির্দেশে করা আবশ্যক। আর ওয়াজিব হল সেসব আমল যা আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে করা আবশ্যক। আর সুন্নাত হল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেসব আমল যা তিনি করেছেন, কিন্তু উম্মতের জন্য ওয়াজিব নয়। কিংবা তাঁর জন্য নির্দিষ্টও নয়। তা পালন করলে সওয়াব আছে; না করলে গুনাহ্ নেই।

www.pathagar.com

ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত পালনে অনেক নেকী

যেসব আমল করা ফরয বা ওয়াজিব তা যদি কেউ পালন করে তাহলে শুধু ফরয বা ওয়াজিব আদায় হয় না, তার সাথে সাথে অনেক নেকীও হাসিল হয়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এমনটিও করতে পারতেন যে, ফরয কাজ সকলকে অবশ্যই করতে হবে এর সাথে আখিরাতের পুরস্কারের সম্পর্ক নেই। আখিরাতে পুরস্কার পেতে হলে ফরয আমলের পর অতিরিক্ত নফল আমল করতে হবে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি অতিশয় দয়াময়-মেহেরবান বলেই ফরয আমল পালনের মধ্যে অনেক সওয়াব হাসিলের সুযোগ রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুত এমন লোকদেরকে আমি দান করব মহাপুণ্য।" (নিসা ঃ ১৬২)

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, রমযানে রোযা রাখ, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ যা নির্দেশ দেন তা পালন কর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরিমিযী) অন্য এক হাদীসে আছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুয়া থেকে আরেক জুমুয়া এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান মধ্যবর্তী সময়কার গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ ।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করা

একজন ব্যক্তিকে মনের গভীরে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর নামায পড়েই তার ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ঈমানদার নর-নারীর উপর ফরয। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে নামায শুধু একাকী পড়তে বলেননি। আল্লাহর বান্দারা যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজের সকলকে নিয়ে নামাযভিত্তিক সমাজ কায়েম করার কথাই আল্লাহ বলেছেন। এ নির্দেশ দিয়েই আল্লাহ্ বলেন, "সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত ফেরেশতাদের উপস্থিতির সময়।" (ইসরা ঃ ৭৮)

আল্লাহ নামাযকে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন, "সকল নামাযের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হও। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও।" (বাকারা ঃ ২৩৮)

www.pathagar.com

এ আয়াতে মধ্যবর্তী সালাত বলতে অনেক মুফাসসিরের মতে আসরের সালাত বুঝানো হয়েছে। আসরের নামাযকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, এ সময় কাজে কর্মে-বেশি ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় মানুষ নামাযের কথা ভুলে যায়। নামায যারা আদায় করে তারা পরস্পরের দীনী ভাই। আল্লাহ এ কথা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন, "অতঃপর যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই।" (তওবা ঃ ১১)

মূলত ইসলামের প্রাসাদ নামাযের বুনিয়াদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত।

ক. এ কথা সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল।

খ. নামায কায়েম করা ....। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ শুধু নামায ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফর মনে করতেন না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি অত্যন্ত যত্নের সাথে নামায আদায় করবে, কিয়ামত দিবসে ঐ নামায তার জন্য আলোকবর্তিকা, প্রমাণ এবং মুক্তির কারণ হবে। আর যে এভাবে যত্নবান হবে না, তার জন্য কোন আলোও থাকবে না এবং সে কোন দলীল-প্রমাণ বা মুক্তিও পাবে না। অধিকন্তু সেই ভয়ংকর কিয়ামতের দিনে সে কারূন, ফিরাউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথে উত্তোলিত হবে।" (আহমদ, দারিমী)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "তোমাদের কারও বাড়িতে যদি নহর থাকে আর দিনে পাঁচবার সে ঐ নহরে গোসল করে, তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, না। তখন তিনি বললেন, তদ্রূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাপরাশিকে মুছে ফেলে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ ধরনের আরো অনেক হাদীস আছে যা থেকে প্রমাণিত হয়, নামাযের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অতি নিকটে পৌঁছে যায়। বিশেষত বান্দা যখন সেজদায় যায়, তখন আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে কোন অন্তরায় থাকে না। বান্দা আল্লাহর কাছে মন খুলে যে দোয়া করে আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেন।

www.pathagar.com

জুমআর নামায

প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ, মুকীম মুসলমানের উপর জুমআর নামায ফরয। জুমআর নামাযের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! জুমআ দিবসে যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত বের হয়ে পড় এবং সমস্ত লেনদেন তখন বন্ধ করে দাও।" (জুমআ ঃ ৯)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমআর নামায জামায়াতসহ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। তবে চার শ্রেণীর উপর এ বাধ্যবাধকতা নেই। ক্রীতদাস, নারী, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও অসুস্থ ব্যক্তি। (মুসলিম)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি সুন্দর করে পাক পবিত্র হয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের জন্য একটি করে পুরস্কার দান করবেন এবং এ কারণে তার মার্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং তাকে অনিষ্টতা ও পাপ থেকে মুক্ত করবেন।" (মুসলিম)

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমআর দিন ও রাতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এমন এক ঘন্টা আছে যাতে ছয় লক্ষ বান্দাকে মাফ করা হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, যাদের প্রত্যেকের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছিল, এমন ছয়লক্ষ বান্দাকে মাফ করা হয়। (বায়হাকী)

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা আর তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে আর তাঁর দাদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা জুমআর দিন মসজিদসমূহে ফেরেশতা পাঠান। তাঁরা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। মসজিদে যারা প্রবেশ করেন তাদের নাম লিখেন। ইমাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তখন লিখা বন্ধ করে দেন। (ইবনে খুযায়মা)

জুমআর ফযিলত বর্ণনা করার সাথে সাথে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেছেন, "যারা বিনা ওযরে তিন জুমআ অনুপস্থিত থাকবে তারা মুনাফিক।"

আল্লাহ চান, আল্লাহর বান্দারা জুমআর জন্য এসে একে অপরের খোঁজ-খবর রাখুক। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে মিলিত হয়ে সুখ-দুঃখের খবর নিয়ে পরস্পরের আরো কাছাকাছি আসুক। আর জুমআর দিনে সমাজের

www.pathagar.com

প্রচলিত সমস্যার আলোকে ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত খুতবার দিক-নির্দেশনার আলোকে একটি সুন্দর মুসলিম সমাজ গড়ে তুলুক। এ কারণেই যোহরের চার রাকাতের পরিবর্তে জুমআর জন্য দু'রাকাত নামায ফরয করেছেন আর খুতবা শুনাকে ওয়াজিব করেছেন। আফসোসের বিষয় হল, অনেক মুসলমান খুতবার সময় কথা বলেন। আবার অনেকে খুতবা শেষে মসজিদে গিয়ে কোন রকমে নামায ধরেন। আবার অনেক ইমাম সাহেব সমাজের বিদ্যমান সমস্যা খুতবায় তুলে ধরে মুসলমানদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার পরিবর্তে অনেক পুরাতন কোন খুতবা বই দেখে পড়ে শুনান। এর ফলে যে টার্গেটে আল্লাহ তাআলা জুমআ ফরয করেছেন তা পুরোপুরি বাস্তিবায়িত হয় না। তাই মসজিদের ইমাম সাহেবগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দানের জন্য সরকারি বা বেসরকারিভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

দুই ঈদের নামায

আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের সবকিছুতে পূত-পবিত্র অনুভূতি পছন্দ করেন। তাই আনন্দ প্রকাশের সময়ও মুসলমানদেরকে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী আনন্দ প্রকাশ করতে হয়। ঈমানদার ব্যক্তিরা বছরে দু'দিন আনন্দ করে। রোযা শেষে ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর সময় তথা ঈদুল আযহা। এ দুই ঈদে মনের আনন্দ লাভের সাথে সাথে আত্মিক আনন্দ লাভের জন্যই ঈদের নামায আদায় করতে হয়। আর এর মধ্য দিয়ে মুসলমানেরা এ কথার স্বীকৃতি দেয়, আনন্দ-বেদনা সবকিছুতে আমরা আল্লাহরই শোকর গুজার করি। কিংবা তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলি। ঈদের দিন শুধু আনন্দ-উৎসবের দিন নয়, এটা সওয়াব হাসিলেরও দিন। অনেক হাদীসে আছে পুরো রমযান মাসে আল্লাহ তাঁর যত বান্দাকে মাফ করেন ঈদের দিন তার সমপরিমাণ বান্দাকে মাফ করেন।

জানাযার নামায

কোন ঈমানদার দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর কাছে চলে গেলে অপর ঈমানদার ব্যক্তিরা তার দাফন, কাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করে। এ ধরনের দায়িত্ব পালন মুসলমানের হক আদায় করার জন্যই প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শুধু অন্যের জানাযা পড়া হয় না। নিজের জানাযার কথাও স্মরণ হয়। আর এ ধরনের স্মরণের মধ্য দিয়ে বান্দাকে আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আল্লাহ জানাযার নামাযকে ফরযে কিফায়াহ করেছেন। এর অর্থ হল, কোন ঈমানদার মারা গেলে অপর কোন ঈমানদার যদি তার জানাযা না পড়ে তাহলে মুসলিম কমিউনিটির সকলেই গুনাহগার হবে। মানুষ দুনিয়াতে বিনা স্বার্থে কোন কাজ

www.pathagar.com

করতে চায় না। তাই আল্লাহ্ প্রত্যেক আমলের সাথে মানুষের স্বার্থ সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। যেমন কেউ কারো জানাযা পড়লে শুধু মৃত মুসলমানের জন্য দোয়া করা হয় না, নিজেরও অনেক সওয়াব হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে উপস্থিত হবে, সে এক কীরাত সওয়াব পাবে। আর যে দাফন পর্যন্ত থাকবে, সে দু'কীরাত পাবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় দু'কীরাত কি? তিনি জবাব দেন দু'কীরাত দুটি বড় পাহাড়ের মত। (বুখারী ও মুসলিম)

নামাযের সাথে সম্পৃক্ত আমলেও সওয়াব আছে

নামায আদায় করার সাথে আরো কতিপয় আমল জড়িত। এসব আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা সওয়াবের আরো সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমন ঃ

অযু

নামাযের জন্য অযু করা ফরয। যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাসের পবিত্রতার সাথে কর্মের পবিত্রতা আল্লাহ্ কামনা করেন। আর তারা যে কাজ করবে তা পবিত্র অবস্থায় পবিত্র নিয়তে করবে, এটাই আল্লাহ্ চান। এ কারণে আল্লাহ্ নামায ফরয করার সাথে সাথে নামাযের জন্য অযুকেও ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেহেতু নামাযের জন্য বান্দা অযু করছে তাই শুধু নামাযের সওয়াব দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা করেননি। আল্লাহ্ নামাযের সওয়াব যেমনি দিবেন, তেমনি অযু করার সওয়াবও দান করবেন। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "কেউ যদি উত্তমভাবে অযু করে তার পাপ (ছগীরা গুনাহ) অযুর পানির সাথে ঝরে যায়।" হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতদেরকে অযুর চিহ্নের মাধ্যমেই চিনবেন। অযুর স্থানসমূহ হাশরের ময়দানে চিকচিক করতে থাকবে।

মেসওয়াক

মেসওয়াক করা সুন্নত। এতে অনেক নেকী আছে। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "চারটি বিষয় সব নবীরই সুন্নাত। তা হল ঃ খতনা করা, আতর লাগানো, মেসওয়াক করা ও বিবাহ করা।" (তিরমিযী)

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মেসওয়াক করে নামায আদায় করলে মেসওয়াক ছাড়া আদায় করার চেয়ে সত্তরগুণ বেশি সওয়াব আল্লাহ্ দান করবেন।" (তারগীব ওয়াত তারহীব)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি মেসওয়াকসহ দু'রাকাত নামায আদায় করাকে মেসওয়াকবিহীন সত্তর রাকাত আদায় করার চেয়ে অধিক ভালবাসি।" (তারগীব ওয়াত তারহীব)

মেসওয়াকের মাধ্যমে দাঁত পরিষ্কার থাকে। মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। এর পাশাপাশি অনেক নেকী হাসিল হয়। মেসওয়াকের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, সাহাবীদের কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন হয়তবা এটা ফরয করে দেওয়া হবে। যেসব বান্দা মেসওয়াক করে না, তাদের পাশে অন্য কেউ বসলে দুর্গন্ধে কষ্ট পায়। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াকের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

জুমআর নামাযের জন্য গোসল করা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের জন্য গোসল করবে আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।" হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন জুমআর জন্য গোসল করে, মাথা ধৌত করে, অতঃপর সুগন্ধি লাগায় এবং ভাল পোশাক পরিধান করে, তারপর ঘর থেকে বের হয় এবং কারো সাথে খারাপ আচরণ করে না। তারপর মসজিদে গিয়ে ইমামের খুতবা শুনে। তার এক জুমআ থেকে আরেক জুমআর মধ্যবর্তী সময়ের এবং আরো অতিরিক্ত তিনদিনের গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করে দেন।" (ইবনে খুযায়মা)

তাহিয়্যাতুল অযুর সালাত

অযু করার পর দু'রাকাত নফল নামায পড়াও সুন্নাত। এটাকে বলে তাহিয়্যাতুল অযুর সালাত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের নামায আদায় করতেন। কেউ যদি নিয়মিত অযুর পর দু'রাকাত সুন্নাত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে আল্লাহ্ তার সেই বান্দার উপর খুবই খুশি হন। হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি সুন্দর করে অযু করবে এবং তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাকাত বা চার রাকাত নামায সুন্দর করে রুকু করে বিনয়ের সাথে আদায় করবে তারপর ইস্‌তিগফার করবে, আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।" (তারগীব ওয়াত তারহীব)

আরেক হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি সুন্দর করে অযু করবে এবং নিবিষ্ট চিত্তে দু'রাকাত নামায পড়বে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" (ইবনে মাজাহ্)

আযান

আযান মানে নামাযের জন্য আহ্বান জানানো। এটা খুবই সওয়াবের কাজ। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাঁর নির্দেশ পালনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দেয় আল্লাহ্ তাকে দোযখের আগুন থেকে নাজাত দিবেন।" (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুয়ায্যিনের আযানের আওয়াজ যতটুকু যায় এর মধ্যে যত উদ্ভিদ আছে সব উদ্ভিদই আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আযান প্রদানকারীর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে।" (তারগীব ওয়াত তারহীব)

অন্য এক হাদীস থেকে জানা যায়, "মুয়ায্যিনের আযান শুনে যত লোক নামায পড়তে আসে প্রত্যেকে নামায পড়ে যে সওয়াব পাবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব আযান দানকারী পাবে।" (নাসাঈ)

আরেক হাদীস থেকে জানা যায়, "মুয়য্যিন যখন আযান দেয়, তখন শয়তান পলায়ন করে। আযান যখন শেষ করে তখন আবার আসে। আবার ইকামত যখন দেয় তখন চলে যায়। কিন্তু নামায শুরু হবার পর আবার এসে নামাযীকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করে।"

এখন প্রশ্ন হতে পারে, একটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য একজনই শুধু আযান দেওয়ার সুযোগ পায়। তাহলে সওয়াব তো শুধু একজনই পাবে। এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান শুনার পর আযানের জবাব দিতেন। আযানের বাস্তব সওয়াব নামায পড়ায়। পড়ার আগে মৌখিক জবাব দানের মধ্যেও অনেক সওয়াব আছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুয়ায্যিনের অনুরূপ তোমরাও বলবে।" এর ফযিলত সম্পর্কিত হাদীস থেকে জানা যায়, যারা খালেস নিয়তে আযানের জওয়াব দান করবে আল্লাহ্

www.pathagar.com

তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাই আমাদেরকে আযান দেওয়া বা আযান শুনলে জওয়াব দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যারা কোন কারণে মসজিদে আসার সুযোগ পান না। যেমন পাশ্চাত্যের অনেক দেশে মসজিদ অনেক দূরে। তারা ঘরে ফরয নামায আদায়ের আগে নিজেরা আযান দিয়ে অনেক নেকী হাসিল করতে পারেন।

আযানের দোয়া

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনার পর 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি আদ দাওয়াতিদ্ তামাতি ওয়াসত্ সালা তিল কায়িমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযিলাতা, ওয়াবআছহু মাকামাম, মাহমুদা আল্লাযি ওয়াদতাহ' দোয়া পড়বে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়।" (ইবনে মাজাহ)

ইকামাত

আযান দেওয়ার মধ্যে যেমনি সওয়াব আছে, তেমনি ইকামতের মধ্যেও সওয়াব আছে। হযরত সাহল ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন দুটি মুহূর্ত আছে যখন বান্দা যে দোয়া করে তা ব্যর্থ হয় না। তার একটি হল ইকামত দেওয়ার সময় দোয়া আর অপর মুহূর্ত হল আল্লাহর পথে মুজাহিদরা জিহাদ করার জন্য যখন দণ্ডায়মান হয় সে সময়ের দোয়া।" (ইবনে হাব্বান)

আযানের মত ইকামতেরও অনেক ফযিলতের বর্ণনা হাদীসে আছে। তাই জানাযা ও দুই ঈদের নামায ছাড়া ফরয সব নামাযই আযান ও ইকামত দিয়েই আদায় করার চেষ্টা করা দরকার।

জামাআতের সাথে সালাত আদায়

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে একাকী নামায আদায় করার কথা বলেননি। জামাআতের সাথে নামায আদায় করার দিকে ইঙ্গিত দিয়েই আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর।" (বাকারা ঃ ৪৩)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করার প্রতি আল্লাহ উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাতে নামায পড়লে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

জামাতে নামায আদায় প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "আমাদের যুগে প্রসিদ্ধ মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামাতে নামায আদায় করা থেকে দূরে থাকতো না। অক্ষম ব্যক্তিদেরকে দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে জামাতে আসতে দেখা যেতো এবং তাদেরকে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত।" (মুসলিম)

জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ফযিলতের বর্ণনা অনেক হাদীসে আছে। তবে মহিলাদের জন্য মসজিদে নামায পড়া বৈধ হলেও ঘরে পড়াকেই উলামায়ে কেরাম উত্তম মনে করেন।

নামাযের পর আল্লাহর কাছে দোয়া করা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দোয়া করতে বলেছেন। তিনি ফরয নামায শেষে অনেক সময় বসে বসে দোয়া পড়তেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, তোমরা বেশি বেশি দোয়া কর। ফরয নামাযের পর যে দোয়া করা হয়, আল্লাহ তা কবুল করেন। ফরয নামাযের পর আনুষ্ঠানিকভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা বা না করা নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে সকলে একমত যে, ফরয নামায শেষে দোয়া করা মুস্তাহাব। যে সময়গুলোতে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন বলে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তার মধ্যে ফরয নামায শেষে দোয়া করার বিষয়টি অন্যতম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "যখন তোমরা নামায শেষ করবে তখন দোয়াতে মশগুল হও।" রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ এবং অনেকবার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়তেন। তিনি নামায শেষে আয়াতুল কুরসী পড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কিছুসংখ্যক দোয়া সবসময় পাঠ করতেন। যেমন "রাব্বানা আতিনা ফীদ্দুনিয়া হাসনাতান ওয়া ফীল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান নার" প্রায়ই পড়তেন। আর কখনও একেক নামায শেষে একেক ধরনের দোয়া পড়তেন।[৬০]

যেমন মাগরিবের নামায শেষে "আল্লাহুম্মা আযিরনা মিনান নার" পড়ার কথা কোন কোন হাদীসে উল্লেখ আছে।

ফরয রোযা পালন করা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দুনিয়াতে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের অর্থ হল, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নিজেরা চলার সাথে সাথে দুনিয়ার যাবতীয় উপায় উপকরণ, সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোকে

www.pathagar.com

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা। একজন ব্যক্তির পক্ষে নিজে সততার সাথে জীবন-যাপন করা সহজ। সে তুলনায় সমাজকে সততার সাথে পরিচালনা করা অনেক কঠিন। মানুষ যেন সততা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দুনিয়াকে পরিচালনা করতে পারে, এ জন্য আল্লাহ্ রমযানের রোযা ফরয করেছেন তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দানের জন্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায় তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারবে।" (বাকারা ঃ ১৮৩)

তাকওয়ার প্রশিক্ষণ নিয়ে সমাজ পরিচালনা করার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা রমযানে আল কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, রমযান সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। যে কুরআন মানব জাতির পথপ্রদর্শক এবং সঠিক পথের নিদর্শনসমূহ যাতে প্রদত্ত হয়েছে। যা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী। (বাকারা ঃ ১৮৫)

একজন ঈমানদার কুরআনের আলোকে সমাজ পরিচালনা করতে গেলে শয়তানের পক্ষ থেকে বাধা আসবে। শয়তানী শক্তি হামলা করবে, আক্রমণ করবে। এমতাবস্থায় একজন ঈমানদার আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক ছাড়া শুধু বৈষয়িক শক্তি দিয়ে শয়তানী শক্তির বাধা মোকাবিলা করতে পারবে না। তাই আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যই এ মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোন সমাজ আল্লাহর বিধান মত পরিচালিত হবার অর্থ হল, সমাজের মানুষগুলোর নৈতিক উন্নতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে। এ কারণেই রমযানে রোযা রাখার পরও তারাবীহর নামায পড়তে হয়। যাতে মানুষের মধ্যে পরিশ্রমের অভ্যাস গড়ে উঠে। যে সমাজ আল্লাহর বিধানের আলোকে পরিচালিত হয় সে সমাজের মানুষের মধ্যে সংঘাত-সহিংসতার পরিবর্তে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয়। এ ধরনের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যই বলা হয়েছে, কেউ যদি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, তাহলে রোযাদার রোযা রেখে যে সওয়াব পাবে সমপরিমাণ সওয়াব যে ইফতার করাবে তাকেও দেওয়া হবে। এতে কারো সওয়াবে কোন কমতি হবে না।

মানুষকে তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রোযা ফরয করা হলেও যিনি রোযা রাখবেন আল্লাহ্ তাকে অনেক সওয়াব দান করবেন। যেমন এক হাদীসে এসেছে, "রমযান মাসে নফল পালন করলে অন্য মাসে ফরয পালনের মত সওয়াব আল্লাহ্ দান করবেন। এ মাসে একটি ফরয অন্য মাসে

www.pathagar.com

সত্তরটি ফরয আদায়ের সমান।" বেহেশতের আটটি দরজা আছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়ান'। এ দরজা দিয়ে রোযাদাররাই প্রবেশ করবে। অপর এক হাদীসে আছে, "কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য রোযা আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবে।"

আরেক হাদীসে এসেছে, "যারা রোযা রাখবে তাদের পুরস্কার আল্লাহ্ নিজেই দান করবেন।" এভাবে আরো অনেক হাদীস আছে, যার মধ্যে রোযার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। আফসোসের বিষয় হল, এত ফযিলতের পরও কোন কোন মুসলমান রোযা পালন করা থেকে বিরত থাকেন। এটা মারাত্মক গুনাহ্।

রোযার সাথে সম্পৃক্ত আমলেও সওয়াব আছে

রোযা পালনের মাধ্যমে একজন ঈমানদার যেন আরো অনেক সওয়াব অর্জন করতে পারে আল্লাহ্ তাআলা সে পথও সুগম করে রেখেছেন। যেমন ঃ

ইফতার

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোযাদারের জন্য দুটি খুশি; একটি ইফতারের সময় আরেকটি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের সময়।"

অপর এক হাদীসে আছে, "রোযাদার ইফতারের আগ মুহূর্তে আল্লাহ্‌র কাছে যে দোয়া করে, আল্লাহ্ তা কবুল করেন।" একজন রোযাদার রোযা পালন শেষে তাকে রোযা ভঙ্গ করতেই হবে। তবে এ রোযা ভঙ্গ করার মধ্যেও আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দাদের জন্য সওয়াবের ব্যবস্থা রেখেছেন। এমনকি কেউ ইফতারের সময় হবার সাথে সাথে রোযা ভঙ্গ করলে তার জন্য সে অধিক সওয়াব পাবে। কেননা ইফতারের সময়ের সাথে সাথেই ইফতার করা আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাত। আর ইফতার করার সময় খেজুর অথবা পানি দ্বারা রোযা ভঙ্গ করা আরেক সুন্নাত।

কাউকে ইফতার করানো

একজন রোযাদারকে ইফতার করানোর মধ্যে অনেক সওয়াব। এভাবে কেউ কাউকে ইফতার করানোর মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর হয় আবার অনেক নেকীও হাসিল হয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি কাউকে ইফতার করায় তাহলে রোযাদার রোযা রেখে যে সওয়াব পাবে, ইফতার করানোর কারণে তাঁকেও অনুরূপ সওয়াব দান করা হবে। তবে রোযাদারের সওয়াবে এতে কোন কমতি হবে না।

www.pathagar.com

সাহ্‌রি

আল্লাহ্ চান তাঁর বান্দারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলুক। শুধু ক্ষুধার্ত থাকাই যদি ইবাদত হত তাহলে সাহরী না খেয়ে, ইফতার না করে, যে যত বেশি সময় উপবাস থাকে তাকে তত বেশি সওয়াব দেওয়া হত। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাওমে বিসাল' তথা ইফতার ছাড়া বিরতিহীন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। আর ইফতার করার মধ্যে যেমনি সওয়াব রেখেছেন তেমনি সাহরি খাওয়ার মধ্যেও সওয়াবের কথা বলেছেন। তবে ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি করা সুন্নাত কিন্তু সাহরি সময় শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে অর্থাৎ বিলম্বে খাওয়া সুন্নাত।

তারাবীহ্

রোযাদার সারাদিন রোযা শেষে রাতে বিশ্রাম নেওয়ার কথা। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর সেসব বান্দার উপর খুশি হন যারা দিনের রোযা শেষে রাতে বেশি বেশি ইবাদত করে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে এশার নামায শেষে বিতর নামাযের আগে তারাবীহর নামায পড়েছেন। কারো কারো মতে আট রাকাত আর কারো মতে বার রাকাত, কারো মতে বিশ রাকাত এবং কারো মতে আটত্রিশ রাকাত পড়া সুন্নাত। এভাবে আরো বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সময় থেকে তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাকাত জামাআতের সাথে পড়া চালু হয়। এ কারণে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বিশ রাকাত আদায় করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

বেশি বেশি নফল ইবাদত ও যিকর-আযকার করা

সবসময় নফল ইবাদত ও যিকির-আযকার করলে সওয়াব আছে। কিন্তু রমযানে আরো বেশি সওয়াব। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযানে নফল ইবাদত করলে অন্য সময় ফরয ইবাদত করার সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ্ পাক দান করবেন। এ কারণে একজন ঈমানদার দিনের বেলা রোযা রাখার পর রাতে কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামাযসহ তাসবীহ্ তাহ্‌লীল করে সময় কাটানোর চেষ্টা করেন।

ই'তিকাফ করা

রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আল কিফায়াহ্। রোযা ফরয হবার পর থেকেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এক বছর বিশেষ কারণে ই'তিকাফ করতে পারেননি। তাই পরের বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর কোন বান্দা যখন দুনিয়াবী কারবার ও ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কোন মসজিদে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে, আল্লাহ তাঁর সে বান্দার প্রতি খুশি হন। হযরত আলী ইবনে হুসাঈন (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ পালন করবে আল্লাহ তাকে দুটো হজ্জ ও দুটো উমরার সওয়াব দান করবেন।" (বায়হাকী)

লাইলাতুল কদর

আল্লাহ তাআলা লাইলাতুল কদরেই মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই আমরা এ কুরআনকে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি। তুমি কি জান লাইলাতুল কদর কি? তা হল এমন এক রাত যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।" (আল কদর)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার করার তাগিদ দিয়ে বলেন, "যখন লাইলাতুল কদর আসে, তখন জিবরাঈল (আ) অন্যান্য ফেরেশতাগণকে সাথে নিয়ে জমিনে নেমে আসেন এবং যেসব বান্দা দাঁড়িয়ে, বসে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল থাকে তাদের জন্য ফজর অবধি আশিস কামনা করতে থাকেন।" (বায়হাকী)

এখন প্রশ্ন হল, লাইলাতুল কদর রমযানের কোন্ রাত? এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।" (বুখারী)

এ ধরনের আরো অনেক হাদীস আছে, যা থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহর রাসূল লাইলাতুল কদর কোন্ রাতে তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। এ না বলার মধ্যেও কল্যাণ আছে। কারণ যদি এক রাতের কথা সুস্পষ্ট করে বলতেন তাহলে মানুষ শুধু ঐ রাতেই ইবাদত করত এবং মনে করত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাতে তো ইবাদত করে ফেলেছি। আর বেশি ইবাদত করার দরকার নেই। কিন্তু রাতটি নির্দিষ্ট না থাকার কারণে মানুষ রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় পাঁচ রাত অন্তত বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করার চেষ্টা করে। তারপরও এর মধ্যে কোন রাত লাইলাতুল কদর ছিল তা সুনির্দিষ্ট করে না জানার কারণে ইবাদত থেকে গাফেল থাকা বা মনে অহংকার আসার সুযোগ নেই।

সদকাতুল ফিতর আদায় করা

আল্লাহ চান সকল ঈমানদার বান্দাহ এক সাথে ঈদের খুশি উদ্‌যাপন করুক। যারা অভাবী, যাদের কাছে ঈদের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার সামর্থ্য নেই,

www.pathagar.com

তাদের যেন ঈদের দিন মন খারাপ করে থাকতে না হয় এজন্য যে বছর রোযা ফরয করা হয় ঠিক একই বছর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়। সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে ঈদের দু'একদিন আগে সদকাতুল ফিতর দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যেন গরীব মানুষেরা তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানোর চিন্তামুক্ত হয়ে ঈদের আগ থেকেই ঈদের খুশি অনুভব করতে পারে। যদি কোন কারণে ঈদের আগের দিন সদকাতুল ফিতর দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে ঈদের দিন নামাযে যাওয়ার আগেই দেওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যাদের পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের পর ঈদের দিন ভোরে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাদের উপর যাকাত ফরয হোক, বা না হোক সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব।

এভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, রমযানের রোযা পালনের সাথে শুধু রোযার সওয়াব জড়িত নয়, আরো অনেক সওয়াব হাসিলের পথ সুগম করে দেওয়া হয়েছে। নেকী হাসিলের এত পথ সুগম করার পরও যারা নেকী হাসিল করতে পারে না, যারা আল্লাহর কাছে ধরা না দিয়ে অলসতায় কিংবা পাপ কাজে সময় ব্যয় করে, তাদের জন্য দুঃখ করা ছাড়া আর করার কি আছে?

ফরয হজ্জ আদায় করা

হজ্জ ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ। সামর্থ্যবান, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ, জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম নর-নারীর উপর পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকলে হজ্জ ফরয। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবার শক্তি-সামর্থ্য যে রাখে সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরের আচরণ করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্বপ্রকৃতির উপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন।" (আলে ইমরান ঃ ৯৭)

এটা এমন এক ইবাদত যার মাধ্যমে দৈহিক ও আর্থিক উভয় ধরনের ইবাদত পালন করা হয়। তামাম পৃথিবী থেকে ঈমানদার নর-নারী 'লাব্বাইক আলাহুম্মা লাব্বাইক' অর্থাৎ হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। শ্লোগান দিতে দিতে বায়তুল্লাহর দিকে ছুটে যায়। সকলের মধ্যে ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চলের পার্থক্য হওয়ার পরও সকলেই একই ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করছে। সকলের পরিধানে সেলাইবিহীন ইহরামের কাপড়। এ কি মধুর পরিবেশ! এ কি মধুর আমেজ! এ কি মধুর শ্লোগান! একেক দেশের লোকজনের একেক ধরনের ভাষা হলেও সবাই একই আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য এসেছে।

আর এ নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সবাই একই রাসূলকে অনুসরণ করছে। এ সময় আল্লাহর কাছে মনের আকুতি জানিয়ে একই কুরআন থেকে তিলাওয়াত

www.pathagar.com

করছে। ভাষার পার্থক্য, বর্ণের পার্থক্য সত্ত্বেও আদর্শের কোন পার্থক্য নেই। সবাই ইসলামী আদর্শের অনুসারী। তারা একই সময় একই পদ্ধতিতে হজ্জের আহকাম পালনের মধ্য দিয়ে ইসলামী আদর্শ দুনিয়াতে কায়েমের প্রেরণা লাভ করছে। তাদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা মজবুত করছে।

হজ্জ শুধু মুসলমানদের বিশ্ব সম্মেলন নয়; সওয়াব হাসিল ও মাগফিরাত লাভেরও অন্যতম সুযোগ। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করল কিন্তু কোন অশ্লীল যৌনক্রিয়া করল না এবং আল্লাহর নাফরমানীর কোন কাজ করল না, তাহলে সে গুনাহ্ থেকে এমনভাবে পাক-সাফ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল যেন সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হল। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে এসেছে, মাবরূর হজ্জের প্রতিদান হল জান্নাত। হযরত আবূ যর (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর কাছে আরজ করে বললেন, পরওয়ারদিগার! যে বান্দা তোমার ঘর যিয়ারত করতে আসবে তাকে কি প্রতিদান দেওয়া হবে? আল্লাহ বলেন, হে দাউদ! সে আমার মেহমান। তার অধিকার হল এই যে, দুনিয়াতে তার ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেই এবং আখিরাতে যখন সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তাকে আমি আমার রহমত দিয়ে ধন্য করি।"

আরেক হাদীসে আছে, "তোমরা হজ্জ কর। কেননা হজ্জ এমনভাবে আমলনামা থেকে গুনাহ মুছে ফেলে যেমনিভাবে পানি দ্বারা ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়।" (তিবরানী)

অপর এক হাদীসে আছে, "কেউ যদি হজ্জ করতে যাওয়ার সময় বা হজ্জ করে ফেরার সময় মারা যায় আল্লাহ তাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।" এভাবে হজ্জের অনেক ফযিলতের কথা হাদীসে আছে। অবশ্য এসব ফযিলত তিনিই পাবেন, আল্লাহর কাছে যার হজ্জ কবুল হবে।

হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত আমলেও সওয়াব আছে

হজ্জের সাথেও আরো অনেক আমল সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ তাআলা এসব আমলের মাধ্যমে অনেক সওয়াব হাসিলের সুযোগ করে দিয়েছেন ঃ

অর্থব্যয়

হজ্জ করতে হলে অনেক অর্থ খরচ করতে হয়। হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করেন, "জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মত হজ্জ করার জন্য যেসব অর্থ ব্যয় হয় আল্লাহ এ অর্থ ব্যয়ের প্রতিদান সাতশত গুণ বাড়িয়ে দিবেন।" (বায়হাকী)

www.pathagar.com

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যারা হজ্জ করতে যায় তারা আল্লাহর মেহমান। তারা যা চায় আল্লাহ্ তা দেন। তারা যা দোয়া করে আল্লাহ্ তা কবুল করেন। আর তারা হজ্জের সময় যা খরচ করে আল্লাহ্ তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার প্রতিদান দান করেন।"

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! এবার একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ্ আমাদিগকে আখিরাতে নাজাতের জন্য কত সুযোগ দিচ্ছেন। যাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে তারা হজ্জ করতে গিয়ে নিজেরা যা খাবে, চলাফেরা করতে খরচ করবে সব কিছুর জন্য আল্লাহ্ সওয়াব দিবেন। আর এ সওয়াব তিনি অনেকগুণ বাড়িয়ে দিবেন। সামর্থ্য থাকার পরও যারা হজ্জ করতে না গিয়ে ব্যাংকে টাকা জমা করে রাখেন, তাদের চিন্তা করা দরকার ব্যাংকের জমা টাকা আখিরাতে কোন কাজে আসবে কি?

ইহ্রাম ও তালবিয়া

হাজীগণ তালবিয়া পাঠ করেই ইহ্রাম শুরু করেন। হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার কাছে জিবরাঈল এসেছে অতঃপর বলেছে, আপনার সঙ্গী সাথীদের উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে বলেন, কেননা এটা হজ্জের নিদর্শন।" (ইবনে মাজাহ্)

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তালবিয়া পাঠ করা হয় তখন তালবিয়া পাঠকারীর ডান, বাম দিকের পাথর, গাছ ও মাটি তার সাথে তালবিয়া পড়তে থাকে। একজন হজ্জ্ব আদায়কারী যখন তালবিয়া পাঠ করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের প্রকাশ করে, তখন আল্লাহ্ খুব খুশি হন।

ইহ্রামের আগে নামায

দু'রাকাত নামায পড়ে ইহ্রাম বাঁধা সুন্নাত। এ দু'রাকাত নামাযের অনেক ফযিলত আছে। এ নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরূন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব।

তাওয়াফ

যিনি হজ্জ করতে যান তিনি ফরয তাওয়াফসহ আরো অনেক তাওয়াফ করেন। আল্লাহ্ তাআলা নিজেই তাঁর ঘর প্রদক্ষিণ করার কথা বলেছেন। তিনি কুরআনে ইরশাদ করেন, "এ প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করতে হবে।" (হজ্জ ঃ ২৬)

www.pathagar.com

তাওয়াফের মধ্যে অনেক সওয়াব আছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তাওয়াফ করার জন্য পা উপরে উঠায় তার পা নিচে নামানোর আগেই আল্লাহ্ তাআলা তার আমলনামায় দশ নেকী লিখে দেন এবং প্রত্যেক কদমের পরিবর্তে দশটি গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করে দেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।" (আহমদ)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি পঞ্চাশবার তাওয়াফ করবে সে সদ্যপ্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে।" (তিরমিযী)

তাওয়াফের প্রথম চার চক্করে রমল করা অর্থাৎ কাঁধ হেলিয়ে-দুলিয়ে চলাতেও সওয়াব আছে। এতে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য প্রকাশিত হয়।

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করা

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর ফযিলত সম্পর্কে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে (তথা হাজরে আসওয়াদকে) জীবন দান করে উঠাবেন। তার দুটি চোখ হবে যা দিয়ে সে দেখবে। তার মুখ হবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। যেসব বান্দা তার ইস্তিলাম (চুমু প্রদান) করবে তার সপক্ষে সে সাক্ষ্য দেবে।" (ইবনে মাজাহ্)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে যখন জমিনে অবতীর্ণ হয় তখন সাদা ছিল। বনী আদমের পাপই তাকে কালো বানিয়ে ফেলেছে।" (তিরমিযী)

আরেক হাদীসে আছে, "হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাসেহ পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়।" এভাবে আরো অনেক হাদীস আছে।

মাকামে ইব্রাহীমে দু' রাকাত নামায

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন, "আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে এবং দু' রাকাত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তাকে একটি গোলাম মুক্ত করার সওয়াব দান করবেন।"

সাফা ও মারওয়ায় সায়ী বা দৌড়ানো

হাজী সাহেবগণ সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করেন। হজ্জ বা উমরা করার জন্য যারা যান তাদেরকে সায়ী করতে হয়। এখানে সায়ী করার সময় ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মনের আকুতি জানাতে পারেন। এখানে নিজের জন্য ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য দোয়া করা যায়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থানকেও দোয়া কবুলের স্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

আরাফাতের ময়দানে বিশেষ ক্ষমা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিকট আরাফাতের দিন সকল দিন থেকে উত্তম। এ দিন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে নিজে হাজী বান্দাদের জন্য গৌরব প্রকাশ করে বলেন, তোমরা দেখো! আমার বান্দা প্রচণ্ড রৌদ্রে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বহু দূর থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছে। তারা আমার রহমতের আশায় এখানে উপস্থিত হয়েছে। বস্তুত তারা আমার আযাব দেখেনি। এ ধরনের গৌরব প্রকাশের পর আল্লাহ তার বান্দাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রেহাই দেওয়ার হুকুম দেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ আরাফাতের দিন এত লোককে মাফ করেন যে, তৎপরিমাণ লোককে আর কোনদিন মাফ করেন না। এরপর তিনি ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলেন, হে ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" (ইবনে হাব্বান)

রামী বা পাথর নিক্ষেপ

হাজী সাহেবগণকে মীনায় তিনটি স্তম্ভ লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। এটা ওয়াজিব। হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন শিশুপুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন শয়তান পথিমধ্যে সন্তানের মায়ার দোহাই দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল। তখন তিনি পাথর নিক্ষেপ করে শয়তানকে দূর করে দেন। এই ইতিহাসকে স্মরণ করে হাজী সাহেবগণ সবসময় যেন শয়তানের বিরুদ্ধে সজাগ ও সচেতন থাকেন সেই অনুভূতি সৃষ্টির জন্যই পাথর নিক্ষেপ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আবরাহা বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় এ স্থানে পৌঁছলে আল্লাহ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। ক্ষুদ্র আবাবিল পাখির পাথর নিক্ষেপে আবরাহার বিশাল বাহিনীর অধিকাংশই পথে পথে মারা যায়। এভাবে আল্লাহ তাআলা আবরাহার দুরভিসন্ধি নির্মূল করে দেন। এ ঘটনাকে স্মরণ করেই মীনাতে পাথর নিক্ষেপ করার মাধ্যমে হাজী সাহেবগণ ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। আর তাঁদের মধ্যে এ বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয় যে, যেই আল্লাহ আবরাহার বিশাল বাহিনীকে ক্ষুদ্র আবাবিল পাখি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন, আজকেও তিনি ইসলামবিরোধীদের নির্মূল করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

পাথর নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে উল্লিখিত অনুভূতিকে শাণিত করার পাশাপাশি অনেক সওয়াবও অর্জিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, প্রতিটি ছোট ছোট পাথর কণা বড় বড় গুনাহ মুছে দেয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যার পাথর নিক্ষেপকে কবুল করেন তা ফেরেশতারা উঠিয়ে নেন। যদি ফেরেশতারা না উঠাতো তাহলে সেখানে পাথরের বড় একটি পাহাড় হয়ে যেতো।" (তিবরানী)

মুযদালিফায় রাত্রি যাপন

আরাফাতের ময়দান থেকে হাজী সাহেবগণকে মুযদালিফায় যেতে হয়। মুযদালিফায় রাত যাপন ওয়াজিব। এখানে রাত যাপনের মধ্যেই অনেক সওয়াব। মুযদালিফায় এসে খোলা আকাশের নিচে রাতে ঘুমানোর সময় আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য নিশ্চয় হাজী সাহেবগণের মনে দোলা দেয়। হাজী সাহেবগণ মুযদালিফায় সমবেত হয়ে আল্লাহর গুণকীর্তন করাকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। এখান থেকে যাওয়ার সময় মীনায় পাথর নিক্ষেপ করার জন্য পাথর নেওয়াও সওয়াবের কাজ।

মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা

হাজী সাহেবগণ ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডন করেন বা চুল ছোট করেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুযায়ী মাথা মুণ্ডন করাতেই সওয়াব বেশি। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীর জন্য তিনবার মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। আর যে চুল ছোট করে তার জন্য একবার মাগফিরাতের দোয়া করেছেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! একটু লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি কত দয়াশীল যে, তিনি বান্দাকে হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্য যেমনিভাবে সওয়াব দিবেন তেমনিভাবে ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও সওয়াব দিবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আনসারীকে বললেন, "তোমার চুল হলক বা মুণ্ডন করার সময় যতটি চুল পড়ে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি চুলের জন্য একটি নেকী দান করবেন এবং একটি গুনাহ মাফ করে দিবেন।" এবার আরেকটু ভাবুন, শুধু

www.pathagar.com

নেকী দেওয়াই তো আল্লাহর জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি বান্দার প্রতি মেহেরবান বলেই নেকী দেওয়ার সাথে সাথে গুনাহও মাফ করে দিবেন। ফলে একজন বান্দার নেকী বাড়ার সাথে সাথে পাপ অনেক কমে যায়।

কুরবানী

কুরবানী শব্দের অর্থ নৈকট্য লাভ। আর এ নৈকট্য লাভের জন্য লোভ, লালসা, কামনা-বাসনাসহ প্রয়োজনে প্রিয় বস্তু ত্যাগ করা প্রয়োজন। আল্লাহর যে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে ইচ্ছুক তাকে তার সবকিছু ত্যাগ করে হলেও আল্লাহকে খুশি করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। হযরত ইব্রাহীম (আ) তার প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কারণেই আল্লাহ তাঁকে খলীলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর একান্ত বন্ধুরূপে ঘোষণা করেছেন। আমাদেরকেও আল্লাহকে খুশি করার জন্য প্রয়োজন হলে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কুরবানী করতে হবে। এমনকি যদি আমাদের জীবন কুরবান করতে হয় তাহলে আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য জীবন কুরবান করতে হবে। এ ধরনের মানসিক শক্তি যদি আমাদের থাকে তাহলেই আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারব।

গোটা বিশ্বের সামর্থ্যবান মুসলমানরা যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ বা তার পরবর্তী তিনদিন কুরবানী করে। সাধারণত দশ তারিখেই সকলে কুরবানী করে থাকেন। হাজী সাহেবগণের কুরবানীও মীনার অদূরে দেওয়া হয়। যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ পশু কুরবানীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করা হয় বলে এদিনকে 'ইয়াওম আন নাহর' বা নহরের দিনও বলা হয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে বললেন, "ফাতেমা! তোমার কুরবানীর পশুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকো। এ কারণে যে, কুরবানীর পশুর যে রক্ত মাটিতে পড়বে তার বদলায় আল্লাহ তোমার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। এ কথা শুনার পর হযরত ফাতেমা প্রশ্ন করলেন, এ সুসংবাদ কি শুধু আহলে বায়তের জন্য না সকল উম্মতের জন্য? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, আহলে বায়ত ও সকল উম্মতের জন্য।" (জামউল ফাওয়ায়েদ)

www.pathagar.com

যমযমের পানি পান করা

আল্লাহর বান্দা হজ্জের বিভিন্ন আহকাম পালন করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে। তাই বায়তুল্লাহর পাশেই রয়েছে যমযমের পানি। এ পানি পান করলে ক্ষুধা নিবারিত হয়। তার সাথে অনেক রোগ ভাল হয়। শুধু তাই নয় যমযমের পানি পান করলে পিপাসা মিটে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়তি অর্জন হল অনেক নেকী লাভ। এবার একটু চিন্তা করুন, আমাদের পিপাসা নিবারণ করার জন্য আল্লাহ পানির ব্যবস্থা করেছেন। আবার সে পানি পান করলে আল্লাহ আমাদেরকে সওয়াবও দান করছেন।

বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদে নববীতে সালাত আদায়

বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার এই মসজিদে নামায আদায় মসজিদে হারাম ছাড়া দুনিয়ার অন্য যেকোন মসজিদে এক হাজার নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর মসজিদে হারাম অর্থাৎ বায়তুল্লাহতে নামায আদায় করলে আমার মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে একশত গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। (ইবনে খুযায়মা)

মসজিদে কুবায় নামায আদায়

হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার বাড়িতে পবিত্রতা হাসিল করে মসজিদে কুবায় আসবে এবং এখানে নামায আদায় করবে, সে এর বিনিময়ে এক উমরার সওয়াব পাবে।"

মসজিদে কুবাতে কত রাকাত নামায পড়া সুন্নাত, এ সম্পর্কে দুই ধরনের হাদীস আছে। কোন কোন হাদীসে চার রাকাতের কথা আছে। আর কোন কোন হাদীসে দু'রাকাতের কথা আছে।

এভাবে দেখা যায়, হজ্জ আদায় করতে গিয়ে একজন ঈমানদার শুধু হজ্জের এক ফরয আদায়ের সওয়াব পান না। তিনি হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত সকল আমলের জন্য পৃথক পৃথকভাবে সওয়াব পান। বান্দার নেকী হাসিলের জন্য এত কিছু করার পরও আল্লাহর যে বান্দা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা না শুনে স্বীয় মর্জি মত চলে তার জন্য আফসোস করা ছাড়া করার আর কি আছে?

www.pathagar.com

যাকাত আদায় করাতেও সওয়াব আছে

আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে নিসাব পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন তাদেরকে যাকাত দিতে হয়। কেউ যদি যাকাত আদায় না করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অনেক জায়গায় ফরয নামায কায়েম করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে যাকাত আদায় করার কথা বলেছেন। কেননা যাকাতই ইসলামী অর্থনীতির মূলভিত্তি। আর মানুষের দেহের ময়লা যেমনি সাবানের দ্বারা পরিষ্কার হয়, তেমনি মাল-সম্পদের ময়লাও যাকাতের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়। তাই কেউ যদি মালের যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদ পবিত্র হয় না।

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে শুধু মালের পবিত্রতা অর্জন হয় না, অনেক নেকীও হাসিল হয়। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আশপাশের লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ছয়টি বিষয়ে যত্নশীল হবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব। (বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনার পর) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ছয়টি বিষয় কি? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে ছয়টি বিষয় হল, নামায, যাকাত, আমানত, লজ্জাস্থান, পেট ও জিহ্বা।" (তিবরানী) অর্থাৎ কেউ যদি এ ছয়টি জিনিস ঠিক রাখতে পারে তাহলে সে জান্নাতে যেতে পারবে।

হযরত আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আরো পাঁচটি বিষয় ঠিক রাখে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যাকাত অন্যতম।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক মত আদায় করবে, রমযানের রোযা পালন করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সাতটি বড় কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে তার জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। (নাসাঈ)

হযরত আবূ আইউব (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আপনি আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এভাবে আরো অনেক হাদীস আছে যেসব হাদীস থেকে যাকাত প্রদানের ফযিলতের কথা জানা যায়।

www.pathagar.com

নফল আদায়েও অনেক সওয়াব

নফল হল ফরযের অতিরিক্ত। এতে অনেক সওয়াব আছে। কেননা আল্লাহ এ কাজগুলো বাধ্যতামূলক না করার পরও বান্দা শুধু আল্লাহকে পাবার জন্যই এ কাজগুলো করছে। আমরা দুনিয়াতে দেখি, কোন কর্মচারী যদি চুক্তি অনুযায়ী সময় দেওয়ার পর আরো অতিরিক্ত সময় কাজ করে তাহলে মালিক তার উপর খুশি হয়। আমরা আল্লাহর আবদ বা গোলাম। আল্লাহ যেসব কাজ করতে বলেছেন সেসব কাজ করার পর নফল আমল করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। এ কারণে আমাদেরকে ফরয ইবাদত করার পাশাপাশি নফল ইবাদত বেশি বেশি করা দরকার। তবে খেয়াল রাখতে হবে, নফল ইবাদতের ফযিলতের কথা শুনে ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু নফল ইবাদত করে সহজেই জান্নাতে চলে যাবার পথ আবিষ্কার করা ঠিক নয়। একজন ব্যক্তিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ফরয ইবাদত পালন করতে হবে, তারপর নফল আদায় করার চেষ্টা করা দরকার। সাথে সাথে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে, অসংখ্য নফল একটি ফরযের সমান নয়। নফল না পড়লে গুনাহ্ নেই, কিন্তু ফরয ইবাদত আদায় না করলে গুনাহ্ আছে।

নফল সালাতেও অনেক নেকী

যেসব নামায ফরয নয়, তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, যেমন তিনি ফরয নামাযের আগে বা পরে অনেক সুন্নাত নামায পড়েছেন। ফরজের অতিরিক্ত যে নামায পড়া হয় তাই নফল। ফরয নামাযের বাইরে নফল নামায পড়লে, ফরয রোযার বাইরে নফল রোযা রাখলে, ফরয যাকাতের বাইরে নফল সদকা করলে, ফরয হজ্জের বাইরে উমরা বা হজ্জ করলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের অনেক আমল করেছেন। যা বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের যেসব আমল করেছেন তা দু'প্রকার। তিনি যেসব আমল করার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং প্রায়ই আদায় করতেন। এ ধরনের আমলকে সুন্নাতে রাতেবা বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলা হয়। আর যেসব আমল তিনি করেছেন কিন্তু সেগুলোর প্রতি কম গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে সুন্নাতে যায়েদা বা নফল বলা হয়।

www.pathagar.com

১. বারো রাকাত সুন্নাতে রাতেবা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের আগে দু'রাকাত, যোহরের আগে চার রাকাত এবং যোহরের পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পরে দু'রাকাত এবং এশার পরে দু'রাকাত নামায প্রায়ই আদায় করতেন। অনেকের মতে এশার বিতরও সুন্নাতে রাতেবার অন্তর্ভুক্ত। তবে ইমাম আবূ হানিফার মতে, বিতরের নামায ওয়াজিব। সুন্নাতে রাতেবার অনেক ফযিলত আছে। হযরত উম্মে হাবিবা রামলা ইবনে আবূ সুফিয়ান বলেন, আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করার জন্য প্রতিদিন বারো রাকাত নামায আদায় করবে, আল্লাহ এ নামাযের বিনিময়ে জান্নাতে তার জন্য ঘর নির্মাণ করবেন।" (মুসলিম)

আরেক হাদীসে আছে, "সে বারো রাকাত নামায হল, চার রাকাত যোহরের আগে, দু'রাকাত যোহরের পরে, দু'রাকাত মাগরিবের পরে, দু'রাকাত এশার পরে আর দু'রাকাত ফজরের আগে।" (আবূ দাউদ, ইবনে খুযায়মা)

হযরত আয়েশাসহ আরো অনেকের কাছ থেকে অনুরূপ হাদীস আছে। অনেক হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের আগের দু'রাকাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত নামায ব্যতীত অপর কোন নফল নামাযের প্রতি এত বেশি যত্নবান হতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

২. আছরের আগে চার রাকাত নামায

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির উপর রহম করুন যিনি আসরের আগে চার রাকাত নামায আদায় করে।" (তিরমিযী)

৩. সালাতুল আওয়াবীন

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মাগরিবের ফরয নামাযের পর বিশ রাকাত নামায পড়বে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করবেন।" (তিরিমিযী) এটা হল আওয়াবীনের নামায। কোন কোন হাদীসে ছয় রাকাতের কথাও আছে।

www.pathagar.com

৪. সালাত আদদুহা বা চাশতের নামায

চাশতের (দ্বিপ্রহরের পূর্বে) নামায প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূলের হাদীস আছে। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি দ্বিপ্রহরের আগে বার রাকাত (সালাতুদা দুহা) নামায আদায় করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদ তৈরি করেন।

৫. সালাত আল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামায

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, "রমযানের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হল মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হল রাতের নামায।" (মুসলিম)

এ হাদীসে রাতের নামায বলতে তাহাজ্জুদের নামায বুঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এমন একটি কক্ষ আছে যার বাইর থেকে ভেতর দেখা যায় আর ভেতর থেকে বাইর দেখা যায়। অতঃপর আবূ মালেক আশ'আরী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কক্ষটি কার জন্য? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা মিষ্টিভাষায় কথা বলে, অভুক্তকে খাদ্য দেয় এবং রাতের বেলা মানুষ যখন ঘুমায় তখন দাঁড়িয়ে রাত কাটায়।" (তিবরানী)

রাতের গভীরে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে সে সময় আল্লাহর যে সব বান্দা তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় নামায পড়ে আল্লাহ্ তাতে খুশি হন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। তিনি রাতের বেলা এত দীর্ঘ সময় নামাযে কাটাতেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেত।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, "রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন যে, তার পা ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা কেন করছেন ? অথচ আল্লাহ আপনার অতীতের ও ভবিষ্যতের সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল জবাব দিলেন, আমি কি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা হব না?"

এখন চিন্তা করা দরকার, আমরা যারা পাপে ডুবে আছি, আমরা কি আমাদের পাপ মোচনের জন্য রাতে দাঁড়িয়ে নফল ইবাদত করতে অভ্যস্ত? যদি এখনও অভ্যাস গড়ে না উঠে, তাহলে অভ্যাস করা দরকার। আর নফল নামাযের

www.pathagar.com

মধ্যে তাহাজ্জুদের গুরুত্ব অনেক বেশি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। আর এ সময় আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ চেয়ে দোয়া করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "মুমিন তারা যারা রাত যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয় ও দণ্ডায়মান হয় এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমার কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা।" (ফুরকান ঃ ৬৪-৬৬)

আল্লাহর রাসূলের রাত্রি যাপন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রির প্রথম ভাগেই ঘুমিয়ে পড়তেন এবং শেষ অংশে জেগে উঠতেন (এ সময় তিনি নফল নামায পড়তেন) তারপর পরিবার-পরিজনের সাথে যদি কোন প্রয়োজন থাকত, তা পূরণ করতেন। মূলত গভীর রাতে ইবাদত করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহর সাথে যাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় তাদেরকে আল্লাহ্ আখিরাতে জান্নাতের সুউচ্চ আসনে আসীন করবেন।

৬. সালাতুল ইস্তিসকা অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য নামায

আল্লাহ্ তাঁর সেসব বান্দার প্রতি বেশি খুশি হন যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে ধরনা দেয়। বিপদে আল্লাহকে ডাকে। আবার বিপদ থেকে রক্ষা পেলেও আল্লাহকে স্মরণ করে। কোন সমস্যায় পড়লে কাতর হয়ে আল্লাহর কাছে আকুতি জানায়। যেমন আমরা অনেক সময় দেখি, অতি খরার কারণে ফসলহানি হয়। রৌদ্র তাপে মানুষের জীবন-যাপন খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ সময় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি ভিক্ষা করলে আল্লাহ খুশি হন এবং বৃষ্টি দান করেন। যে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাইতে হয় সে নামাযকেই 'সালাত আল ইস্তিসকা' বলা হয়। ইস্তিসকার নামায সুন্নাত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের মত দুই রাকাত ইস্তিসকার নামায আদায় করেছেন এবং কিরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন। তবে ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় যেভাবে সুগন্ধি মেখে যেতেন, ইসতিসকার নামায পড়ার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করতেন না। ইস্তিসকার নামাযে দোয়া করার সাথে সাথে প্রত্যেককে স্বীয় গুনাহের জন্য তওবা এবং দান-সদকা করা দরকার। কেননা আল্লাহ মানুষের পাপের কারণেই কখনও অতিবৃষ্টি আবার কখনও অনাবৃষ্টি দান করেন। এ কারণে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিকে শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা ঠিক নয়। এটা আল্লাহর গজব। তাই এ থেকে পানাহ চাইতে হবে।

www.pathagar.com

৭. সালাত আল কুসূফ বা সূর্য গ্রহণের নামায ও সালাত আল খুসূফ বা চন্দ্র গ্রহণের নামায

সালাত আল কুসূফ হিজরতের শেষদিকে শুরু হয়। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছেলে ইব্রাহীম মারা গেলেন সে সময় চন্দ্রগ্রহণ ছিল। তাই অনেকে বলাবলি করতে লাগল, ইব্রাহীমের কারণেই চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে। তাদের বিশ্বাস ছিল, বড় কেউ মারা গেলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধারণা দূর করার জন্য ঘোষণা করেন, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ আল্লাহর দুটি নিদর্শন। এটা কারো জীবন বা মৃত্যুর কারণে হয় না। তিনি সাহাবীগণকে এ সময় নামায পড়ার নির্দেশ দান করেন। সালাত আল কুসূফ বা সালাত আল খুসূফ এর দু'রাকাত নামায একাকী বা জামাতে পড়া যায়। তবে জামাতে পড়াই উত্তম। ইমাম কিরাত জোরে পড়বে এবং নামায শেষে সংক্ষিপ্ত খুতবা দিবে। এ ধরনের নামায পড়ার একটি তরীকা হল সূরা ফাতিহার পর কিরাত পড়া শেষে রুকূতে যেতে হবে। অতঃপর রুকূ থেকে উঠে আবার কিরাত পড়বে এবং রুকূ করবে তারপর সেজদায় যাবে। রুকূর মত প্রতি রাকাতে সেজদাও দু'বার করবে। অর্থাৎ সালাত আল কুসূফ ও খুসূফের দু'রাকাত নামাযে চার রুকূ ও চার সেজদা দিবে। এ ধরনের নামায আদায় করার পরও ইস্তিগফার এবং দান সদকা করা উত্তম।

৮. সালাত আল ইস্তিখারা

আল্লাহর যে বান্দা সকল কাজে তাঁর প্রতিই নির্ভরশীল হয়, আল্লাহ তার প্রতি খুবই খুশি হন। মানুষ দুনিয়াতে কোন কিছু করার আগে অনেক সময় অনেকের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। এ ধরনের পরামর্শ নেওয়াতে দোষের কিছু নেই। তবে যে ঈমানদার আরেকজন মানুষের পরামর্শে বা নিজের ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার চেয়ে সে ঈমানদারই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় যে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আল্লাহর কাছে ধরনা দেয়। যেমন বিবাহ কোথায় করবে, কোন্ বিষয়ে পড়াশুনা করবে, কোন্ ধরনের চাকরি করবে। এ ধরনের যে-কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার পূর্বে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, 'হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফিক দান কর'। একজন মানুষের একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে অনেক সময় একাধিক ব্যক্তি, একাধিক পরিবার এমনকি একাধিক রাষ্ট্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহর রহমত ছাড়া কারো পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। আল্লাহর রহমত কামনা করার জন্য একজন ঈমানদার নামায পড়েই আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। এ ধরনের নামাযের নামই সালাত আল ইস্তিখারা।

www.pathagar.com

সালাত আল ইস্তিখারা দু'রাকাত। এটা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। ইস্তিখারার নামায শেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়। এরপর একজন মানুষের মনে যে সিদ্ধান্তের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তাকেই চূড়ান্ত করা উত্তম। এ ধরনের নামায শেষে যে দোয়া পড়া সুন্নাত তা হল, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বিইলমিকা, ওয়া আসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু, তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আনতা আল্লাম আল গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা (এরপর যে বিষয়ে ইস্তেখারা করা হল সে বিষয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে) খায়রুল লী ফী দীনী ওয়া মায়াশী ওয়া আকিবাতি আমরী ফাকদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী, ছুম্মা বারিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা (এরপর যে বিষয়ে ইস্তিখারা করা হল সে বিষয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে) শাররুন লী ফী দীনী ওয়া মায়াশী ওয়া আকিবানী আমরী ফাসরিফহু আনী ওয়াসরিফনী আনহু। ওয়াকদির লী আল খায়রা হায়ছু কানা ছুম্মা আরদিনি বিহি।" এ দোয়ার মাধ্যমে ফুটে উঠে একজন ঈমানদার দুনিয়ার সকল কাজে আল্লাহকেই খুশি রাখতে চায়। যে কাজ করলে আল্লাহ খুশি হন না, তা ঈমানদার ব্যক্তি করে না। আর ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে তার জন্য দুনিয়াতে কোন কাজ করা উত্তম তা তার জানা নেই। কোন গণক বা জ্যোতিষীও এ ব্যাপরে কিছুই জানে না। তাই তাদের কাছে না গিয়ে ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যায়। আল্লাহর কাছেই ধরনা দেয় তার বিষয়ে উত্তম ফয়সালা করার জন্য।

৯. সালাত আত তাসবীহ

হযরত ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে লক্ষ্য করে বলেন, "হে আব্বাস! আমি কি তোমাকে দান করব না? আমি কি তোমাকে দেব না? আমি কি তোমাকে বিশেষ ফায়দায় ভূষিত করব না? আমি কি তোমাকে দিয়ে দশটি বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করব না? যা তুমি করলে তোমার আগের, পিছের, পুরাতন, নতুন, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় কৃত ছোট-বড় গুনাহ যা প্রকাশ্যে বা গোপনে করা হয়েছে আল্লাহ সব মাফ করে দিবেন। সে দশটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ তুমি চার রাকাত নফল নামায পড়বে। (এ নামায পড়ার নিয়ম হল) কিরাত পড়ার পর যে কোন সূরা পড়া শেষে রুকুতে যাবার আগে পনের বার এই তাসবীহ পড়বে, "সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"। অতঃপর রুকূতে যাবে। রুকূতে দশবার তাসবীহটি আবার পড়বে। তারপর রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে আবার দশবার পড়বে। তারপর

www.pathagar.com

সেজদায় যাবে। সেজদায় দশবার পড়বে। এরপর সেজদা থেকে মাথা উঠানোর পর বসা অবস্থায় দশবার পড়বে। তারপর আবার সেজদায় যাবে এবারও দশবার পড়বে। সেজদা থেকে মাথা উঠানোর পর দণ্ডায়মান হবার আগে আবার দশবার পড়বে। সব মিলিয়ে এক রাকাতে পঁচাত্তর বার হবে। এভাবে চার রাকাত নামায পড়তে হবে। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে এ ধরনের নামায প্রতিদিন একবার পড়। আর যদি প্রতিদিন সম্ভব না হয় তাহলে প্রত্যেক জুমআর দিন একবার পড়। যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে প্রত্যেক মাসে একবার পড়। যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে প্রত্যেক বছর একবার পড়। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে কমসে কম জীবনে একবার পড়বে।

১০. সালাত আত তওবা

হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, অমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করে, তারপর পবিত্রতা লাভ করে। অতঃপর নামায পড়ে এবং ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহর রাসূল তারপর কুরআনের আয়াত, “আল্লাযীনা ইযা ফায়া'লু ফাহিসাতান আওযালামূ আনফুসাহুম যাকারুল্লাহ” শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। আয়াতের অর্থ হল, “তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তা করতে থাকে না।” (আলে ইমরান ঃ ১৩৫)

তওবার নামায দু'রাকাত। হযরত বেলাল (রা) যখনই কোন ধরনের মন্দ কিছু করতেন সাথে সাথেই দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতেন। আর যখন তাঁর অযু নষ্ট হয়ে যেত তিনি সাথে সাথে অযু করতেন। এ কারণে জান্নাতে তাঁর বিশেষ মর্যাদার কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

১১. সালাত আল হাজাত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কারো আল্লাহর কাছে কোন প্রয়োজন থাকে অথবা বনী আদমের কাছে, তার সুন্দর করে অযু করা উচিত। তারপর

www.pathagar.com

দু'রাকাত নামায পড়বে এবং আল্লাহর প্রশংসা করবে। এরপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। তারপর পড়বে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমু, আল কারীমু, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম, আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আসআলুকা মুজিবাতি রাহমাতিকা, ওয়া আযায়েমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গানিমাতা মিন কুল্লি বিররিন, ওয়াসসালামাতা মিন কুল্লি ইছমিন, লাতাদা' লি যানবান ইল্লা গাফরাতাহু, ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু, ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রেদান ইল্লা কাদায়তাহা ইয়া আর হামার রাহিমীন।" (তিরমিযী)

ইবনে মাজাতে অতিরিক্ত আরো আছে, এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তারপর সে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে যা ইচ্ছা আল্লাহর কাছে চাইবে। অতঃপর আল্লাহ তা তাকে দিবেন।" (হাকেম)

উল্লেখ্য, মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর কাছে যত দোয়া করে তা তার কাজে আসেই। কোন দোয়া সাথে সাথে আল্লাহ কবুল করেন। আর কোন দোয়া বিলম্বে কবুল হয়। আর কোন দোয়া দুনিয়াতে কবুল না হলেও এর বিনিময় আখিরাতে দেওয়া হয়। এ কারণে সবসময় আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানানো উচিত।

মানুষ দুনিয়াতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এসব সমস্যার সমাধান আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়, অনেক সমস্যার সমাধান মানুষের হাতে। এসব সমস্যার সমাধান মানুষের হাতে হলেও আল্লাহ যেকোন মানুষের কলব পরিবর্তন করে দিতে পারেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে শত্রুকে দিয়েও উপকার করাতে পারেন। তাই বিপদ-আপদে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ এ কথা কুরআনে এভাবে বলেছেন, "তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।" (বাকারা ঃ ৪৫)

যারা সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য চায় আল্লাহ তাদের উপর খুশি হন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেকোন সমস্যার মুখোমুখি হলে নামায পড়ে আল্লাহর সাহায্য চাইতেন। বদরের যুদ্ধের সময় যখন কাফির-মুশরিকরা রণ-হুংকার দিয়ে বদর প্রান্তরে সমবেত হল, তখন আল্লাহর নবী সেজদায় গিয়ে ফরিয়াদ করলেন, হে রব! যদি মুসলমানরা আজ বিজয়ী না হয় তাহলে তোমার জমিনে তোমার ইবাদত করবে কারা?

www.pathagar.com

নফল সিয়ামেও অনেক নেকী

আল্লাহ্ রমযানের রোযা আমাদের উপর ফরয করেছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় নফল রোযা রাখতে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন। এতে অনেক সওয়াব আছে। নফল রোযার ফযিলত সম্পর্কে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে দোযখ হতে এতটুকু দূরে রাখবেন, একটি কাক বাচ্চাকাল থেকে অতি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যতটুকু উড়তে পারে। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য নফল রোযা রাখা অনেক ফযিলতের কাজ।

শাওয়ালের ছয় রোযা

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখবে এবং তারপর শাওয়ালের ছয় রোযা রাখবে, সে যেন সারাবছরই রোযা পালন করল। (মুসলিম)

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখবে অতঃপর শাওয়ালের ছয় রোযা রাখবে তার গুনাহ্ মাফ হয়ে সে নবজাতক শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। (তিবরানী)

মুহাররামের রোযা

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আরাফাতের দিন রোযা রাখে তার দু'বছরের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি মুহাররামের যেকোন একদিন রোযা রাখে সে প্রতিদিনের রোযার বিনিময়ে ত্রিশ দিনের রোযা রাখার সওয়াব পাবে।" (তিবরানী)

হযরত আলী (রা) বললেন, "রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যদি রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে রোযা রাখতে চাও, তাহলে মুহাররাম মাসে রোযা রাখ। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহ্র মাস। এ মাসে এমন একটি দিন আছে যেদিন আল্লাহ্ একটি সম্প্রদায়ের তওবা কবুল করেছেন এবং অন্যদেরও করেন।" (তিরমিযী)

www.pathagar.com

আরাফাতের দিনের রোযা

হযরত কাতাদা ইবনে নুমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আরাফাতের দিন রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী বছরের ও পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন।" (ইবনে মাজাহ)

বায়হাকীতে আরেকটি হাদীস এভাবে এসেছে, আরাফাতের দিন রোযা রাখা এক হাজার দিন রোযা রাখার সমান। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেন, আরাফাতের দিন হাজীদের জন্য রোযা না রাখা উত্তম। আর অন্যদের জন্য রোযা রাখা উত্তম। হাজীদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয়। আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য তাদের শারীরিক শক্তি যেন ঠিক থাকে এ কারণেই তাদেরকে আরাফাতের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

আশুরার রোযা

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আরাফাতের দিন রোযা রাখে তার এক বছর আগের ও এক বছর পরের গুনাহ মাফ হয়। আর যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখে তার এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়া আত তারহীব) আরেকটি হাদীসে আছে, দিন হিসেবে রমযানের দিন ও আশুরার দিন ছাড়া অন্য দিনের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

শা'বানের রোযা

হযরত উসামা থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শা'বান এমন একটি মাস যে মাসে বান্দার আমল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে যায়। আর আমি চাই আমি রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছুক। (নাসাঈ) আরেক হাদীসে এসেছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বানের অধিকাংশ দিনই রোযা রাখতেন।

আইয়ামে বীয এর রোযা

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, "আমাকে আমার প্রিয় বন্ধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মাসের তিনদিন রোযা, দ্বি-প্রহরের আগে নামায ও ঘুমের আগে বিতরের নামায আদায় করার উপদেশ দিয়েছেন।" (মুসলিম)

www.pathagar.com

আরেক হাদীসে আছে, "প্রতি মাসের তিনদিন রোযা রাখা সারাবছর রোযা রাখার মত।" হযরত মায়মুনা ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, "তিনি একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে রোযার ব্যাপারে কিছু বলুন। তখন তিনি বললেন, যার পক্ষে সম্ভব হয় প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখবে। এ তিনদিনের প্রতিদিনের রোযার বিনিময়ে দশটি গুনাহ মাফ হয় এবং তাকে পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র করা হয়। যেমন পানি দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করা হয়।" (তিবরানী)

হযরত জারীর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, আইয়ামে বীয হল প্রতি মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ।

সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা

একটি হাদীসে আছে, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করা হয় এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করা হয় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা নেই। (তারগীব ওয়া তারহীব)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর কাছে যায়। আমি চাই আমার আমল আমার রোযা অবস্থায় আল্লাহর কাছে পেশ করা হোক। (তিরমিযী)

একজন বান্দা তার মুনীব আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে কোন দিন রোযা রাখতে পারে। যেমন কোন কোন হাদীসে আছে, বুধ, বৃহস্পতি, জুমআবার ও শনিবারে রোযা রাখা উত্তম। যারা এ দিনগুলোতে রোযা রাখে তাদের জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। তবে দুই ঈদের দিন এবং আইয়ামে তাশরীকের সময় রোযা রাখা নিষেধ। কেননা এ দিনগুলো হল খুশির দিন। কোন কোন হাদীসে আছে, শুধু জুমআর দিনও রোযা রাখা নিষেধ। কেননা এদিনও সাধারণ মুসলমানদের জন্য ঈদের দিনের মত। যদি জুমআর দিন রোযা রাখতে হয় তাহলে জুমআর দিনের আগে বা পরে আরো একদিন রাখতে হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার ছাড়া বিরতিহীন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তাই এমনটি ভাবা ঠিক নয় যে, বেশি উপবাস থাকলেই আল্লাহ বেশি খুশি হন। আল্লাহ চান তার বান্দারা তার হাবীবকে সকল ক্ষেত্রেই অনুসরণ করুক। আল্লাহর হাবীব কখনও বিরতিহীন রোযা রাখেননি। অর্থাৎ তিনি রোযা রেখেছেন আবার ইফতার করেছেন। এরপর আবার রোযা রেখেছেন।

www.pathagar.com

নফল দান-সদকাতেও অনেক নেকী

আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন এ সম্পদ আল্লাহ্ পুঞ্জীভূত করে রাখতে দেননি। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা রিক্তহস্ত। যাদের জীবনধারণের মত অর্থ নেই, চিকিৎসার অর্থ নেই। যাদের শিশুরা দু'বেলা খেতে পারে না। এ ধরনের মানুষের প্রতি আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের করণীয় আছে। আর এ করণীয় শুধু ফরয যাকাত বা সদকাতুল ফিতরের মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব নয়। এজন্য সামর্থ্য অনুযায়ী দান-সদকা করা জরুরি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও, একটি খেজুর সদকা করে হলেও। তিনি অন্যত্র বলেন, কোন মুসলমান দুনিয়াতে পিপাসার্ত অপর মুসলমানকে যদি পানি পান করায়, আল্লাহ্ তাকে সুপানীয় পান করাবেন।

দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত মানুষের অভাব মোচনে ও দীন প্রতিষ্ঠার জন্য বেশি বেশি দান করার জন্য আল্লাহ্ উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "যারা স্বীয় ধন-সম্পদ দান করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (বাকারা ঃ ২৭৪)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত হস্তে দান করতে বলেছেন। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, আল্লাহর পথে মুক্ত হাতে দান কর। গুনে গুনে হিসাব করে দান কর না। হিসাব করে দান করলে তিনিও গুনে গুনে প্রতিদান দিবেন। সম্পদ গচ্ছিত রেখো না। তাহলে আল্লাহও তোমার সাথে এ ব্যবহার করবেন এবং অগণিত সম্পদ তোমার হাতে আসবে না। অতএব হিম্মত করে মুক্ত হস্তে আল্লাহর পথে দান কর। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বান্দাকে বলেন, হে আদম সন্তান! আমার পথে খরচ করতে থাক। আমি আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে দিতে থাকব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ অকাতরে দান করতেন। একবার হযরত হোসাইন (রা)-এর দরবারে একজন লোক এসে ভিক্ষা চেয়ে বললেন, হে নবীর পৌত্র! আমার চারশত দিরহামের প্রয়োজন। তিনি ঘরে গিয়ে তাকে চারশত দিরহাম দিলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কেন তাকে আমার কাছে এসে সওয়াল (প্রার্থনা) করতে হল, তার আগেই কেন তাকে দিলাম না?

www.pathagar.com

মূলত যে সম্পদ দান করা হয়, তাই একজন মানুষের আসল সম্পদ। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে ছাগলের গোশত কিছু আছে কিনা? তিনি জবাব দিলেন, শুধু একটি রান আছে (আর বাকি সব বন্টন করে দেওয়া হয়েছে), তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে রান আছে তা ব্যতীত আর যা বন্টন করা হয়েছে তাই আসলে বাকি আছে (কেননা এটার বিনিময় আখিরাতে পাওয়া যাবে)।

যারা অকাতরে বিলায় তারা আখিরাতে নাজাত পাবে। কিন্তু যারা বিনা প্রয়োজনে কারো কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ায় তারাও সাজা পাবে। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে অথচ কারো কাছে কোন কিছু ভিক্ষা করা তার দরকার নেই, তার মুখে নখ দ্বারা যখমের চিহ্নসহ সে হাশরের ময়দানে উঠবে।" (তারগীব ওয়া তারহীব)

আরেক হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি দরিদ্রতা ছাড়াই কারো কাছে কোন কিছু ভিক্ষা করে, সে যেন আগুনের অঙ্গার ভক্ষণ করে।" (তিবরানী)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করতেন না। হযরত সাওবান (রা) বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে যে, সে কারো কাছে কিছু চাইবে না আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার হব।" (তারগীব ওয়া তারহীব)

দানের ফযিলত এর পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সমাজ উপহার দিয়েছেন, যেখানে কেউ কোন কিছু চাওয়ার আগেই তার কাছে পৌঁছানো হবে। আর কেউ বিনা প্রয়োজনে কিছু চেয়ে প্রকৃত অভাবীর হক যেন নষ্ট না করে, এজন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। আমাদের সমাজেও অনেক সময় দেখা যায়, কোন এলাকায় দুর্যোগ হলে সরকারি বা বেসরকারি ত্রাণ নেওয়ার জন্য এমন অনেকেই আসেন যারা ত্রাণ গ্রহণ না করে বরং দিতে পারেন। ফলে প্রকৃত অভাবীরা ত্রাণ পায় না।

উমরা আদায়েও অনেক নেকী আছে

আল্লাহ কুরআনে সামর্থ্যবানদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কুরআন শরীফে হজ্জের পাশাপাশি উমরার কথাও এসেছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আতিম্মুল

www.pathagar.com

হাজ্জা ওয়াল উমরাতা লিল্লাহ''। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা আদায় কর। এ আয়াতের আলোকে ইমাম শাফেয়ীসহ অনেকেই মনে করেন, হজ্জের মত সামর্থ্যবান মানুষের উপর উমরা করাও ফরয। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে হযরত আয়েশা, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস (রা)সহ আরো অনেকের বর্ণিত হাদীসও পেশ করেন। এসব হাদীসে আল্লাহর রাসূল হজ্জ করার পাশাপাশি উমরা করার কথা বলেছেন। তবে ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালেক (রা)সহ অধিকংশ আলেম মনে করেন, উমরা করা ফরয বা ওয়াজিব নয়, এটা সুন্নাত। কেননা হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করা হয়েছে উমরা করা কি ওয়াজিব? তিনি জবাবে বলেছেন, না; বরং উত্তম। তাই কুরআন ও হাদীসে উমরা পালনের কথা উত্তম আমল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; ফরয বা ওয়াজিব হিসেবে নয়।

উমরা বছরের যে কোন সময় করা যায়। তবে রমযানে উমরা করা অধিক সওয়াব। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রমযানে উমরা করল সে যেন আমার সাথে হজ্জ করল। রমযান ছাড়া বছরের যে কোন সময়ে উমরা করার মাঝেও অনেক নেকী আছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার নিয়তে বাড়ি থেকে বের হল এবং তারপর পথেই তার মৃত্যু হল। সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। (বায়হাকী ও দারে কুতনী)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুযায়ী হজ্জ, উমরা ও আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা হলেন আল্লাহর মেহমান। তাই যাদের পক্ষে সম্ভব তারা হজ্জ ও উমরা করে অনেক নেকী হাসিল করতে পারে।

আমলে সালেহ-এর আরো কতিপয় উদাহরণ

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে আখিরাতে পুরস্কৃত করার জন্য অনেক পথই রেখেছেন। শুধু প্রয়োজন হল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে বা যে উদ্দেশ্যে যে কাজ করতে বলেছেন, ঠিক সে পদ্ধতিতে বা সে উদ্দেশ্যে সে কাজ করা। এভাবে কাজ করলে অনেক কাজেই নেকী হাসিল হয়।

ইলমে দীন হাসিলে সময় দান

সঠিক ইলম অর্জন করা ছাড়া আল্লাহর দীন অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ 'ইকরা'-পড় শব্দ দিয়েই ওহী নাযিলের সূচনা করেন। মানব সৃষ্টির

www.pathagar.com

সূচনাতে ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বিভিন্ন জিনিসের নাম জিজ্ঞেস করা হয়। হযরত আদম (আ) আল্লাহর দেওয়া ইলমের ভিত্তিতে সব জিনিসের নাম বলতে পারলেন। আর ফেরেশতারা বলতে পারল না। এ থেকে বুঝা যায় ইলমই হল মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মানদণ্ড। কারো যদি দীনের সহীহ্ ইলম না থাকে তাহলে শয়তান তাকে সহজেই গোমরাহ্ করতে পারে। এ কারণে দীনের মৌলিক ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। দীনের মৌলিক ইল্‌ম অর্জন শেষে দুনিয়া পরিচালনা করার জন্য যত ইলম আছে তা জানা ফরযে কিফায়াহ্। এ কারণে মুসলমানদের একেকজনকে একেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা করতে হয়। দীনের মৌলিক ইলম অর্জন করা বা দীন কায়েম করার জন্য বিশেষজ্ঞ হবার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করার পিছনে একজন মানুষ যে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে, এ সবকিছুর জন্য সে জিহাদের সওয়াব পাবে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুযায়ী একজন আবেদ তথা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীকারীর তুলনায় একজন আলেম-এর গুরুত্ব বেশি। কারণ একজন আলেম তার ইলম দ্বারা অনেক মানুষকে সঠিক পদ্ধতিতে আমল করার জন্য দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। সঠিক পদ্ধতিতে আমল না করলে অনেক আমল কোন কাজেই আসবে না। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দীনের সামান্য ইলম হাসিল অধিক ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।"

যারা ইলম শিখে ও শেখায় আল্লাহ্ তাদেরকে অনেক সওয়াব দান করেন। অনেক হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইল্‌মে দীন শেখার জন্য পথ চলা শুরু করে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" তবে এ কথা ঠিক যে, অর্জিত ইল্‌ম অনুযায়ী কেউ যদি আমল না করে তাহলে এটার জন্য মস্তবড় গুনাহ হবে। তাই প্রত্যেককে ইলম অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করতে হবে। আর কেউ যদি আল্লাহকে খুশি করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিখে তাকেও জাহান্নামে জ্বলতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো প্রয়োজন পূরণে ইলম শিখে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানালো। (তিরমিযী)

অনেক সময় দেখা যায়, ঈমানদার বেশে অনেক মুনাফিক কুরআন-হাদীস শিক্ষা করে ইসলামের দুশমনি করার জন্য। তার জ্ঞান আল্লাহর দীনের স্বার্থের

www.pathagar.com

চেয়ে অমুসলিমদের স্বার্থে বা তাদের মর্জিমত বক্তৃতা, বিবৃতি কিংবা লেখনীর কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন খালেছ নিয়ত ছাড়া ইলমে দীন হাসিল করলে সে ইল্‌ম সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের কারণ হবে।

কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন শিখা ও অপরকে শেখানো

আল্লাহর পথে চলার জন্য আল্লাহ্ নিজেই কুরআনে কারীমের মাধ্যমে তাঁর বান্দাকে দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কুরআনের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়েই একটি সুন্দর সমাজ কায়েম করেছিলেন। তাই আমাদেরকেও আখিরাতে নাজাত পেতে হলে কুরআনের হেদায়াত অনুসরণ করতে হবে। আমাদের অশান্ত সমাজে যদি শান্তি পেতে হয় তাহলে কুরআনের আলোকে সমাজ পরিচালনা করতে হবে।

কুরআনে কি আছে তা কুরআন পড়া ছাড়া জানা যাবে না। তাই কুরআন জানার জন্য চেষ্টা করা অপরিহার্য। আল্লাহর কোন বান্দা যখন কুরআনে কি আছে তা জানার উদ্দেশ্যে কুরআন শিখা শুরু করে, আল্লাহ্ এতে খুব খুশি হন। তাই যে বান্দা কুরআন শিখে তাকে পুরস্কৃত করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ তিলাওয়াত করে তার জন্য অন্তত দশ নেকী। (তিরমিযী) হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শেখায়।" (তিরমিযী)

অপর একটি হাদীসে আছে, "রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য) আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। কুরআন মানুষের হৃদয়ে হেদায়াতের আলো প্রজ্বলিত করে।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত হয় বা শেখানো হয় সে ঘর রহমতের ফেরেশতারা ঘিরে রাখে এবং শান্তিবর্ষণ করে।" (মুসলিম)

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে ও মুখস্থ করে এবং হালালকে হালাল মনে করে এবং হারামকে হারাম মনে করে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর সে আখিরাতে তার পরিবারের এমন দশজনের জন্য সুপারিশ করতে পারবে যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছিল।" (ইবনে মাজাহ)

www.pathagar.com

এ কারণে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করার চেষ্টা করা দরকার। কারণ কুরআনই হল পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থ যা শুধু তিলাওয়াত করলেই প্রতিটি হরফের জন্য সওয়াব পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ তাআলা কুরআন আমাদেরকে কেন দিয়েছেন? আল্লাহ্ কুরআন কেন দিয়েছেন সে কথা তিনি নিজেই সূরা বাকারার শুরুতে ইরশাদ করেন, "যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকীন"। অর্থাৎ এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীনদের জন্য হেদায়াত। (বাকারা ঃ ২)

সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতেও কুরআনকে বলা হয়েছে, 'হুদাল্লিন্নাস' অর্থাৎ মানব জাতির জন্য হেদায়াত। এ থেকে বুঝা যায়, কুরআনে সমস্ত মানব জাতির জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনা আছে। কোন মানুষকে সঠিক পথ-নির্দেশনা পেতে হলে কুরআনের 'হেদায়াত' গ্রহণ করতে হবে। এ দিকনির্দেশনা ব্যক্তি জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে হতে পারে কিংবা পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও হতে পারে। কুরআনের দিক-নির্দেশনা ছাড়া কোন ক্ষেত্রে সঠিক পথ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে কুরআন বুঝতে হবে, কুরআন অনুযায়ী চলতে হবে এবং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কুরআনের আলোকে পরিচালনা করতে হবে।

আমাদেরকে কুরআন জানার সাথে সাথে কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। কারণ, কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখার মৌলিক নির্দেশনা আছে। কুরআন নিয়ে গভীর তাফাক্কুর ছাড়া কুরআনের দিক-নির্দেশনা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে। অথচ আমাদের মাঝে কুরআনের মত নিয়ামত থাকার পরও আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক পিছিয়ে আছি। কারণ, তাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যতটুকু চিন্তা করে সে অনুযায়ী আমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করি। অথচ আল্লাহ্ কুরআন নিয়ে তাফাক্কুর-তাদাব্বুর করার জন্য কুরআনের অনেক জায়গায় নির্দেশ দান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না, না কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (মুহাম্মদ ঃ ২৪)

মূলত তারাই কুরআন থেকে হেদায়াত পায়, যারা খোলা মনে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। এ কারণেই কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ্ বলেছেন, 'এটা চিন্তাশীলদের জন্য উপদেশ বাণী'।

www.pathagar.com

মানুষ এমন অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করে সময় কাটায়, যে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার মাঝে আখিরাতে কোন কল্যাণ নেই। অথচ কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মাঝেই দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নিহিত।

পবিত্র অবস্থায় থাকা

আল্লাহ্ পূত-পবিত্র। তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্ তাঁর সেই বান্দাকে খুব ভালবাসেন, যে সবসময় অযু অবস্থায় পবিত্র থাকার চেষ্টা করে। এ কারণে পেশাব-পায়খানার সময় খুবই সতর্ক থাকা দরকার যাতে অপবিত্র কিছু গায়ে না লাগে। এ ছাড়া কখনো অপবিত্র হয়ে গেলে যথাসম্ভব দ্রুত পবিত্রতা হাসিল করা ভাল। অপবিত্র ব্যক্তির কাছে রহমতের ফেরেশতা আসে না। তাই কোন বিশেষ কারণ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর গোসল ফরয হলে সেই গোসলও তাড়াতাড়ি করা উত্তম।

কারো কখনো অযু নষ্ট হয়ে গেলে দ্রুত অযু করা সওয়াবের কাজ। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন মুসলিম অযু করার জন্য মুখে পানি দেয়, তখন পানির ফোঁটার সাথে সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চোখের গুনাহ্ চলে যায়। আর যখন হাতে পানি দেয়, তখন হাতের গুনাহ্ পানির সাথে চলে যায়। আর যখন পায়ে পানি দেয়, তখন পায়ের গুনাহ চলে যায়। এভাবে সে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিযী)

এভাবে আরো অনেক হাদীস আছে, যেসব হাদীস থেকে জানা যায় একজন ঈমানদারের হাত, পা, চোখ, কান, নাকসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ্ অযুর পানির সাথে চলে যায়। তাই বেশি বেশি অযু করা দরকার। তবে একবার অযু করার পর কোন ইবাদত না করে আবার অযু না করাই ভাল। একবার অযু করে যে কোন ধরনের আমল করার পর অযু থাকা অবস্থায়ও আবার অযু করা যায়। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র (পূর্বের অযু) থাকার পরও অযু করে সে দশ নেকী পায়। (তিরিমিযী)

সবসময় অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা অনেক নেকীর কাজ। বিশেষত ঘুমানোর আগে অযু করে পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো ভাল। হাদীস থেকে জানা যায় কেউ যদি অযু করে নফল নামাযের সংকল্প করার পর ঘুমে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ঘুমিয়ে যায়, তাহলে সারারাত জেগে নামায পড়লে যে সওয়াব হত আল্লাহ্ তাকে সে সওয়াব দান করবেন।

পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো উত্তম হওয়ার কারণ হল, একজন মানুষ জানে না, ঘুম থেকে সে দ্বিতীয়বার জাগ্রত হতে পারবে কিনা। ঘুমের ভেতর যদি তার মৃত্যু

www.pathagar.com

হয় তাহলে অযু করে ঘুমানোর ফলে তার মৃত্যু পবিত্র অবস্থায় হয়। সে পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে চলে যায়। আল্লাহ্ এতে খুব খুশি হন।

যিকর, দোয়া, তাসবীহ্ ও তাহ্‌লীল

আল্লাহ্‌কে সবসময় স্মরণ রাখার নামই যিক্‌র। কর্মের মাধ্যমে যিক্‌রই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ একজন মানুষ সবসময় আল্লাহ্‌র কথা স্মরণে রেখে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নামই যিক্‌র। বাস্তবজীবনে পাপ কাজ করে মুখে মুখে যিকর হাস্যকর। একজন কর্মকর্তা অফিসে বসে এক হাতে ঘুষ নিল আর অন্য হাতে তাসবীহ্-তাহ্‌লীল করল এটা আল্লাহ্‌র সাথে উপহাস করার নামান্তর। তবে বাস্তব কর্মে আল্লাহ্‌কে স্মরণে রেখে তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলার সাথে সাথে মুখে মাসনূন যিকর ও তাসবীহ্ পড়া অনেক সওয়াবের কাজ।

হযরত মায়ায ইবনে আনাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, "আমার কোন বান্দা যখন নিজে নিজে আমার স্মরণ করে আমি ফেরেশতাদের নিয়ে তার স্মরণ করি।" (তিবরানী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার করার জিনিস আছে। কলব পরিষ্কার করার জিনিস হল আল্লাহ্‌র যিক্‌র।" (বায়হাকী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটি জিনিস যাকে দেওয়া হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর বস্তু দেওয়া হয়েছে। সে চারটি বস্তু হল, কৃতজ্ঞ কলব, আল্লাহ্‌র যিকরকারী জিহ্বা, বিপদে ধৈর্য অবলম্বনকারী শরীর ও এমন স্ত্রী যে স্বামীর জীবন ও মালের খিয়ানত করে না। অর্থাৎ সব কিছু হেফাযত করে। (তিবরানী)

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের রবকে ডাকো জড়সড় হয়ে এবং চুপে চুপে। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"। (আরাফ ঃ ৫৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ! বেশি বেশি করে আল্লাহ্‌র যিকর কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।" (আহ্‌যাব ঃ ৪১-৪২)

আল্লাহ্ আরো বলেন, "আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আমার শুকরিয়া আদায় কর, কুফরী কর না।" (বাকারা ঃ ১৫২)

www.pathagar.com

এভাবে আরো অনেক আয়াত আছে, যেসব আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ তার সেই বান্দাকে ভালবাসেন যে সবসময় সকল কাজে তাঁকে স্মরণ রাখে।

আল্লাহকে ডাকার জন্য আল্লাহ নিজেই কুরআনে অনেক দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। যেমন- "রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরীন"। অর্থাৎ হে আমাদের রব! আমরা তো আমাদের নফসের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি ক্ষমা না কর, রহমত না কর, তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (আরাফ ঃ ২৩)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ ধরনের অনেক যিকর ও দোয়া আমাদেরকে শিখিয়েছেন। এ ধরনের যিকরের মধ্যে 'সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়াটি খুব পছন্দ করতেন। আরেক হাদীসে আছে, "সবচেয়ে উত্তম দোয়া হল ইস্তিগফার।" অন্য হাদীসে এসেছে, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈনিক সত্তরবারেরও বেশি তওবা এবং ইস্তিগফার করতেন।"

এভাবে কুরআন ও হাদীসে অনেক যিকর ও দোয়ার উল্লেখ আছে। যেমন শয়নকালের দোয়া, শয্যা ত্যাগের দোয়া, পেশাব-পায়খানার দোয়া, খাবারের দোয়া, যানবাহনে ভ্রমণের দোয়া, খাবারের পূর্বের দোয়া, ঘর হতে বের হবার দোয়া, আনন্দ বা বেদনা প্রকাশের দোয়া, রোগীর জন্য দোয়া, কবরে মাটি দেওয়ার দোয়া, স্ত্রীর সাথে মিলনের দোয়া, নতুন পোশাক পরিধানের দোয়াসহ অনেক দোয়া আছে যা আদইয়ায়ে মাসনূনাহ হিসেবে পরিচিত। এসব দোয়া পড়ার মধ্যে সওয়াব ও বরকত আছে।[৬১]

আজকাল কোথাও কোথাও যিকর করার জন্য ঢোলবাদ্য ব্যবহার করে একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করে। আবার কেউ কেউ নিজেরা বিশেষ কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করে যিকরের হালকা বা যিকরের মাহফিল বানায়। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের যিকরে আল্লাহ খুশি হন না; বরং অখুশিই হন। এভাবে যিকর করার কোন নজির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের যুগে নেই। তাই এভাবে যিকর করা সুস্পষ্ট বিদআত।

মুসলমানদের পারস্পরিক হক আদায়েও নেকী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের ছয়টি হক আছে। তাঁকে প্রশ্ন করা হল সেগুলো কি কি? তিনি

www.pathagar.com

জবাব দিলেন (সেগুলো হল) "একজন মুসলমানের সাথে আরেকজন মুসলমানের দেখা হলে সালাম দেওয়া, যখন দাওয়াত দেয় তা কবুল করা, (এখানে বিবাহের দাওয়াতের কথা বলা হয়েছে বলে হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ বলেন) কেউ কোন নসীহত কামনা করলে তাকে নসীহত দেওয়া, কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দেওয়া, অসুস্থ হলে সেবা-যত্ন করা, আর মারা গেলে জানাযায় যাওয়া। (মুসলিম)

এ কাজগুলো করলে আল্লাহ খুশি হন। আর এতে অনেক সওয়াব আছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হল, আজকে আমাদের মধ্যে সালামের প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে। বর্তমান প্রজন্ম সালামের পরিবর্তে টা-টা দেওয়া শিখছে। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্রসহ আত্মীয়-স্বজন একে অপরের সাথে দেখা হলে সালাম দিয়ে কথা শুরু হয় না। অথচ সাহাবায়ে কেরাম একে অপরকে সালাম দেওয়ার জন্য কত উদগ্রীব ছিলেন।

আমরা পরস্পর পরস্পরকে নসীহত করতে যেন লজ্জা পাই। কেউ কোন নেক আমল করার কথা জানলে তা অপর মুসলমানকে জানানো দরকার। কোন ভাইয়ের মধ্যে কোন খারাপ কিছু দেখলে তাকে সংশোধন করা দরকার। কারো সামনে কোন মানুষ যদি দুর্ঘটনায় পতিত হয় তিনি কি তাকে উদ্ধার করবেন না? তাহলে আমাদের চোখের সামনে যেসব মানুষকে মহাদুর্ঘটনায় নিমজ্জিত দেখছি তাদেরকে উদ্ধার করা কি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব নয়? বস্তুত যারা খারাপ কাজে লিপ্ত, তাদেরকে নসীহত করা অতীব জরুরি। এতে অনেক সওয়াব আছে।

আল্লাহর রাসূলের নামে দরূদ পড়া

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠে অনেক সওয়াব আছে। আল্লাহ নিজেই তাঁর রাসূলের নামে দরূদ পড়েন। হযরত আবূ দারদা (রা) বলেন, "রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলায় দশবার এবং সন্ধ্যা বেলায় দশবার আমার নামে দরূদ পাঠ করবে সে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভ করবে।" (তিবরানী)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "সে ব্যক্তি বখীল (কৃপণ), যার সামনে আমার নাম নেওয়া হয় অথচ সে দরূদ পাঠ করে না। এ কারণে উলামায়ে কেরাম বলেন, কোন মজলিসে আল্লাহর রাসূলের নাম নিলে প্রথমবার শুনার পর দরূদ পড়া ওয়াজিব। এরপর যত বেশি পাঠ করবে তত বেশি সওয়াব পাবে।"

www.pathagar.com

দরূদ পাঠের জন্য আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। চলতে-ফিরতে, উঠা-বসায় সবসময় মনে মনে দরূদ পাঠ করা যায়। সাহাবায়ে কেরাম বা তার পরবর্তীতে সলফে সালেহীনের কেউই মীলাদ মাহ্ফিলের আয়োজন করে মীলাদ পড়েননি। আফসোসের বিষয়! মুসলিম সমাজের কোথাও কোথাও মীলাদ নিয়ে ঝগড়া পর্যন্ত হয়। মীলাদে কিয়াম করা বা না করা নিয়ে মারামারি করে খুন হবার দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে, অথচ মীলাদেরই কোন ভিত্তি নেই। মীলাদে সওয়াব তো হয়ই না; বরং মারাত্মক গুনাহ্ হয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ তো সেই সব উম্মত পাবে, যারা তাঁর আদর্শকে ভালবেসে তা কায়েম করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সেই সাথে সময় পেলেই দরূদ পড়ে আন্তরিক মহব্বত প্রকাশ করে। যারা আল্লাহর রাসূলের আদর্শ কায়েমের চেষ্টার পরিবর্তে বিরোধিতা করে তারা মীলাদ মাহ্ফিল আয়োজন করে যত মীলাদই পড়ুক না কেন তাতে আল্লাহ খুশি হন না।

পিতা-মাতার খিদমত

পিতা-মাতার খিদমত করা ফরয। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমাদের যাদের পিতা-মাতা বেঁচে আছেন, তাদের পিতা-মাতার সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলতে হবে। পিতা-মাতা সন্তানের জন্য মন থেকে যে দোয়া করেন, আল্লাহ্ সে দোয়া কবুল করেন। তাই পিতা-মাতার খিদমতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টা করা দরকার। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে জাহমিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, একবার জাহমিয়া রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার নিয়ত করেছি। এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। একথা শুনার পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি মা আছে? সে জবাব দিল, হ্যাঁ। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার সেবা করা তোমার উপর কর্তব্য। কেননা 'জান্নাত তার পায়ের নিচে।' অনুরূপ আরো অনেক হাদীস আছে, এ সব হাদীস থেকে জানা যায়, মাতা-পিতার খিদমত করা সন্তানের জন্য অপরিহার্য। মাতা-পিতার খিদমত করার কেউ না থাকলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর তুলনায় মাতা-পিতার খিদমতের গুরুত্ব বেশি।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

আল্লাহ্ তাআলা আখিরাতে নাজাত পাবার জন্য যেসব আমল করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল জিহাদ ফী

www.pathagar.com

সাবীলিল্লাহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্র পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্সমূহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝরনা ধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা। আর আরেক জিনিস তোমাদেরকে দেবেন যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। তা হল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং অতি নিকটবর্তী সময়ে বিজয়। হে নবী! ঈমানদারদেরকে এর সুসংবাদ দান কর।" (সফ ঃ ১০-১৩)

এখানে আল্লাহ্ তাআলা আল্লাহ্র পথে জিহাদকে আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে নাজাতের উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমরা সবাই আখিরাতে নাজাত চাই। আমরা দোযখের আগুন থেকে পরিত্রাণ চাই। দোযখের আগুনের কথা শুনলেই আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি। তাই সবসময় দোযখের আগুন থেকে পানাহ্ চেয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, মুনাজাত করি। দোযখের আগুন থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের কি করতে হবে সে কথাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতগুলোতে বলেছেন।

আল্লাহ্র ঘোষণা অনুযায়ী আখিরাতে নাজাত পেতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে হবে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জিহাদ করে তাদের মর্যাদা আল্লাহ্র কাছে অনেক উর্ধ্বে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকারীগণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র রাহে, এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়। আর আল্লাহ্ জালেম লোকদের হেদায়াত দান করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে আল্লাহ্র কাছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে। আর তারাই সফলকাম। (তওবা ঃ ১৯-২০)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, হাজীদের পানি পান করানো অনেক সওয়াবের কাজ হলেও তার চেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্। আল্লাহ্ আরো বলেন, গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারা এক

www.pathagar.com

নয়। আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ মুজাহিদীদেরকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। (নিসা ঃ ৯৫)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে মুজাহিদদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক ঊর্ধ্বে। যারা জিহাদ করে আর যারা ঘরে বসে থাকে তারা একই সমাজে বসবাস করলেও উভয়ের মর্যাদায় অনেক ফারাক। তিনি মুজাহিদদেরকে ভালবাসেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আল্লাহ্ সেই সব লোকদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দি হয়ে লড়াই করে যেন তারা শিশা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেওয়াল।" (সফ ঃ ৩)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, কেবল আল্লাহ্ সেসব ঈমানদারদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে লড়াই করে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি জবাব দিলেন, আল জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "দু'চোখ দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ভয়ে যে চোখ থেকে পানি ঝরে সে চোখ আর যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটায়।" অন্য আরেকটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি মারা যায়, অথচ জিহাদ করেনি কিংবা জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করেনি, সে যেন নেফাকী মৃত্যু বরণ করল। আর যারা জিহাদ করতে গিয়ে আহত হয় কিয়ামতের দিন তারা রক্তাক্ত অবস্থায় উঠবেন।

আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য যারা জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয় আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদাও অনেক বেশি। আল্লাহ্ বলেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ্ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত।" (আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭০)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হবার কষ্ট অনুভব করে না। তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব কর, কেবল ততটুকু অনুভব করে মাত্র। (তিরমিযী) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, মহান আল্লাহর কাছে শহীদগণের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে।

www.pathagar.com

১. রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং প্রাণ বের হবার প্রাক্কালে জান্নাতে তার অবস্থানের জায়গাটি চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হয়।

২. কবরের আযাব হতে নিরাপদ রাখা হয়।

৩. কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে তাকে হেফাযতে রাখা হবে।

৪. তাঁর মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তাতে খচিত একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সেসব হতে উত্তম।

৫. বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুর দেওয়া হবে।

৬. তাঁর নিকটতম সত্তরজন আত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের দাবি পূরণে তথা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা নিহত হন তারাই শহীদ। বীরত্ব প্রদর্শন, গণীমতের মাল লাভ বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মারা গেলে তারা শহীদ হবে না।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, জিহাদ সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। অনেকে জিহাদ বলতে শুধু কিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামকেই বুঝেন। মূলত সশস্ত্র সংগ্রাম জিহাদের চূড়ান্তরূপ হলেও জিহাদ বলতে আরো অনেক কিছু বুঝায়। আরবীতে যাদ্দুন, সা'য়ুন, জুহদুন শব্দসমূহ চেষ্টা, সাধনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দসমূহের মধ্যে জুহদুন মানে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা বা সংগ্রাম। এ সংগ্রাম দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এ চেষ্টা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টা। এ সাধনা আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে জান-মাল কুরবান করার সাধনা। একজন মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থই হল, সে আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মেনে চলবে। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা অনুযায়ী জীবনের সকল কিছু আঞ্জাম দিবে। যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে না তাদেরকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার জন্য দাওয়াত দিবে।

আল্লাহর হুকুম জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলতে গেলে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকতে গেলে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এ সব কষ্ট সহ্য করে সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহর পথে চলার জন্য নিজের নফসের সাথে সংগ্রাম করতে হয়। সামাজিক পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করতে হয়। অনেক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। সর্বোপরি আল্লাহর দীনের দিকে মানুষদের আহ্বান জানাতে গিয়ে যেসব বাধা আসে তার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। সকল বাধা মোকাবিলা করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম করার জন্য যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়, তাই জিহাদ ফী সাবীল্লিাহ্। যে সমাজে দীন কায়েম নেই সে সমাজে দীন কায়েমের চেষ্টা করা ফরয। যারা আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য জিহাদের মানসিকতা রাখে না, আল্লাহ্ তাদের সমালোচনা করে বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখনই তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হল, অমনি তোমরা মাটি কামড়ে থাকলে? তোমরা কি আখিরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছ? যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ-সরঞ্জাম আখিরাতে খুব সামান্য বলে প্রমাণিত হবে। তোমরা যদি না বের হও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের জায়গায় আর একটি দলকে উঠাবেন। তিনি সব জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (তওবা ঃ ৩৮-৩৯)

উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য চেষ্টা করা খুব বেশি নেকীর কাজ। কেননা, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম না থাকলে আল্লাহর অনেক হুকুম মেনে চলা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই আল্লাহ্ তাঁর দীন কায়েমে চেষ্টাকারীদেরকে আখিরাতে নাজাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

একজন ঈমানদার সব কিছুতেই সওয়াব পেতে পারে

একজন ঈমানদার দুনিয়াতে যা কিছু করে, সব কিছুতেই সওয়াব পেতে পারে। আল্লাহ্ চান ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়ার সব কাজ কর্মের ভেতর আখিরাতের তোহফা সঞ্চয় করুক। যে ব্যক্তি আল্লাহকে পেতে চায়, আল্লাহকে পাবার জন্য তার নির্জন কোথাও চলে যেতে হবে না। যে আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল করতে চায় সে দুনিয়ার সবকিছুর মধ্য দিয়েই আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল করতে পারে।

ঘুমেও সওয়াব জাগরণেও সওয়াব

একজন মানুষের জন্য ঘুম অপরিহার্য। আল্লাহ্ তাআলা রাত দিয়েছেন ঘুমানোর জন্য। আল্লাহকে খুশি করার জন্য সারারাত বিনিদ্র রজনী কাটানো আল্লাহ্ চান না। আল্লাহ্ চান বান্দা যখন ঘুমাবে তখন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকবে না। ঘুমানোর ক্ষেত্রেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের উপর আমল করবে। ঘুমানোর সময় পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো

www.pathagar.com

সুন্নাত। আবার উপুড় হয়ে ঘুমানো নিষেধ। কেউ যদি এশার নামায আদায় করে এ নিয়তে তাড়াতাড়ি ঘুমায় যে, সে ভোর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে এবং ফজরের নামায জামাতে পড়বে, তাহলে সে ঘুমানোর ভেতরও সওয়াব পাবে। আবার যখন ভোর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করবে এবং ফজরের নামায যথাসময়ে জামাআতের সাথে পড়বে এই জাগরণের জন্যও সওয়াব পাবে।

খাওয়াও সওয়াব উপবাসও সওয়াব

হযরত আলী (রা) বলতেন, একজন মানুষের খাওয়া দরকার সঠিকভাবে ইবাদত বন্দেগী করার জন্য। একজন মানুষ একেবারে কিছু না খেয়ে ইবাদত করতে পারে না, তাই কিছু খেতে হয়। আবার অতিভোজনের কারণে অনেক সময় ঘুম এসে যায় বা শরীরে নানা ধরনের অসুখ দেখা যায়। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটের তিনভাগের একভাগ পরিমাণ খেতে বলেছেন আর একভাগ খালি রাখতে বলেছেন।_কেউ যদি এ নিয়তে পরিমিত পরিমাণে খায় যে, যেন সে সঠিকভাবে ইবাদত করতে পারে, তাহলে তার খাওয়াও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

আবার আল্লাহকে খুশি করার জন্য যখন রোযা রাখবে, তখন তার রোযাও ইবাদত হবে। শুধু তাই নয়, ইফতারের সময় হলে যদি সওয়াবের নিয়তে তাড়াতাড়ি কিছু খায়, তাহলে তাড়াতাড়ি খাওয়ার কারণেও সওয়াব হবে। তাহলে দেখা গেল, একজন ঈমানদারের খাওয়া ও উপবাস উভয়ই ইবাদত হতে পারে।

আদরেও সওয়াব শাসনেও সওয়াব

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান-সন্ততিকে আদর করতে বলেছেন। জনৈক ব্যক্তি যখন বললেন, আমি আমার সন্তানকে কখনও আদর করে চুমু দেইনি। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভর্ৎসনা করেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হোসাইনকে তাঁর কাঁধে নিতেন। এমনকি নামাযের সময় পর্যন্ত তাদেরকে সাথে রাখতেন। সন্তানকে আদর করলেও সওয়াব আছে। আবার ছেলে বা মেয়ের বয়স সাত বছর হবার পর তাকে নামাযের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির তালিম দিতে হবে। দশ বছর হবার পর আদর করে যদি তাকে নামায পড়ানো না যায়, প্রয়োজনে মারতে হবে। এ থেকে বুঝা গেল, দীনের পথে সন্ত ানদেরকে পরিচালিত করার জন্য আদর করাও সওয়াব আবার প্রয়োজনে শাসন করাও সওয়াব।

www.pathagar.com

দান করাতেও সওয়াব না করাতেও সওয়াব

কাউকে কিছু দান করা সওয়াবের কাজ। আবার ক্ষেত্র বিশেষে কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকাও সওয়াবের কাজ। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাউকে ভালবাসল অথবা আল্লাহকে খুশি করার জন্যই কারো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করল। আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাউকে কিছু দান করল, আবার আল্লাহকে খুশি করার জন্যই কাউকে কিছু দান করা থেকে বিরত থাকল, সে ঈমানের পূর্ণতা লাভ করল।"

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কাউকে কিছু দান করা যেমনি সওয়াবের কাজ হতে পারে, আবার দান করা থেকে বিরত থাকাটাও সওয়াবের কাজ হতে পারে। মনে করুন, একজন ব্যক্তির কাছে কেউ মসজিদ, মাদ্রাসা বা কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করল। এমতাবস্থায় দান করা খুবই নেকীর কাজ। আবার কেউ যদি সিনেমা হল স্থাপন, নৃত্য অনুষ্ঠান, বা অশ্লীল কোন আসর কিংবা যে কোন ধরনের পাপ কাজে চাঁদা চায়, সে সময় দান না করাটাই সওয়াবের কাজ।

গোপনে দানেও সওয়াব প্রকাশ্যে দানেও সওয়াব

একজন ঈমানদার আল্লাহকে খুশি করার জন্য কিছু দান করা নেকীর কাজ। তবে প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করার মধ্যে নেকী বেশি। কেননা প্রকাশ্যে দান-খয়রাতে প্রদর্শনেচ্ছা বা খ্যাতি লাভের বাসনা (রিয়া) মনে উঁকি দিতে পারে। তবে নিজে দান করে অপরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ প্রকাশ্যে দান করে তাতেও সওয়াব আছে।

ভালবাসায়ও সওয়াব ভাল না বাসাতেও সওয়াব

যদি আল্লাহকে খুশি করার জন্য একজন ঈমানদার আরেকজন ঈমানদারকে ভালবাসে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে হাশরের ময়দানে আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, আল্লাহ বলেন, "আমার মহব্বত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়, যে ব্যক্তি একে অপরকে আমার জন্যই ভালবাসে।" একজন ঈমানদারের সাথে আরেকজন ঈমানদারের সম্পর্ক হতে হবে খুবই মজবুত। আল্লাহ কুরআনে শিশা ঢালা প্রাচীরের মত মজবুত সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন। এ ধরনের মহব্বত সৃষ্টি করার জন্য একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করাও সওয়াবের কাজ। একে অপরকে যদি কোন কিছু উপহার দেয় বা মেহমানদারী করায়, তাও সওয়াবের

www.pathagar.com

কাজ। এক মুমিন আরেক মুমিনকে ভালবাসা যেমনি সওয়াবের কাজ তেমনিভাবে যারা দীনের ক্ষতি করে, দীনের বিরোধিতা করে তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখাও সওয়াবের কাজ। হ্যাঁ, তাদেরকে দীনের পথে আনার জন্য সম্পর্ক রাখার কথা আলাদা। এ ধরনের সম্পর্ক রাখাটা অবশ্যই নেকীর কাজ। তবে কারো সাথে এমনভাবে সম্পর্ক রাখা যাবে না, যে সম্পর্কের কারণে আল্লাহর দীনের ক্ষতি হয়। কারো যদি এ ধরনের সম্পর্ক থাকে তাহলে তা ছিন্ন করাটা সওয়াবের কাজ। আবার সম্পর্ক নেই কিন্তু দীনের প্রয়োজনে সম্পর্ক সৃষ্টি করাটাও নেকীর কাজ।

স্ত্রীর সাথে ভালবাসাও সওয়াব

একজন ঈমানদার মুহাররাম নয় এমন কোন নারীর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখতে পারে না। কিন্তু মা, মেয়ে, খালাসহ যেসব নারী মুহাররাম তাদেরকে মন দিয়ে ভালবাসা সওয়াবের কাজ। যে মেয়ের দিকে তাকানো একজন ঈমানদারের জন্য গুনাহ ছিল, সে মেয়ে যদি তার স্ত্রী হয়ে যায়, তাহলে প্রেম-প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানো সওয়াব। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসাও সওয়াব। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি গ্লাসের যে পাশ দিয়ে পানি পান করতাম রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সে পাশ দিয়ে পানি পান করতেন। এটাই হল স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার নিদর্শন। অনেকে মনে করেন, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় কোন মূল্য নেই। বিষয়টি ঠিক নয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মাঝে যে ধরনের মধুর সম্পর্ক ছিল, সে ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য স্বামী-স্ত্রী যাই করবে তাই সওয়াব।

যে-কোন প্রাণীকে দয়া করলেও সওয়াব

শুধু মানুষকে নয়, আল্লাহর সৃষ্ট যে কোন প্রাণীকে দয়া করার মধ্যে সওয়াব আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি আমার পানির কূপ থেকে পানি উঠিয়ে আমার উটগুলোকে পান করানোর পর যখন দেখি যে, অন্যের উটও পানির পিপাসা মিটাতে এসেছে। তখন আমি তাদেরকেও পানি পানের ব্যবস্থা করে দেই। এতে কি আমার কোন সওয়াব অর্জিত হবে। এ কথা শুনে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণে দয়া করলে সওয়াব পাওয়া যাবে।" (আহমদ)

অন্য এক হাদীসে আছে, অনেক আগের যমানার কোন এক মানুষ পথ চলতে চলতে খুব বেশি গরমের কারণে পিপাসিত হয়ে পড়লেন। তিনি অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর পানির কূপের সন্ধান পেলেন। কিন্তু সেখানে পানি

www.pathagar.com

উঠানোর জন্য কোন বালতি বা অন্যকিছু ছিল না। তাই নিজে কূপে নেমে পিপাসা নিবারণ করলেন। কূপ থেকে উঠার পর দেখেন, একটি কুকুর কূপের পাশে ঈষৎ-ভেজা বালি চুষে পানির সন্ধান করছে। তিনি এটা দেখে মনে মনে চিন্তা করলেন, একটু আগে পানির জন্য আমার যে অবস্থা হয়েছিল নিশ্চয় কুকুরটিরও ঠিক সেই অবস্থা। তাই তিনি কুকুরকে পানি পান করানোর চিন্তা করলেন। কিন্তু সেখানে পানি উঠানোর মত কিছু ছিল না। এ কারণে লোকটি তার পায়ের চামড়ার মোজা খুলে কূপে নেমে পানি ভর্তি করে নিজের দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে তা বহন করে উপরে উঠে সেই কুকুরটিকে পানি পান করালেন। আল্লাহ্ ঐ লোকটির উপর খুবই খুশি হলেন এবং তাঁর যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দিলেন। এ কথা শুনার পর আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারেও কি আমরা সওয়াব পাবো? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, প্রতিটি তাজা প্রাণে দয়া করার মধ্যে সওয়াব আছে। (বুখারী ও মুসলিম)

পায়খানা-পেশাবেও সওয়াব আছে

কেউ টয়লেটে যাওয়ার সময় যদি বাম পা আগে দেয় এবং ডান পা আগে দিয়ে বের হয় তাহলে সুন্নাতের উপর আমল করার কারণে সওয়াব পাবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা-পেশাব করার সময় কিবলামুখী হয়ে না বসার জন্য বলেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা-পেশাব করার পদ্ধতি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার পর কোন কোন ইহুদী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলেছে, তোমাদের নবী কেমন! পায়খানা-পেশাব কিভাবে করতে হবে তাও শিক্ষা দিচ্ছেন? এ থেকে বুঝা যায়, মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যেক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সওয়াবের ভেতর সওয়াব

একজন ঈমানদার এক সওয়াবের ভেতর আরেক সওয়াব পেতে পারে। যেমন মসজিদে যাওয়া সওয়াবের কাজ। যদি মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে দেয় এবং মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়ে, তাহলে এটার জন্যও সে সওয়াব পাবে। আবার মসজিদ থেকে বের হবার সময় বাম পা আগে দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু জুতা পায়ে দেওয়ার সময় ডান পা আগে দেওয়া সুন্নাত। এখন কেউ যদি বাম পা আগে দিয়ে বের হবার পর ডান পায়ে প্রথমে জুতা পরিধান করে তাহলে সওয়াবের ভেতর সওয়াব পাবে।

www.pathagar.com

সব নেক আমলই গুরুত্বপূর্ণ

কুরআন ও হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে তা সবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ কার কোন্ আমলে খুশি হন তা আল্লাহই ভাল জানেন। তাই সব ধরনের আমলই গুরুত্ব দিয়ে পালন করা দরকার। কোন আমলই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সব আমলকেই ফরয করে দেননি, সেহেতু ফরযকেই ফরয হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কেউ হাতে গুনে গুনে নফল ইবাদতের সওয়াবের হিসাব করেন। তারা নফলের ফযিলতের কথা যত বেশি বলেন, সে অনুযায়ী ফরযের কথা বলেন না। কারো ফরয আমল যদি ঠিক না থাকে, তাহলে অতিরিক্ত আমল কতটুকুই বা সহায়ক হবে? অনেক সময় পরীক্ষায় আবশ্যকীয় বিষয় থাকে আবার অতিরিক্ত বিষয় থাকে। আবশ্যকীয় বিষয়ে পাশ করার পর অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর যোগ হয়। কিন্তু কেউ যদি আবশ্যকীয় বিষয়ে পাশ না করে তাহলে অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর কোন কাজে আসে না। এটা দুনিয়ার পরীক্ষার নিয়ম। আখরাতের ক্ষেত্রেও তাই।

আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদার বান্দাদের যে কোন আমলেই খুশি হয়ে যেতে পারেন। আবার যে কোন ধরনের খারাপ আমলেই বেশ রাগান্বিত হতে পারেন। তাই বলে আল্লাহ যা ফরয করেছেন তাকে কম গুরুত্ব দিয়ে তিনি যা ফরয করেননি তার পিছনে লেগে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে যে আমল বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাকেই ফরয বা ওয়াজিব করা হয়েছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনেও দেখা গেছে, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনকি দুই ফরয যখন এক সাথে করা দরকার হত, তখন তিনি তা যথাযথভাবে করার চেষ্টা করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কখনও যদি মনে হত দুইটি ফরয এক সাথে আদায় করা কষ্টকর সে সময় যে ফরযটি সময়ের আলোকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত তাই তিনি আগে করতেন। যেমন মক্কা বিজয়ের সময় রোযার মাস ছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রা) রোযা অবস্থায় ছিলেন। জিহাদ করা যেমনি ফরয তেমনি রমযানের রোযা রাখাও ফরয। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, রমযানের রোযা কাযা করা যাবে। কিন্তু জিহাদে যদি মুসলমানরা বিজয়ী না হয় তাহলে এটা দীনের বড় ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে। তাই মুসলমানদের শারীরিক দিক বিবেচনা করে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারো। আবার কেউ ইচ্ছা করলে রোযা ভঙ্গ করে পরে কাযা করতে পারো।

এ থেকে বুঝা যায়, সময় ও অবস্থার আলোকে কোন কোন বিষয়কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাধান্য দিতেন। যেমন একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হল, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি জবাব দিলেন, আস্‌সালাত, অর্থাৎ নামায। আরেক সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হল কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি এর জবাবে বললেন, আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। অন্য এক সময় তাঁকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, মাতা-পিতার খিদমত করাই সর্বোত্তম। একই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর রাসূলের বিভিন্ন ধরনের জবাবের কারণ ব্যাখ্যা করে উলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় প্রশ্নকারী বা কোন এলাকায় যে বিষয়ে দুর্বলতা দেখতেন সে বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কারো মাঝে যদি দেখতেন, জিহাদের আগ্রহের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই; কিন্তু ঠিক মত নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, তখন তাকে জিহাদের তুলনায় নামাযের প্রতি মনোযোগী করার চেষ্টা করতেন। আবার কেউ ঠিকমত নামায পড়ে; কিন্তু জিহাদে যেতে ভয় পায়, তখন তাকে জিহাদের প্রতি আগ্রহী করার চেষ্টা করতেন।

আজকের প্রেক্ষাপটেও চিন্তা করে দেখতে হবে, আল্লাহর নবীর কোন্‌ সুন্নাত কোন্‌ সময় পালন করতে হবে। যেমন আল্লাহর নবীর নামে দরূদ পাঠে সওয়াব আছে। কিন্তু যে সময় ইসলামবিরোধীরা মুসলমানদেরকে আগুনে পুড়ে হত্যা করছে, সে সময় আল্লাহর নবীর নামে বসে বসে দরূদ পাঠ করলেই নবীর সুন্নাত আদায় হয়ে যায় না। এ সময় আল্লাহর নবীর বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইনের সুন্নাত পালন করা জরুরি। হ্যাঁ, এ ধরনের সুন্নাতের উপর আমল করার সময়ও মুখে মুখে আল্লাহর নবীর নামে দরূদ পাঠ করা যায়। কিন্তু যারা এ ধরনের সুন্নাত পালনের মানসিকতা রাখেন না। শুধুমাত্র মীলাদের মাধ্যমে আল্লাহর নবীর ভালবাসার প্রমাণ দিতে চান আল্লাহ এ ধরনের ভালবাসার কতটুকু মূল্য দিবেন তা একটু চিন্তা করা দরকার।

আমরা যারা আখিরাতে নাজাত পেতে চাই আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে চলতে হবে। আমাদের সকল কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে, আমরা আল্লাহপ্রেমিক। আমাদের মাঝে দুনিয়ার প্রেম নেই। আমরা আল্লাহর নবীর আদর্শের অনুসারী। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আমরা অন্য কোন মত, পথ, বা আদর্শের অনুসারী নই। আমরা জীবন পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তির কাছে

www.pathagar.com

দিক-নির্দেশনা পেতে চাই না। আমরা কুরআন ও হাদীসেরই দিক-নির্দেশনা লাভ করতে চাই। কোন ব্যক্তির কথা যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হয়, তাহলে আমরা তার কথা মানতে প্রস্তুত। আর তার কথা যদি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত হয়, তাহলে তার অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করাকেই অপরিহার্য মনে করি।

আখিরাতে নাজাতের ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

নিয়তের বিশুদ্ধতা সকল নেক আমলের জন্য অপরিহার্য

আমরা আখিরাতে নাজাতের জন্য অনেক নেক আমল করার চেষ্টা করি। কিন্তু যে কোন নেক আমাল আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন। নিয়তের বিশুদ্ধতা ছাড়া কোন নেক আমলই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। খুলুসিয়্যাত ছাড়া আমল করলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান, সদকা, দীনের পথে জিহাদ সবকিছুই বৃথা হয়ে যাবে। তাই কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় নিয়তের পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই জন্য।" (যুমার ঃ ২, ৩)

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন, এ আয়াতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্য খাঁটি করুন। যাতে শির্ক, রিয়া ও বাহ্বা কুড়াবার নাম-গন্ধও না থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করল, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ! আমি মাঝে-মধ্যে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত থাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ তাআলা এমন কোন বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন।[৬২]

এক হাদীস থেকে জানা যায়, আখিরাতে কিছু আলিম, শহীদ ও দানশীলকে দোযখে দেওয়া হবে। তখন আলিম বলবে, ইয়া আল্লাহ! আমি ইলমে দীন

www.pathagar.com

শিখেছি তারপরও কেন আমাকে দোযখে দেওয়া হল? আল্লাহ্ জবাব দেবেন, তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য ইল্‌ম শিখনি। তুমি ইল্‌ম শিখেছ আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্য। দুনিয়াতে তুমি তা পেয়ে গেছ। শহীদ বলবে, হে আল্লাহ! আমি জিহাদ করে শহীদ হলাম তবু কেন আমাকে দোযখে দেওয়া হল? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি গনীমতের মাল লাভ কিংবা বীর হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্য জিহাদে গিয়েছ। আমার দীন কায়েমের জন্য যাওনি। অনুরূপভাবে দানশীলকে বলা হবে তুমি দানশীল হিসেবে যশ-খ্যাতি লাভের জন্য দান করেছ। আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি দান করনি। তাই তোমাকে দোযখে দেওয়া হল।

মানুষ কোন কাজ করলে যশ-খ্যাতির বাসনা অনেক সময় লুক্কায়িত থাকে। এটা দূষণীয়। কিন্তু ব্যক্তির নিয়তের পরিশুদ্ধতা থাকার পরও যদি খ্যাতি অর্জন হয়ে যায়, এটা দূষণীয় নয়। কারণ এর জন্য ব্যক্তির কোন ইচ্ছা ছিল না। কোন আমল করার আগে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যাতে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে খুলুসিয়্যাত নষ্ট করে না দেয়। আর আমাদেরকে কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্য সব আমল করতে হবে। এমনকি কোন কোন বুজুর্গ ব্যক্তি মনে করেন, জান্নাত লাভের আশায় নেক আমল করাও ঠিক নয়। নেক আমল করতে হবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য। এ প্রসঙ্গে একজন বুজুর্গ বলেন, হে আমার রব! বেহেশ্‌ত ও দোযখ দিয়ে আমি কি করব? আমিতো শুধু তোমাকেই চাই। এ কথা ঠিক যে, যে ব্যক্তির উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তাকে অবশ্যই বেহেশতের সুন্দর আসন দান করবেন। তাকে তিনি দোযখে দিবেন না। দোযখে তো তারাই যাবে যাদের উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট।

আল্লাহর রহমত ছাড়া শুধু আমল দিয়ে নাজাত পাওয়া যাবে না

আমরা অনেক সময় মনে করি, নেক আমল বেশি করলেই জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যাবে। এটা ভুল ধারণা। কারণ আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করে যত নিয়ামত দান করেছেন, আমি যদি সব সময় ইবাদতে লিপ্ত থাকি তবু আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হবে না। তাই আখিরাতে নাজাত আমলের উপর নয়, বরং আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল। এ কারণে জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর এ কথা কখনও মনে করবে না যে, নিজেদের আমলের কারণেই জান্নাতে এসেছে। তারা মনে করবে এটা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। তারা নিজেদের আমলের বড়াই বা অহংকার করবে না। তারা জান্নাতেও আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "খুব ভালভাবেই

www.pathagar.com

জেনে রাখ, তোমরা নিছক নিজেদের আমাদের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও? রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও'। তবে আল্লাহ যদি আমাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের আবরণে ঢেকে নেন।"

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের আমল আমাদেরকে জান্নাতে নিতে পারবে না। তাই বলে আমল ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ আমল ছেড়ে দেওয়াটাই তো আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। আল্লাহ যে আমল করতে বলেছেন তা পালন করা না হলে আল্লাহ অখুশি হবেন। তাই সবসময় নেক আমল করার পাশাপাশি আল্লাহর রহমত কামনা করে দোয়া করতে হবে। আরও দোয়া করতে হবে আমরা কখনও যেন বিপথগামী না হই।

হেদায়াতের উপর অবিচল থাকার জন্য দোয়া করতে হবে

অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ভাল লোকও খারাপ হয়ে যায়। অনেকে হেদায়াতের পথে চলার পর গোমরাহ হয়ে যায়। এমনকি কোন কোন ওহী লেখকও পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আমাদেরকে সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেদায়াতের পথে অটল ও অবিচল রাখেন।

হাদীস থেকে জানা যায়, একজন ব্যক্তি সারাজীবন নেক আমল করবে, কিন্তু হঠাৎ করে এমন একটা খারাপ কাজ করবে যার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে জাহান্নামে দেবেন। আবার একজন ব্যক্তি সারাজীবন খারাপ কাজ করে শেষ সময়ে এমন একটা ভাল কাজ করবে যার কারণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বেহেশত দান করবেন। একজন ব্যক্তি রাস্তায় পথ চলতে যেমনি পিছলে পড়ে যেতে পারে, তেমনি একজন ব্যক্তি হেদায়াতের পথে চলার পরও গোমরাহ হয়ে যেতে পারে। এ জন্য আল্লাহ আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, "হে আমার পালনকর্তা! সরলপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত কর না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছু দাতা।" (আলে ইমরান ঃ ৮)

মানুষ শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণেই সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে চলতে বাধাগ্রস্ত হয়। এ কারণে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে।

www.pathagar.com

শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে হবে

শয়তান মানুষের চির দুশমন। শয়তান চায় না মানুষ সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে চলুক। তাই মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সর্বদা মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা দেয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শয়তান মানুষের অন্তর দখল করে বসে থাকে। যখন ব্যক্তি আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে, তখন সে সরে যায়। আবার যখন মানুষ আল্লাহ্র স্মরণ থেকে দূরে সরে আসে তখন শয়তান আবার সেখানে এসে কুমন্ত্রণা যোগাতে থাকে।" (বুখারী)

মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে শয়তান মানুষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ কারণে তাকে এই অনুমতি দান করেছেন। আল্লাহ্ শয়তানকে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দানের শক্তি দেওয়ার পাশাপাশি মানুষকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, "শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান জানায় যেন তারা জাহান্নামী হয়।" (ফাতির ঃ ৬)

শয়তান দুনিয়াকে মোহনীয় করে তোলে এবং মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। তাই আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" (ফাতির ঃ ৫)

শয়তান মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে মানুষকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করে দেওয়ার পরও মনে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, "এটা ছোটখাটো জিনিস; আল্লাহ্ এটার জন্য শাস্তি দেবেন না।" শয়তানের বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, "হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল এমতাবস্থায় যে, তাদের পোষাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে–যাতে তাদের উভয়কে তাদের লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। শয়তান এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।" (আরাফ ঃ ২৭)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, যারা আল্লাহ্ তাআলাকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে সঠিক পথ দেখান না। আর শয়তান

www.pathagar.com

সবসময় চায় তার দল বড় করতে। কারণ জাহান্নামে সে একা জ্বলতে চায় না। তার সাথে আরো অনেককে সঙ্গী করতে চায়।

এ আয়াত থেকে আরো স্পষ্ট হল যে, শয়তান যেমনিভাবে হযরত আদম ও হাওয়াকে বেহেশত থেকে বের করেছিল, একইভাবে আদম সন্তানকে বেহেশতে যাবার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু হযরত আদম (আ) যেভাবে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন, তেমনিভাবে আদম সন্তানেরাও শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভের পথে চলতে পারে। যারা আল্লাহর সন্তোষ লাভের পথে চলতে চায় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন। শয়তান তাদেরকে ভ্রষ্টপথে পরিচালিত করতে পারে না। এ কথা শয়তান নিজেই উপলব্ধি করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেন, "সে (শয়তান) বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল সেদিন পর্যন্ত যার সময় আমার জানা আছে। সে বলল, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া। আল্লাহ বললেন, তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি। তোমাকে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে দিয়ে আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (ছোয়াদ ঃ ৭৯-৮৫)

শয়তান মানুষকে বিপথগামী করতে সবসময় কুমন্ত্রণা দেয়। এ কারণে আল্লাহ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হবার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" (আরাফ ঃ ২০০)

মূলত শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহর কাছেই পানাহ চাইতে হবে। আল্লাহ এ কারণে কুরআন তিলাওয়াতের আগে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পানাহ চাইতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, "অতএব, আপনি যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।" (নাহল ঃ ৯৮)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক কাজের শুরুতে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত এমন একটি কাজ যা দ্বারা শয়তান পলায়ন করে। শয়তানী চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ কুরআনের হেদায়াত গ্রহণ করে। মানুষ যেন কুরআন থেকে সঠিক হেদায়াত পেতে না পারে সেজন্য শয়তান কুরআন তিলাওয়াতকারীর

www.pathagar.com

মনেও কুমন্ত্রণা দিতে পারে। তাই কুরআন তিলাওয়াতের আগেও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দান করেছেন।

শয়তান মানুষকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে পথভ্রষ্ট করে। কিন্তু কিভাবে ওয়াসওয়াসা দেয় তার বিস্তারিত জ্ঞান মানুষের জানা নেই। বিভিন্নভাবে শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করতে পারে। সরাসরি পাপ কাজে লিপ্ত করেও কুমন্ত্রণা দিতে পারে, আবার নেক কাজের মধ্যেও কুমন্ত্রণা দিয়ে নেক কাজকে ভুণ্ডল করে দিতে পারে। আর শয়তানী কুমন্ত্রণা শুধু জিনদের পক্ষ থেকে হয় না, বরং জিন-শয়তানের পাশাপাশি মানবরূপী শয়তানও মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। এ কারণেই আল্লাহ্ সূরা আন নাসে এভাবে দোয়া শিখিয়েছেন, "(হে নবী!) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের কাছে। আমি আশ্রয় চাই মানুষের (আসল) বাদশাহ্-এর কাছে, (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের মাবূদের কাছে। (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়েই) গা ঢাকা দেয়। জিনদের মধ্য থেকে হোক কিংবা মানুষের মধ্য থেকে হোক-তাদের (সব ধরনের) অনিষ্টের হাত থেকে (আমি আমার মালিক আল্লাহ্ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই)। (নাস ঃ ১-৬)

এ সূরার তাফসীরে সাইয়েদ কুতুব লিখেন, "শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণার আক্রমণ বহুমুখী। সে কোন্ দিক থেকে মানুষকে ধরবে, তা কেউ বলতে পারে না। কোন্ উপায়-উপকরণ দিয়ে সে মানুষকে বিপথগামী করে, তাও কেউ জানে না। 'ওয়াসওয়াসী' (কুমন্ত্রণা) প্রদানকারীর প্রধান চরিত্র বলা হয়েছে যে, সে খান্নাস। এ কথা বলে একদিকে বুঝানো হয়েছে, সে গোপনে-অদৃশ্যে সবসময় সুযোগ ও সুবিধার সন্ধানে থাকে। যখনই সুযোগ পায় তখনই নিতান্ত চুপিসারে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে এবং তাতে কুমন্ত্রণা যোগায়। অপরদিকে এর মাধ্যমে তার এ গুণটিও বলা হয়েছে যে, খান্নাস সে ব্যক্তির সামনে অত্যন্ত দুর্বল, যে শয়তানের গোপন প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং তা থেকে সতর্ক হয়ে নিজের অন্তরকে গোপন পথগুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখে। শয়তান সে মানুষ হোক কিংবা জিন হোক, যখনই কেউ তার সামনাসামনি হবে তখন পলায়ন করে। এরপর সে আবারও আসে; তবে নীরবে। মুমিনের প্রস্তুতির সামনে শয়তান সদাই দুর্বল। সাইয়েদ কুতুব আরো বলেন, শয়তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার এ পথ দীর্ঘ। কিয়ামত পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকবে। শয়তান চিরদিনই এভাবে অতর্কিত আক্রমণ চালাতে থাকবে। একবার মুমিনের অন্তরকে জাগতে দেখলে কিছুক্ষণের জন্য লুকিয়ে যাবে। আবার এসে হামলা করবে, কুমন্ত্রণা দেবে। সে সবসময় সুযোগের সন্ধানে থাকবে কখন মুমিন হৃদয় গাফেল হয়।"[৬৩]

www.pathagar.com

এ সূরার তাফসীরে মাওলানা মওদূদী (র) লিখেন, "ওয়াসওয়াসা বা প্ররোচনা হল অনিষ্ট কর্মের সূচনাবিন্দু। যখন একজন অসতর্ক বা চিন্তাহীন মানুষের মনে তার প্রভাব পড়ে, তখন প্রথমে তার মধ্যে অসৎ কাজ করার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। তারপর আরো প্ররোচনা দান করার পর এ অসৎ আকাঙ্ক্ষা অসৎ ইচ্ছায় পরিণত হয়। এরপর প্ররোচনার প্রভাব বাড়তে থাকলে অসৎ ইচ্ছা অসৎ সংকল্পে পরিণত হয়। তারপর এর শেষকর্ম হয় অসৎকর্ম। তাই প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার অর্থ হবে, অনিষ্টের সূচনা যে স্থান থেকে হয়, মহান আল্লাহ যেন সেই স্থান থেকেই তাকে নির্মূল করে দেন। প্ররোচনা দানকারীদের অনিষ্টতাকে অন্য এক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রথমে তারা খোলাখুলি কুফরী, শির্‌ক, নাস্তিকতা বা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আল্লাহপন্থীদের সাথে শত্রুতার উসকানী দেয়। এতে ব্যর্থ হলে এবং মানুষ আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করে গেলে তারা তাকে কোন না কোন বিদআতের পথ অবলম্বনের প্ররোচনা দেয়। এতেও ব্যর্থ হলে তাকে গুনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এখানেও সফলতা অর্জনে সক্ষম না হলে মানুষের মনে এ চিন্তার যোগান দেয় যে, ছোট ছোট সামান্য দু'চারটি গুনাহ করে নিলে তো কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এভাবে এ ছোট গুনাহই যদি বিপুল পরিমাণে মানুষ করতে থাকে তাহলে বিপুল পরিমাণ গুনাহে ডুবে যাবে। এ থেকেও যদি মানুষ পিঠ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তাহলে শেষবারের মত তারা চেষ্টা করে মানুষ যেন আল্লাহর সত্য দীনকে শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দেয়, তাহলে জিন ও মানুষ শয়তানদের সমস্ত দল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে লোকদের উসকানী দিতে থাকে ও উত্তেজিত করতে থাকে। তার প্রতি ব্যাপকভাবে গালিগালাজ, অভিযোগ ও দোষারোপের ধারা বর্ষণ করতে থাকে। চতুর্দিক থেকে তাকে দুর্নাম ও লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করতে থাকে। তারপর শয়তান সেই মর্দে মুমিনকে ক্রোধান্বিত করতে থাকে। সে বলতে থাকে এসব কিছু নীরবে সহ্য করে নেওয়াতো বড়ই কাপুরুষের কাজ। ওঠো, এ আক্রমণকারীদের সাথে সংঘর্ষ বাধাও। সত্যের দাওয়াত রুদ্ধ করতে এবং সত্যের আহ্বায়কদের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে এটি হয় শয়তানের শেষ অস্ত্র।"[৬৪]

শয়তান নানাভাবে মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে জাহান্নামী করতে চায়। আল্লাহ যাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় দিবেন, শুধু তার পক্ষেই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। মানুষরূপী শয়তানের স্বরূপ অনেক সময় মানুষের কাছে ধরা পড়লেও জিন শয়তানকে মানুষ দেখতে পায় না। কিন্তু আল্লাহ দেখতে পান সে কিভাবে মানুষকে খারাপ পথে উসকানী দিচ্ছে। এ

www.pathagar.com

কারণে আমাদেরকে সবসময় শয়তানের কুমন্ত্রণা ও পাপ কাজের প্রতি উসকানী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে হবে। এ দোয়াই আল্লাহ্ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় শিখিয়েছেন। সূরা আল মুমিনূনে ইরশাদ হয়েছে, "বল, হে আমার রব! আমি শয়তানের উসকানী থেকে তোমার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি।" (মুমিনূন ঃ ৯৭) শয়তান যেন আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করতে না পারে এ জন্য সদা সতর্ক থাকতে হবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ্ থেকে বিরত রাখা

মানুষকে আল্লাহ্ সুন্দর শারীরিক কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ মানুষকে অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। পা দিয়েছেন হাঁটার জন্য। মানুষ দুনিয়াতে গাড়িতে চললে ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া গাড়ি 'দুটি পা' দিয়ে মানুষ কত শত মাইল হাঁটে, তার কোন ভাড়া লাগে না। আল্লাহ্ মানুষকে লক্ষ লক্ষ ভিডিও ক্যামেরার চেয়ে শক্তিশালী চোখ দিয়েছেন। চোখ একটু বন্ধ করলে কত ছবিই মানসপটে ভেসে উঠে। আল্লাহ্ কান দিয়েছেন শুনার জন্য তা দিয়ে কত কথাই শুনি। টেপ রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে রেকর্ডিং চার্জ দিতে হয়। কিন্তু কানে শুনার পর যেসব কথা রেকর্ড হয় তার জন্য আল্লাহকে কোন চার্জ দিতে হয় না। যাদের হাত, পা, চোখ, কান সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিক আছে, তারা এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজনীয়তা যতটুকু অনুভব করেন তার চেয়ে অনেক বেশি অনুভব করেন যারা বিকলাঙ্গ, যাদের কোন অঙ্গে ত্রুটি আছে। আল্লাহ্ যে আমাদেরকে এসব অঙ্গ চমৎকারভাবে দিয়েছেন তার জন্য আমাদেরকে কিছুই করতে হয়নি। আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেই তা দিয়েছেন। আর যাদের এসব অঙ্গে ত্রুটি আছে তাদেরকে আল্লাহ্ এর প্রতিদান অন্যভাবে দিবেন।

কিন্তু আমাদের যাদের এসব অঙ্গ ঠিকভাবে দিয়েছেন তাদের দায়িত্ব কি? প্রথমত আমাদের দায়িত্ব হল আল্লাহ্ যে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিকভাবে দিয়েছেন এজন্য আল্লাহর শোকরগুজার হওয়া। দ্বিতীয়ত, যাদের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ত্রুটি থাকার কারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন, তাদেরকে সামর্থ্যের আলোকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। তৃতীয়ত, এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর হুকুমমত পরিচালিত করা।

আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের জবান দিয়ে আল্লাহর যিকির-আযকার করতে পারি। দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে পারি। দীনের নসীহত দিতে পারি। কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি। আর একটু অসচেতন হলে এ জবান দ্বারা কারো গীবত করতে পারি। কারো দোষ চর্চা করা, মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা করা, ধোঁকাবাজি করা, কোন মানুষকে কটু কথা বলা সবই

www.pathagar.com

জবান দ্বারা করা যায়। আমরা যদি এ ধরনের পাপ কাজে জবানকে ব্যবহার করি তাহলে কিয়ামতের দিন এ জবানই আল্লাহর কাছে বলে দেবে তাকে কি কাজে ব্যয় করেছি। তাই জবানকে আল্লাহর হুকুমমত পরিচালনার জন্য সবসময় সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। আখিরাতে নাজাতের জন্য জবানের হেফাযত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ্ আমাদেরকে কান দিয়েছেন এ কান দিয়ে ভাল কথা শুনতে পারি। ওয়াজ নসীহত, কুরআন তিলাওয়াত, দীনের বয়ান যা কিছু কান দ্বারা শুনি এ ব্যাপারে কান আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেবে। আর যদি গালমন্দ, গীবত, চোগলখোরীসহ পাপের কথা শুনার কাজে কানকে ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে সে কান আল্লাহর আদালতে সবকিছু বলে দেবে। সে সময় কানের কারণে যেন আযাব ভোগ করতে না হয় এ জন্য কানকে সবসময় পাপ কথা শুনা থেকে বিরত রাখতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে চোখ দিয়েছেন, চোখ দিয়ে আমরা কুরআন ও হাদীস পড়ি। দীনি কিতাব অধ্যয়ন করি। অন্ধকার রাতেও চোখের আলোর সাহায্যে মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা করি। এ চোখ দিয়ে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততিকে দেখাশুনা করি। কোন মুসলিম অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাই। এভাবে নেকী হাসিলের ক্ষেত্রে চোখকে কাজে লাগাতে পারি। আবার এ চোখকে যদি অবৈধভাবে কোন নারীর দিকে তাকানোর কাজে ব্যয় করি, কিংবা কাউকে পাপ কাজ করতে দেখেও চুপ থাকি, তাহলে এ চোখই আমার আযাবের কারণ হবে। আর আমাকে আযাব দেওয়ার জন্য অন্য কারো সাক্ষ্য বা রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না। চোখের সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে পেট দিয়েছেন এবং পেটে ক্ষুধাও দিয়েছেন। আমরা এ পেটের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য হালাল পথে রুজি-রোজগার করতে পারি। হয়ত হালাল পথে রুজি করতে গিয়ে খুব বেশি ভাল খাবার-এর সুযোগ কারো কারো নাও হতে পারে। অর্থনৈতিক কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। যারা পেটের চাহিদা মেটানোর জন্য অবৈধ আয়-উপার্জনের পথ খোলা থাকার পরও আল্লাহকে ভয় করে সে ধরনের আয় না করে কষ্টকর জীবন-যাপন করেই পরিতৃপ্ত রয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে এমন অনেক খাবার দিবেন, যার তুলনা পৃথিবীর কোন খাবারের সাথে হয় না। আর যারা পেটের চাহিদা মেটানোর জন্য হারাম খাদ্য ভক্ষণ করেছে, অবৈধ উপার্জন করেছে, দুনিয়াতে অবৈধ টাকায় ভাল ভাল খাবার খেয়েছে, আখিরাতে তার জন্য কোন ভাল খাবার থাকবে না। তার জন্য থাকবে গরম পানি, পুঁজ, কাঁটাযুক্ত খাবার। তাই পেটের চাহিদা মেটানোর জন্য হারাম কোন কিছু খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আমাদেরকে যৌনাঙ্গ দিয়েছেন, যৌনশক্তি দিয়েছেন। নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের যৌনশক্তি নেই। তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষাও নেই। তাই তারা অবৈধ যৌনাচার করার প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ্ আমাদেরকে যৌনশক্তি ও যৌন আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। তিনি আরো ঘোষণা করেছেন, কেউ যদি তার যৌনাঙ্গকে দুনিয়াতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাকে আখিরাতে সুন্দরী, সুশ্রী, রূপবতী, যুবতী হুর দান করবেন। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি তার দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থান (অর্থাৎ যৌনাঙ্গ) আর দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী স্থানের (অর্থাৎ মুখের) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার হব। দুনিয়াতে অনেক কেলেঙ্কারির মূলে রয়েছে যৌনাঙ্গ। আখিরাতে দোযখের আযাব থেকে নাজাতের জন্যও যৌনাঙ্গকে যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতাসহ যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে রাখতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য বিবাহের যে নিয়ামত দান করেছেন, তার মাধ্যমে তথা পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করে শুধু গুনাহ্ থেকে বাঁচা যায় না, অনেক সওয়াবও পাওয়া যায়। তাই পাপাচার থেকে যৌনাঙ্গকে রক্ষার জন্য সবসময় সতর্ক থাকা উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে চিন্তাশক্তি দান করেছেন। আমরা ইচ্ছা করলে সবসময় নেক কথা ভাবতে পারি। নেক পরিকল্পনা করতে পারি। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে দীনের প্রয়োজনে নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কাজে চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাতে পারি। আর ইচ্ছা করলে পাপ কাজের প্রসারে চিন্তা শক্তির ব্যবহার করতে পারি। আমাদের চিন্তার ফলে সমাজে যদি কোন নেক কর্ম চালু হয়, তাহলে আমরা এর সওয়াব পাব। আর যদি কোন পাপ কর্ম আমাদের চিন্তার ফলে সমাজে চালু হয়, এর জন্য আমাদের মরণের পরও আমলের সাথে পাপ যোগ হবে। তাই আখিরাতে নাজাত পেতে হলে চিন্তাশক্তিকে সৎপথে ব্যয় করতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে হাত দিয়েছেন। এ হাতকে দীনী কিতাব লিখার কাজে ব্যবহার করা যায়। আবার দীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বা কুৎসা রটনার জন্যও ব্যবহার করা যায়। এ হাত দিয়ে দীনের পতাকা হাতে নিয়ে জিহাদ করা যায়। আবার বাতিল মতাদর্শ কায়েমের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধও করা যায়। আমরা যদি হাতকে দীনের পতাকা বুলন্দ করার কাজে ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের হাত জান্নাতে যাওয়ার জন্য সহায়ক হবে। আর যদি হাতকে দীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করি, হাত দ্বারা কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করি, তাহলে মনে রাখতে হবে, মাযলুম কিছু বলার আগেই আখিরাতে আমার হাত বলে দিবে আমি তাকে কোন কাজে ব্যবহার করেছি।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আমাদেরকে পা দিয়েছেন। এ পা দিয়ে আমরা কত স্থানে যাই। মসজিদে যাই, দীনী মাহফিলে যাই, হাট-বাজারে আরো কত স্থানে যাই। আমরা পা দিয়ে দিনের আলোতে চলাফেরা করি। রাতের আঁধারেও প্রয়োজনে হাঁটি। কখন কোথায় কোন্ কাজে পা ব্যবহার করছি পা তা আল্লাহ্র কাছে বলে দিবে। এখন পায়ে একটু আঘাত পেলে কত ঔষধ লাগাই। এ কারণে এ কথা মনে করার সুযোগ নেই যে, আমার পা আমার কথা মেনে চলবে। দুনিয়াতে আমার পা আমার কথা মেনে চলতে বাধ্য। কারণ আল্লাহ্ তাকে সেভাবেই অদেশ করেছেন। কিন্তু আখিরাতে আমার পা আমার কথা শুনবে না। আমার পা আল্লাহ্র কথা শুনবে। আল্লাহ্ যখন বলবেন, তোমাকে কোন্ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সব খুলে বল। তখন পা একে একে সব কাহিনী বলে দেবে। তাই নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধান হোন।কোন অসৎ কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

এভাবে যদি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপ কাজে ব্যবহার করা থেকে আমরা বিরত রাখতে পারি তাহলেই আমরা আখিরাতে নাজাত পাবো, ইনশাআল্লাহ্। আর এভাবে নেক কাজে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

প্রবৃত্তিকে দমন করে সবসময় তাকওয়ামণ্ডিত জীবন-যাপন করতে হবে

আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে আমাদের মাঝে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি দান করেছেন। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন, "শপথ মানব প্রকৃতির ও সেই সত্তার যিনি তাকে যথাযথ বিন্যাসে স্থাপন করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে তার পাপের ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার জ্ঞান দান করেছেন। নিঃসন্দেহে সেই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।" (শামস ঃ ৭-৯)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যে মানুষ নফসের কামনা-বাসনা অনুযায়ী চলে। সে জাহান্নামে যাবে। আর যে নফসের কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে সফলকাম হবে। তার শেষ আবাস হবে জান্নাত। মূলত জান্নাত তাদেরই আবাস যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্কে ভয় করে চলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের নিরঙ্কুশ মালিকানা আমারই। তাই আমি তোমাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড সম্পর্কে বারবার সাবধান করে দিয়েছি। নির্ঘাত হতভাগ্য পাপী ছাড়া আর কেউ এখানে প্রবেশ করবে না। যে পাপী কিয়ামতের এ দিনকে অস্বীকার করেছে এবং হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তবে যে আল্লাহ্কে বেশি বেশি ভয় করে, আমি তাকে এ আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখব। (লাইল ঃ ১৩-১৭)

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। এ কথা ঠিক যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলা সহজ, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করা কঠিন। যারা নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" (কাসাস ঃ ৫০)

কুরআনে নাফ্স শব্দটি ১৪০ বার, নুফূস ২ বার এবং আনফুস ১৫৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আর নাফ্স সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন ধরনের নাফ্সের কথা উল্লেখ আছে।

১. 'আন নফ্স আল আম্মারাহ' বা মন্দপ্রবণ চিত্ত। আল্লাহ হযরত ইউসুফের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি নিজেকে নির্দোষ বলে মনে করি না। মানুষের মনতো অবশ্যই মন্দপ্রবণ। কিন্তু সে ছাড়া, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।" (ইউসুফ ঃ ৫৩)

২. 'আন নাফ্স আল লাওয়ামাহ' অর্থাৎ তিরস্কারকারী চিত্ত। যে মন মন্দ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, মনে খারাপ চিন্তার উদ্রেক হলে তাকে তিরস্কার করে। আল্লাহ তাআলা এ ধরনের নাফস সম্পর্কে বলেন, "আমি শপথ করছি কিয়ামত দিনের, আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী মনের। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিগুলোকে একত্রিত করতে পারব না? বস্তুত আমি তার আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনরায় বিন্যস্ত করতে সক্ষম।" (কিয়াসাহ ঃ ১-৪)

৩. 'আন নাফ্স আল মুতমাইন্নাহ' অর্থাৎ প্রশান্ত চিত্ত। যে চিত্ত আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে এবং মন্দ প্রবৃত্তি পরিহার করে প্রশংসিত চরিত্রের অধিকারী হয়। এ ধরনের নাফ্স সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তারা ঈমান আনে এবং তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় আল্লাহর স্মরণে। জেনে রাখ আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।" (রা'দ ঃ ২৮) যেসব চিত্ত আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত সেসব চিত্ত সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (ফাজর ঃ ২৭-৩০)

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, মানুষকে নাফসই খারাপ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যেসব মানুষ নাফসের তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তারাই মূলত সফলকাম। তাদেরই আবাস হবে জান্নাত।

আখিরাতে নাজাতের জন্য কুরআন ও হাদীসে আরো অনেক আমলের কথা আছে। আখিরাতে নাজাত পেতে হলে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আমল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত তরীকা অনুযায়ী করতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের মনমত কিংবা কোন ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করা যাবে না। কখনও ভ্রান্ত পথে চললেও সাথে সাথে তওবা করে নিতে হবে।

গুনাহ্ হলেই তওবা করতে হবে

দুনিয়াতে ভুল করা মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। সৃষ্টিগতভাবে অনেক মানুষের ফিতরাতের মধ্যেই ভাল কাজ ও মন্দ কাজ করার শক্তি আছে। তবে তিনিই ইনসানে কামেল যিনি পাপ করার সাথে সাথে পাপের স্বীকৃতি দেন এবং ক্ষমা চান। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক হাদীস থেকে জানা যায়, তওবাকারীর তওবা কবুল হলে সে নিষ্পাপ শিশুর মত হয়ে যায়।

মূলত পাপ করা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ্ চান আল্লাহর বান্দারা পাপ করার পর ক্ষমা ভিক্ষা করুক। যারা ক্ষমা চায় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করেন। আর যারা পাপ করতেই থাকে, তাদেরই উপর আল্লাহ্ নারাজ থাকেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ্ না করতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে সরিয়ে দিতেন। অতঃপর এক জাতিকে পাঠাতেন; যারা গুনাহ্ করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইত আর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও নিষ্পাপ ছিলেন তবু তিনি সবসময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা গণনা করে দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই বৈঠকে একশবার এ দোয়াটি পড়েছেন, "আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন আমার তওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চয়ই তওবা কবুলকারী ও দয়াময়। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার যে, তওবা ও ইসতিগফার সমার্থক নয়। ইসতিগফার হল কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। আর

www.pathagar.com

তওবা হল, কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে ঐ কাজ না করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।[৬৫] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "হে যারা ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর, আন্তরিক বিশুদ্ধ তওবা। আশা করা যায় তোমাদের প্রভু তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত হয়।" (তাহরীম ঃ ৮০)

বান্দা যখন কোন অপরাধ করে, তখন আল্লাহ্ চান, সে তওবা করুক। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা দিনের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য রাতে এবং রাতের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন।" (মুসলিম)

আরেক হাদীসে আছে, "মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দার তওবা কবুল করেন।" এ কারণে, অপরাধ হয়ে গেলে সাথে সাথেই তওবা করা উচিত।

আমাদের সমাজে বলতে শুনা যায়, "আমি এত বেশি পাপ করেছি যে, আল্লাহ্ তো আমাকে মাফ করবেন না, তাই ভাল হয়ে লাভ কি। যখন দোযখে জ্বলতেই হবে তখন দুনিয়াতেই মজা করে নেই।" এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের অনেক জায়গায় ইরশাদ করেছেন, "তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হইও না।" তাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়; বরং কবীরা গুনাহ। খালেস মনে তওবা করলে আল্লাহ্ যে কোন ধরনের অপরাধ মাফ করতে পারেন। কেননা গাফুর, রাহীম, গাফফার, রহমান এসবই তো আল্লাহর সিফাত।

তাই বলে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মত এ কথা বিশ্বাস করার সুযোগ নেই যে, অপরাধ যাই করি না কেন আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কেননা আল্লাহ গাফফার। হ্যাঁ– এ কথা ঠিক, আল্লাহ্ যে কোন ঈমানদার বান্দার যে কোন অপরাধ মাফ করে দিতে পারেন। এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁর এখতিয়ার। কিন্তু আল্লাহ্ যে আপনাকে মাফ করবেন তার নিশ্চয়তা কি? আবার আপনাকে সাজা দিবেনই–তা আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন? তাই আমাদেরকে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশীও থাকতে হবে আবার আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে সদা চোখের পানিও ফেলতে হবে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন গুনাহ যেন না হয় সেদিকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। শয়তানের ওয়াসওয়াসায় গুনাহ্ হয়ে গেলে দেরি না করে তওবা করতে হবে। দ্বিতীয়বার যেন সে গুনাহ্ আর না হয় সে

www.pathagar.com

জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এরপরও যদি গুনাহ হয়েই যায়, তাহলে আবারও তওবা করতে হবে। তবে তওবাকে আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করা যাবে না। নিজের অপরাধের জন্য অপরাধী হিসেবে আল্লাহর কাছে মাফ্‌ চাইতে হবে।

ভ্রান্ত মত ও পথের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে

আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতেও বিশ্বাস করেন এমন অনেকেই আছেন যারা ভ্রান্ত মত ও পথ অনুসরণ করছেন। তাঁরা আখিরাতে নাজাতের জন্য এমন পথে চলছেন, যে পথটি সঠিক নয়। আর কেউ কেউ আছেন, কুরআন ও সুন্নাহর এমন ব্যাখ্যা করছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। সব হক্কানী উলামায়ে কেরামের অগ্রহণযোগ্য চিন্তা ও দর্শন অনুসরণ করার পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক পথে চলার মাধ্যমেই আখিরাতে নাজাতের পথ তালাশ করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ভুল পথে চলে কেউ দুনিয়াতেও গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারে না। এ ধরনের চিন্তা ও দর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এখানে ভ্রান্ত সকল ফেরকা সম্পর্কে আলোচনা উদ্দেশ্য নয় বলে মুষ্টিমেয় কতগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

রুহবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যবাদী দর্শন

আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে তারা আখিরাতে নাজাতের জন্য ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করছেন। কেউ কেউ তো ঘর-বাড়ি ছেড়ে বৈরাগী সাজার মধ্যেই নাজাত নিহিত বলে মনে করেন। বৈরাগ্যবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। বৈরাগ্যবাদী চিন্তা-চেতনা আজকে নতুন করে আবির্ভাব হয়নি। আল্লাহর রাসূলের সময়ও কারো কারো মধ্যে এ ধরনের চিন্তাধারা ছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈরাগ্যবাদী চিন্তা-দর্শনকে সমর্থন করেননি। তিনি স্পষ্টতই বৈরাগ্যবাদকে ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, তিনজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জানার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিদের ঘরে উপস্থিত হলেন। তাদেরকে যখন এ সম্পর্কে অবহিত করা হল, তখন তারা একে অতি অল্প মনে করলেন। তাঁরা বললেন, আমরা কি তাঁর মত হতে পারি? তাঁর তো আগের ও পরের সকল কিছুই আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, আমি সারারাত

www.pathagar.com

নামাযের মধ্যে কাটাব। অন্যজন বলল, আমি সারাজীবন রোযা রাখব, রোযা ভঙ্গ করব না। তৃতীয়জন বলল, আমি স্ত্রীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব, কখনোও বিবাহ করব না। এসব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, "তোমরা কেন এমন কথা বলছো? আল্লাহর শপথ, আমি কি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহ ভীরু নই? আমি কি আল্লাহর নাফরমানীকে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করে চলি না? কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখ, আমি রোযা রাখি আবার ইফতার করি। আমি নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিবাহও করি। আর এটাই হল, আমার নীতি-আদর্শ। কাজেই যে আমার নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করবে না, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, ইসলামে রুহবানিয়্যাতের কোন স্থান নেই। দুনিয়ার সামগ্রিক তৎপরতার মধ্যেই ইসলাম পালন করতে হবে। দুনিয়ার ঝামেলা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের আত্মরক্ষার জন্য ইসলাম বলেনি। ইসলাম চায় দুনিয়ার সকল কাজ দীনের আলোকে পরিচালিত করতে। আর মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য বৈরাগী হওয়ার সুযোগ নেই।

খারেজী সম্প্রদায়

খারেজীরা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে বহিরাগত বলে মনে করে। হযরত আলী ও আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর ঘটনায় যে ফয়সালা দেওয়া হয়, তারা তা অগ্রাহ্য করে। এতে আল্লাহর ইচ্ছার পরিবর্তে মানুষের রায় প্রতিফলিত হয়েছে বলে তারা মনে করে। তাদের মতে, হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) বৈধ খলীফা। অন্যরা বৈধ খলীফা নয়। তারা উগ্র ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে, সগীরা বা কবিরা যে-কোন রকমের গুনাহ করলে একজন মুসলমান কাফির হয়ে যায়।[৬৬]

শিয়া সম্প্রদায়

খিলাফত ও ইমামতকে কেন্দ্র করে শিয়া সম্প্রদায়ের জন্ম।[৬৭] তাদের মতে হযরত আলী (রা) খিলাফতের প্রথম হকদার। তারা হযরত আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে ইমামত সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি। তারা ইমামকে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে মনে করে। তাদের মতে ইমাম ভুলও করতে পারেন না, পাপও করতে পারেন না। বনু উমাইয়ার খিলাফতকালে আহলে বাইতের উপর তাদের পরিচালিত জুলুমের প্রেক্ষিতে আহলে বাইত

www.pathagar.com

সমর্থক শিয়াদের তৎপরতা ও সমর্থন বৃদ্ধি পায়।[৬৮] শিয়াগণ যায়দিয়া, ইমামিয়া, ইছনা আশারিয়া, ইসমাঈলিয়াসহ কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত। যায়দিয়াদের চিন্তা-চেতনা ইমামিয়াদের মত উগ্র নয়।

মুতাযিলা সম্প্রদায়

বনু উমাইয়ার খিলাফতকালে এ সম্প্রদায়ের জন্ম হয়।[৬৯] কথিত আছে যে, একদিন কিছুসংখ্যক লোক হাসান বসরীকে প্রশ্ন করে, বর্তমানে কিছু সংখ্যক মানুষ (খারেজীরা) মনে করে যারা কবিরা গুনাহ্ করে তারা অবিশ্বাসী এবং উম্মাহ্র বহির্ভূত। আবার মুরজিয়ারা মনে করে ঈমানদারের পাপ কোন ক্ষতি করে না। এ বিষয়ে আপনার রায় কি? হাসান বসরী এ প্রশ্নের জবাব দানের আগেই তাঁর শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা বলে উঠল, কবিরাহ্ গুনাহ্গার প্রকৃত মুসলমান নয় আবার কাফিরও নয়। ওয়াসিলের একথা শুনে হাসান বসরী বলে উঠলেন, ই'তাযিল আন্না অর্থাৎ আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। এ থেকেই মুতাযিলা শব্দের উৎপত্তি।[৭০]

মুতাযিলাগণ মনে করে, আল্লাহর গুণাবলি তাঁর সত্তা হতে পৃথক নয়। তাদের মতে কুরআন অনাদি নয়; বরং সৃষ্ট। পরকালে আল্লাহ্র দর্শন চামড়ার চোখে নয়, বরং অন্তরাত্মা দিয়েই হবে। তাদের মতে ভাল-মন্দের জন্য মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই দায়ী, তাই মানুষের কর্মের দায়িত্ব মানুষের উপরই বর্তায়। তারা নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সময় সহীহ্ হাদীসকেও অস্বীকার করে। আর নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের তাফসীরও রচনা করেছে। তাদের তাফসীরে একটি শব্দের একাধিক অর্থ থেকে সেই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যা তাদের আকীদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বিদআত

আমাদের সমাজে কেউ কেউ আছেন, দীনের অনুসরণ করতে গিয়ে এমন পদ্ধতিতে অনেক আমল করেন, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবগণও করেননি। অতীতের হক্কানী উলামায়ে কেরামের কেউ করেননি। মূলত এভাবে দীনের মধ্যে নতুন কিছু ঢোকানোর নামই বিদআত। আর ইসলামে বিদ'আতের কোন স্থান নেই।

আমাদেরকে দীনের অনুসরণ সেভাবেই করতে হবে যেভাবে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেননি তা করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন

www.pathagar.com

করতে পারব না। আর যে আমল করলে আল্লাহ খুশি হবেন না, বরং অখুশি হবে সে আমল করার যৌক্তিকতা নেই। তাই আখিরাতে নাজাতের জন্য মাজারে যাওয়া এবং কবর পূজা থেকে শুরু করে সব ধরনের শির্‌ক ও বিদআত থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আখিরাতে নাজাত লাভের জন্য সব পদ্ধতি বাতলে দিয়ে গেছেন। এখন নতুনভাবে কিছু আবিষ্কার করার অর্থ হল, এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতে ভুলে গিয়েছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)

এরূপ ধারণার অর্থ হল, তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করে যাননি। অথচ আল্লাহই ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি দীনকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাই ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন ধরনের নতুন কিছু করার সুযোগ নেই। একটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে, ইবাদতে ইজতিহাদ করার সুযোগ নেই। ইবাদত সেভাবে করতে হবে, যেভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। কিন্তু মুআমিলাত বা পারস্পরিক লেনদেনসহ নতুন উদ্ভূত সমস্যাবলির ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতিমালাকে সামনে রেখে ইজতিহাদ করার অবকাশ আছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উলামায়ে কেরাম এ ধরনের ইজতিহাদ করেছেন। মনে রাখতে হবে, বিদআত ও ইজতিহাদ এককথা নয়।

শেষকথা

পরিশেষে বলা যায়, যারা আখিরাতে নাজাত প্রত্যাশী তাদেরকে সবসময় আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য কাজ করতে হবে। চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর নাফরমানী করা যাবে না। আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে এর অর্থ এ নয় যে, দুনিয়াতে কোন কিছুই করা যাবে না। দুনিয়াতে সব কিছুই করা যাবে। তবে শর্ত হল, সব কিছু হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক।

আমরা যদি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত তথা আদর্শ অনুযায়ী দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি, তাহলে আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের ভেতরই সওয়াব পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের খাবারের দরকার। খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদেরকে ব্যবসা, চাকরি তথা বৈধ পন্থায় উপার্জন করতে হয়। আমাদের উপার্জনের টার্গেট যদি হয় খাবারের মাধ্যমে শারীরিক শক্তি অর্জন করে আল্লাহর ইবাদত করা, তাহলে আমাদের উপার্জন ও খাবার দুটিই ইবাদত হবে। এমনকি পরিবারের সদস্যদের জন্য যে খরচ করা হয়

www.pathagar.com

তাতেও সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। আমরা যখন হাসি, সে সময় আল্লাহর রাসূল কিভাবে হাসতে বলেছেন সে কথা যদি খেয়াল রেখে হাসি তাহলে হাসিতেই সওয়াব পাওয়া যাবে। আমরা যদি কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা হলে সালাম দিয়ে মিষ্টি ভাষায় কথা বলি, তাহলেও সওয়াব পাব। আবার দুঃখ-মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করে থাকলে বা কাউকে বিপদে দেখে সমবেদনা জানালেও সওয়াব পাব।

এককথায়, আল্লাহর রাসূলের আদর্শ মোতাবেক হাসলেও সওয়াব, কাঁদলেও সওয়াব, ঘুমালেও সওয়াব, পেশাব-পায়খানা করলেও সওয়াব। ব্যবসাতেও সওয়াব, লেনদেনেও সওয়াব। আযান দিলেও সওয়াব, ইমামতি করলেও সওয়াব। দেশ পরিচালনা করলেও সওয়াব আর ভাল নেতা নির্বাচন করলেও সওয়াব। বিবাহ করলেও সওয়াব, সন্তান সন্ততিকে লালন-পালন করলেও সওয়াব। এমনকি সন্তানকে আদর করে চুমু দিলেও সওয়াব। ইলম হাসিলেও সওয়াব। আবার ইলমের বয়ান করলেও সওয়াব। কোন মানুষের কষ্ট দেখে উপকার করলেও সওয়াব। নসীহতেও সওয়াব। দাওয়াত ও তাবলীগেও সওয়াব। আবার দীনের প্রয়োজনে জিহাদেও সওয়াব। জিহাদে শহীদ হলেও সওয়াব আর গাজী হলেও সওয়াব।

অপরদিকে আমরা যদি আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী ইবাদত বন্দেগী না করি তাহলে ইবাদতেও সওয়াব পাব না। যিকির করলেও আল্লাহ খুশি হবেন না। জিহাদ করে শহীদ হলেও আল্লাহ খুশি হবেন না। এককথায় আমাদের ইবাদতও ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে না, যদি আমরা আমাদের ইচ্ছামত করি। যেমন-নামাযে রুকুর আগে যদি সেজদায় যাই, তাহলে নামায হবে না। অথবা এক রাকাতে দু'সেজদার পরিবর্তে যদি আরো বেশি সেজদার প্রচলন করি, তাহলে এ নামায হবে না। ইচ্ছা করে এ ধরনের নামায প্রচলন করার জন্য গুনাহগার হতে হবে। রোযা রাখা ইবাদত; কিন্তু ঈদের দিন রোযা রাখলে ইবাদত হবে না, বরং গুনাহ হবে।

এ থেকে বুঝা গেল, আখিরাতে নাজাতের জন্য দুনিয়াতে সহীহ তরীকায় আমল করা জরুরি। আর সহীহ তরীকায় আমল করার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ যেন এ আমল কবুল করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার তরীকাও আমাদেরকে শিখিয়েছেন। এমনকি দোয়ার ভাষা কি হলে ভাল হয়, তাও বলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর শেখানো দোয়ার মূল কথাই হল, আল্লাহর হেদায়াত কামনা, জাহান্নাম থেকে বাঁচার আকুতি। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এভাবে যদি আমরা সবসময় তাঁর নির্দেশিত পথে চলি তাহলে আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। আর তিনি সন্তুষ্ট হলেই আমরা আখিরাতে সুখে থাকতে পারব। আমাদের শেষ আবাস হবে

www.pathagar.com

জান্নাত। আর আল্লাহ্‌কে যদি আমরা সন্তুষ্ট করতে না পারি, তাহলে আমাদের আবাস হবে দুঃখময় স্থান জাহান্নাম। (নাউযুবিল্লাহ)

আমরা দুনিয়াতে জানি না, আমাদের আমলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হলেন কিনা? আমাদের আমলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট তা পরিষ্কার হবে শেষ বিচারের দিন। আর সেদিন যদি তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে কোনভাবে নিস্তার পাওয়া যাবে না। তাই আল্লাহ্‌কে রাজি ও খুশি করার জন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে। আর এভাবে চেষ্টা করে আল্লাহ্‌কে রাজি ও খুশি করতে পারলে আমাদের স্থায়ী আবাস হবে জান্নাত।

আল্লাহ্ চান তাঁর বান্দাদের আবাস হোক জান্নাত। তাই তিনি সওয়াবের অনেক পথ উমুক্ত রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা নামায পড়ি তাতে সওয়াব আছে। এ নামাযের জন্য আমাদেরকে অযু করতে হয়। এ অযুতেও সওয়াব। অযুর আগে মেসওয়াক করতে হয় তাতেও সওয়াব। অযুর সময় যেসব দোয়া পড়ি তাতেও সওয়াব। এরপর নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তাতেও সওয়াব। যারা আযান দেওয়ার সুযোগ পায় না তারা যদি আযান শুনার পর আযানের জওয়াব দেয় তাতেও সওয়াব। নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেলে প্রতি কদমে সওয়াব। যে আগে মসজিদে যাবে তার জন্য বেশি সওয়াব। মসজিদে নামায জামাতে পড়লে একাকী পড়ার চেয়ে বেশি সওয়াব। আবার খানায়ে কাবা, মসজিদে নববী বা বায়তুল মাকদাসে নামায পড়লে তার জন্য অধিক সওয়াব আছে। নামাযে যেসব কিরাআত পড়া হয় তা পড়ার জন্য এবং শুনার জন্যও সওয়াব। আর যদি বুঝে তিলাওয়াত করা হয় তাহলেও তার জন্য অধিক সওয়াব নির্ধারিত। এভাবে দেখা যায়, আল্লাহ্‌পাক এক নামাযের মাধ্যমে কত ধরনের সওয়াব দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন!

অপরদিকে যে নামায পড়ে না সে শুধু নামায না পড়ার শাস্তি পাবে। তাও সে যদি তওবা করে নেয় আর তার তওবা যদি কবুল হয়, তাহলে সে গুনাহ্ থেকে মাফ পেয়ে যাবে। আর তওবা করার জন্যও আল্লাহ্ পাক সওয়াব দান করবেন। এভাবে দেখা যায়, আল্লাহ্‌পাক তাঁর বান্দাকে সওয়াব দেওয়ার জন্য কত ধরনের পথ খোলা রেখেছেন!

গুনাহ্ ও নেকীর আনুপাতিক হার হিসাব করলে দেখা যায়, পাপের তুলনায় নেকীর আনুপাতিক হার অনেক বেশি। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন বান্দা নেক কাজ করলে তাকে দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব দান করা হয়। আর খারাপ কাজ করলে একটি খারাপ কাজের জন্য একটি গুনাহ্ দান করা হয়। হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, বান্দা কোন নেক কাজের ইচ্ছা করার সাথে সাথে সওয়াব লিখা হয়ে যায়। আর নেক কাজটি করলে কয়েক গুণ বেশি সওয়াব দান করা হয়।

www.pathagar.com

অপরদিকে কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করার সাথে সাথে গুনাহ্ লিখা হয় না। বান্দা খারাপ কাজটি করার পরই পাপ লিখা হয়। আবার তওবা করলে আল্লাহ সে গুনাহও মাফ করে দেন। আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, যেসব বান্দা কুফর, শির্‌ক, নিফাক, ইরতেদাদসহ্ জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ছিল। তারা যদি ইসলাম কবুল করে তাহ্‌লে আল্লাহ্ অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। এ থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ রেখেছেন। এত সুযোগ রাখার পরও যেসব বান্দা পাপ কাজে ডুবে থাকে আল্লাহ্ তাকেই আখিরাতে সাজা দিবেন।

আফসোসের বিষয় হল, দুনিয়াতে আমরা যদি শুনি কোথাও গেলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে তাহলে আমদের যত ব্যস্ততাই থাকুক সেখানে ছুটে যাই। কিন্তু যেসব কাজ করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়াব দানের কথা বলেছেন, সেসব কাজ করার জন্য এতটুকু স্পৃহা আমাদের মধ্যে আসে না।

আমরা ক্ষণস্থায়ী আবাস সুন্দর করার জন্য অনেক শ্রম-সময়-অর্থ ব্যয় করি, সে তুলনায় আখিরাতের স্থায়ী আবাসকে সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করি না। আমাদের চোখের সামনে আমরা অনেককে মরতে দেখি; কিন্তু আমরা নিজের মৃত্যু সম্পর্কে গাফেল থাকি। আমরা দুনিয়াতে চিরদিন থাকবো না—এ কথা জানার পরও দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকি। আমরা দুনিয়াকে পেতে রাত-দিন পরিশ্রম করি; কিন্তু আখিরাতের চিরস্থায়ী আবাস সুন্দর ও আরামদায়ক করার চেষ্টা করি না। আমরা জন্মের পর থেকেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু আমরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য পুঁজি সঞ্চয় করার চেষ্টা করি না। আমরা যদি দুনিয়ার জীবনকে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য পুঁজি সঞ্চয়ের কাজে ব্যয় করি তাহ্‌লেই আমরা দুনিয়ার পরবর্তী জীবনে সুখ পাব। আর আমরা যদি দুনিয়ার জীবনে শুধু দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকি তাহলে আমাদেরকে আখিরাতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। আমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (নাঊযুবিল্লাহ্)

আমরা যদি দুনিয়াতে কোন কিছু করার সময় চিন্তা করি দুনিয়া আমার আসল ঠিকানা নয়, বরং আমার আসল ঠিকানা আখিরাত। আমার আসল ঠিকানা আখিরাতে কি হবে তা নির্ভর করছে আমার আমলের উপর-এ অনুভূতি সদা জাগ্রত রাখলে আমাদের পক্ষে খারাপ কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। আমরা যদি প্রতিনিয়ত আখিরাতের কথা চিন্তা করে দুনিয়ায় কাজ করি, তাহলে আমাদের শেষ ঠিকানা হবে জান্নাত। (আমীন)

www.pathagar.com

মানব-সৃষ্টির ক্রমবিস্তার

মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা, ফেরেশতাদের প্রচ্ছন্ন আপত্তি;
অতঃপর সর্বপ্রকৃতির মৃত্তিকা সমন্বয়ে মানব সৃষ্টি;
শয়তান ছাড়া তাকে সব ফেরেশতার সেজদা করা;
সে-ই আদি মানব।

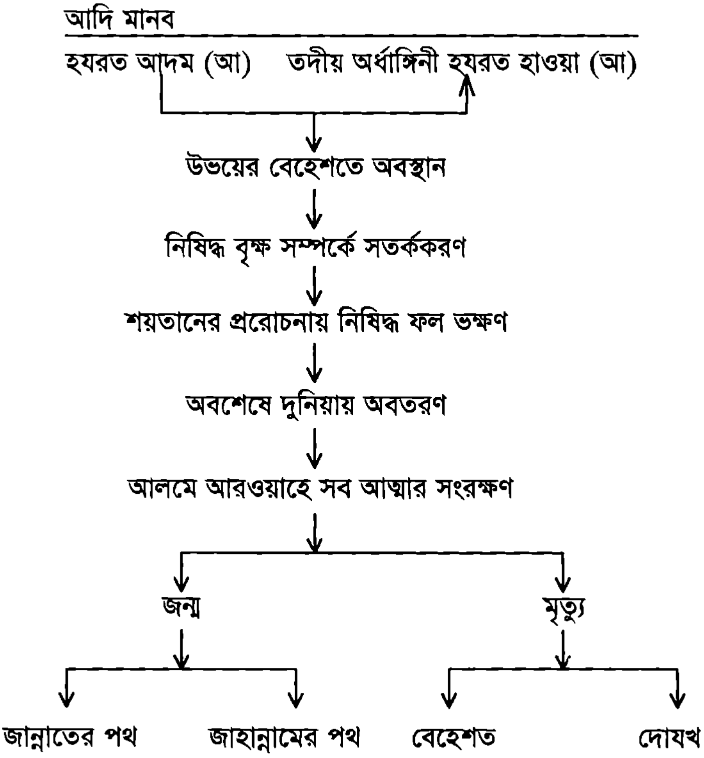

www.pathagar.com

এক নজরে মুমিন ও কাফিরের পরিণতি

অবস্থা	কাফির/ অপরাধী	ঈমানদার
মৃত্যুর আগে	জাহান্নামের ফেরেশতাদের আগমন, ভয়ংকর চিত্র প্রদর্শন। মাথার কাছে জাহান্নামের ফেরেশতারা বসা থাকবে।	জান্নাতের ফেরেশতাদের আগমন, জান্নাতের চিত্র প্রদর্শন। মাথার কাছে জান্নাতী ফেরেশতারা বসা থাকবে।
জান কবয	শরীরে রূহ দৌড়াতে থাকবে, বের হতে চাইবে না, জোরপূর্বক বের করে নেওয়া হবে।	আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল থাকবে, সন্তুষ্টচিত্তে রূহ চলে যাবে।
জান কবজের পর	জাহান্নামের ফেরেশতারা দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে পেঁচিয়ে রূহ নেবে, সবাই ধিক্কার দেবে, আসমানের দরজা খোলা হবে না, সিজ্জীনে রূহ রাখা হবে।	জান্নাতের সুগন্ধি মেখে রূহ নেওয়া হবে, ফেরেশতারা স্বাগতম জানাবে, পূর্ববর্তীরা স্বাগতম জানাবে এবং খোঁজ-খবর নিবে, রূহ ইল্লীনে থাকবে।
আলমে বরযখের সওয়াল জওয়াব	রব কে? দীন কি? নবীকে? প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।	সবই যথাযথভাবে বলবে।
বরযখের জীবন	জাহান্নামের সংযোগ, জাহান্নামের পোশাক, জাহান্নামের বাতাস, সাপের ছোবল, কবরের চাপ ভোগ করবে এবং প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের আসন দেখে মানসিক কষ্ট ভোগ করবে।	জান্নাতের সংযোগ, জান্নাতের পোশাক, জান্নাতে বিচরণ, কবরের মৃদু আলিঙ্গন, প্রতিদিন জান্নাতের স্থান দেখে মানসিক শান্তি লাভ করবে।
হাশরের ময়দানে	মুখে ভর করে যাবে, ফেরেশতারা হাঁকিয়ে নিয়ে	বাহনে চড়ে বা পায়ে হেঁটে যাবে।

www.pathagar.com

অবস্থা	কাফির/ অপরাধী	ঈমানদার
হাশরের ময়দানে	উত্তপ্ত রৌদ্রে ঘামে সাঁতরাবে।	আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে থাকবে।
আমলনামা	বাম হাতে পাবে, অস্বীকার করবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে, মুখ মলিন থাকবে।	ডান হাতে পাবে, অপরাধ স্বীকার করবে, আনন্দিত থাকবে।
মীযান	ওজন করার মত আমলই থাকবে না, পাপের পাল্লা ভারী হবে।	নেকীর পাল্লা ভারী হবে।
শাফায়াত	আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত পাবে না।	আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত পাবে।
হাউযে কাউসার	পানি পাবে না, ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।	আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পানি পান করাবেন।
পুলসিরাত	পার হওয়ার আগেই জাহান্নামে যাবে, যারা পার হতে চাইবে তারা কিছু দূর গিয়ে পড়ে যাবে, নূর বা আলো পাবে না।	বিজলীর মত হেঁটে, দৌড়িয়ে পার হবে, নূর বা আলো পাবে।
বিচারের পর এগিয়ে নেওয়ার মুহূর্ত	ফেরেশতারা ডাণ্ডা পেটা করে জাহান্নামে হাঁকিয়ে নেবে।	ফেরেশতারা সম্মানের সাথে জান্নাতে নেবে, কিশোররা অভ্যর্থনা জানাবে।
আবাসস্থলে প্রবেশের মুহূর্ত	মাথা ও পা ধরে টেনে ফেলা হবে।	সালামুন আলাইকুম তিবতুম... বলে বেহেশতের স্থান ও হুরদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।
খাবার ও পানীয়	পুঁজ, গরম পানি, শীতল পানি, নাকের ময়লা, কাঁটাযুক্ত খাবার দেওয়া হবে।	সব ধরনের পানীয়, দুধ, মধু ও শরাবের নহর, সব ধরনের ফল-মূল, সব ধরনের গোশত, মনে যা চাইবে তাই পাবে।

www.pathagar.com

অবস্থা	কাফির/ অপরাধী	ঈমানদার
পরিধেয়	গন্ধকের দুর্গন্ধযুক্ত আগুনের পোশাক, আগুনের গর্ত, আগুনের বিছানা, আগুনের চাদর দেওয়া হবে।	রেশমের পোশাক, স্বর্ণের রিং, নরম বিছানা, সবুজ শ্যামল গালিচা দেওয়া হবে।
পরিবেশ	চিৎকার, দুর্গন্ধ, এর থেকে দোযখও পানাহ্ চাইবে।	পাঁচশত বছরের দূরবর্তী পথ থেকেও সুগন্ধ পাওয়া যাবে, ঝরনাধারা, গাছগাছালি থাকবে। কোন ধরনের বাজে কথা শুনবে না।
আল্লাহর দীদার	আল্লাহকে দেখতে পাবে না।	আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাবে।
কতদিন থাকবে	কাফির মুশরিক, মুনাফিকরা চিরদিন থাকবে, পাপী মুমিনরা বিচারের সময় মাগফিরাত না পেলে পাপ অনুযায়ী সাজাভোগ করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশে নাজাত পাবে।	জান্নাত হবে স্থায়ী আবাস, মরণ হবে না, জান্নাত ধ্বংস হবে না।

কি কারণে একজন মানুষ জান্নাতে যাবে বা জাহান্নামে যাবে

কারণ	জান্নাত	জাহান্নাম
স্থায়ী	ঈমান	কুফর, শির্ক, নিফাক, ইরতিদাদ, ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাস
অস্থায়ী কারণ	যারা জান্নাতে যাবে তারা স্থায়ীভাবেই থাকবে	কবীরাহ গুনাহকারী বিচারের সময় মাগফিরাত না পেলে

www.pathagar.com

এক নজরে কতিপয় কবীরা গুনাহ্ ও আমলে সালেহ্

কবীরা গুনাহ্	আমলে সালেহ্
নামায তরক করা	জামাআতের সাথে নামায আদায় করা
হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করা	হজ্জ ফরয হবার সাথে সাথেই হজ্জ করা
রোযা ভঙ্গ করা	রোযা সঠিকভাবে পালন করা
যাকাত না দেওয়া	যাকাত আদায় ও দান-সদকা করা
যিনা করা বা সমকামিতা	বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা মিটানো
চুরি করা	অন্যের মাল সংরক্ষণ করা
সুদ খাওয়া	করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ দেওয়া
মিথ্যা কথা বলা	ওয়াদা রক্ষা করা
কোন মানুষকে কষ্ট দেওয়া	মানুষের উপকার করা
প্রস্রাব থেকে পবিত্র না থাকা	সবসময় পবিত্র থাকার চেষ্টা করা
গীবত করা	কারো অনুপস্থিতিতে দোয়া করা
পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমি কাপড় পরিধান করা	অহংকার প্রকাশ পায় এমনভাবে পোশাক পরিধান না করা
চোগলখোরী করা	মানুষের মধ্যে বিবাদ হলে মীমাংসা করে দেওয়া
ওজনে কম দেওয়া বা বেশি নেওয়া	প্রাপ্য কম নিয়ে কাউকে অধিকার বেশি দেওয়া
ধোঁকাবাজি করা	সত্য ও সততার সাথে কাজ করা
অন্যায়ভাবে খুন করা বা আত্মহত্যা করা	জানের নিরাপত্তা বিধান করা
ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা	ইয়াতীমকে লালন-পালন করা
মদ্যপান করা	অবৈধ পানীয় থেকে বিরত থাকা
জাদু করা	কারো অনিষ্ট না করা

www.pathagar.com

কবীরা গুনাহ্	আমলে সালেহ্
গণকের কথা বিশ্বাস করা	গণকের কাছে না যাওয়া
পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া	পিতা-মাতার খিদমত করা
সন্তানকে কুশিক্ষা দেওয়া	সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া	প্রতিবেশীর হক আদায় করা
রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের হক আদায় না করা	প্রত্যেকের খোঁজ-খবর রাখা
মেয়ে হলে অসন্তুষ্ট হওয়া বা তাদের হক নষ্ট করা	মেয়েকে লালন-পালন করে উপযুক্ত পাত্রের কাছে বিয়ে দেওয়া
দীনী জিহাদ থেকে পলায়ন করা	দীন বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও শাহাদাতবরণ করা বা গাজী হওয়া
ঘুষ খাওয়া	সততার সাথে দায়িত্ব পালন করা
পর্দা লজ্ঘন করা	শরীয়তের সীমালজ্ঘন না করা
যুলুম করা	কারো উপকার করা
কুরআনের মাহফিলে বাধা দান	কুরআন শিখা ও অপরকে শেখানো
পাপ কাজের প্রসার	আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের কাজ করা
দীনের বিরোধিতা	দীন কায়েমের চেষ্টা করা
বিদআতের উদ্ভাবন	কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা
রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছামূলক আমল	আল্লাহর জন্যই খালেসভাবে আমল করা

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুস্তাফিজ

www.pathagar.com

পাদটীকা

১. ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ বানর থেকে বিবর্তন হতে হতে এ পর্যায়ে এসেছে। ১৮৫৭ সালে "In the Origin of species by Means of Natural Selection" এবং "The Descent of Man and Selection in Relation to Sex" নামক ডারউইনের পুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হবার পর থেকে অনেকে ভাবতে থাকেন, বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের মাথার খুলি গড়ে ১৪৫০ সেন্টিমিটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু গরিলা, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি বানরজাতীয় প্রাণীর খুলির মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ৪৫০ সেন্টিমিটার। বিবর্তনবাদীরা প্রথমে মনে করতেন সংবেদনশীল হাতের কারণে ও গাছে জীবনধারণের কৌশল রপ্ত করায় বানরজাতীয় প্রাণীর মস্তিষ্ক উন্নত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা গাছ থেকে নেমে জমিনে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে বিবর্তনবাদীরা মনে করেন একই পূর্বপুরুষ hypothetical থেকে দুটি শাখার উদ্ভব হয়েছে। একটি শাখায় কয়েক প্রজাতির পর মানুষ হয়েছে। আর অন্য শাখায় কয়েক প্রজাতির পর শিম্পাঞ্জির উদ্ভব হয়েছে। (মানুষ ও মহাবিশ্ব পৃঃ-৮১-৮২)

২. তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা এটা বিশেষ ইলম বা মাটির তৈরি মানুষের প্রকৃতি কেমন হবে তা উপলব্ধি করে বলেছে। (ইবনে কাসীর আরবী ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৭৪) তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করা হয়েছে, ফেরেশতারা শুধু ততটুকু জানে যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করেন। এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান থেকেই ফেরেশতারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে, পৃথিবীতে যাদেরকে সৃষ্টি করা হবে তারা ফিতনা-ফাসাদ করবে। কারো কারো মতে, ফেরেশতারা পূর্ববর্তী জিন জাতির দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে অবহিত ছিল। জিন জাতিকে দমন করার জন্য আল্লাহ ইবলিসকে দায়িত্ব দেন। ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে ইবলিস জিন জাতিকে দমন করে সমুদ্র এবং পাহাড়ে আবদ্ধ করে রাখে। সে থেকেই ইবলিসের মর্যাদা বেড়ে যায়। জিন জাতির ফিতনা-ফাসাদ এর ঘটনার কথা স্মরণ করেই ফেরেশতারা বলেছিল মানুষ সৃষ্টি করলেও তারা তো আবারও ফিতনা-ফাসাদ করবে। যদি ইবাদতের জন্য মানুষ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে ফেরেশতারা তো সর্বদা ইবাদাত বন্দেগী করছেই। (তাফসীরে কুরতুবী প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৬৪-২৬৫)

৩. হযরত আবূ মুসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সারা পৃথিবীর মাটির উপরিভাগ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই আদম সন্তানেরা লাল, সাদা-কালো বিভিন্ন রঙয়ের সংমিশ্রণে হয়। কোমল ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হয়। খারাপ কিংবা ভাল হয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, মেশকাত আল মাসাবীহ; বাব আল ঈমান বিল কাদর)

৪. সাইয়েদ কুতুব বলেন, সম্ভবত ঐ গাছটিকে পার্থিব জীবনের যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিছু নিষিদ্ধ বস্তু না থাকলে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায় না এবং স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন মানুষকে ইচ্ছা শক্তিহীন পশু-পাখি থেকে পৃথক করা যায় না। মানুষ কতটা ধৈর্য সহকারে আল্লাহর সাথে

www.pathagar.com

কৃত অঙ্গীকার ও তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলতে পারে তার পরীক্ষা নিষিদ্ধ জিনিস ছাড়া হতে পারে না। (ফী যিলালিল কুরআন ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১০৯) নিষিদ্ধ গাছটির নাম আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেননি। তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করা হয়, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবাইর ও যা'দা ইবনে হুবাইরা বলেন, গাছটি ছিল আংগুরের। আবূ মালেক ও কাতাদা বলেন, চিরহরিত সুগন্ধি চারা গাছ। ইবনে জুরাইজ এবং সাহাবীদের কারো কারো মতে সেটি ছিল ডুমুর গাছ। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেন, হযরত আদম (আ)-এর তাওবার পর ঐ গাছের ফল খাওয়া আল্লাহ আদম (আ)-এর বংশধরদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। (কুরতুবী ঃ ৩০৫)

৫. হাওয়ার নামকরণের তাৎপর্য হল, তাঁকে হযরত আদম (আ)-এর বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবিত মানুষ থেকে সৃষ্টি করার কারণে তাঁর নাম দেওয়া হয় হাওয়া। (কুরতুবী ১ম খণ্ড ঃ ৩০১)

৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীম আল কুরআন, সূরা আত-তাকাসুরের তাফসীর।

৭. সাইয়েদ কুতুব, শহীদ, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ঃ সূরা হুমাযাহ।

৮. বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীম আল কুরআন সূরা আল হুমাযাহর তাফসীর পড়ুন।

১১. এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী (রহ) বলেন, কুরআন হাদীসের শিক্ষা জনগণের সামনে তুলে ধরে তাদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে হবে যে, দুনিয়ার সকল মানুষের দৃষ্টি লুকানো সম্ভব হলেও আল্লাহর দৃষ্টি থেকে লুকানো অসম্ভব। অন্যদের শাস্তি থেকে বাঁচা সম্ভব হলেও আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের আমলনামা তৈরি হচ্ছে। নিঃসন্দেহে একদিন না একদিন মরতে হবে এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, নামায না পড়ে, রমযান মাসে প্রকাশ্যে পানাহার করে আল্লাহর দীনের অবমাননা করবে, নিঃসংকোচে পাপ পঙ্কিলতায় পড়ে হাবুডুবু খাবে, মানুষের অধিকার হরণ করে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, মানুষের ইজ্জত আবরু লুট করে আল্লাহর আদালতে পেশ হবে, মানুষের রক্তপাত করে তার সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং তার হাত থেকে ছুটে যাবে। এ জগতে চালবাজি করে আযাব ভোগ করা থেকে বেঁচে গেলেও আল্লাহর হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। এ কথাগুলো জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করে দিলে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ ইসলামী বিবেক ও নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। [মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাজ্য শাসন পদ্ধতি-মাওলানা মওদূদী ঃ পৃষ্ঠা ২৫-২৬]

১০. মওত কা মানযার পৃষ্ঠা ১২৯

১১. ইল্লীন শব্দটি উলুউয়ুন থেকে এসেছে। এর অর্থ -উপরে। এ থেকে বুঝা যায়, ইল্লীন উপরে। এর আকৃতি মানবীয় ধারণার উর্ধ্বে। সাইয়েদ কুতুব বলেন, ইল্লীয়্যীন শব্দটি উচ্চতা অর্থবোধক। এর দ্বারা ধরে নেওয়া যায়, সিজ্জীন নিম্নতা নির্দেশক। মাওলানা মওদূদী (র) বলেন, সিজ্জীন শব্দটি এসেছে সিজনু থেকে। সিজনু মানে

www.pathagar.com

জেলখানা বা কয়েদখানা। এর অর্থ হল- এমন ধরনের রেজিস্টার খাতা যাতে শাস্তি লাভযোগ্য লোকদের আমলনামা লেখা আছে।

১২. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর "আহকাম আল জানায়েয ওয়া বিদয়ুহা পৃষ্ঠা ২০

১৩. আব্দুর রহমান আল জায়ায়েরী, কিতাব আল ফিকহ আলাল মাযাহিব আল আরবা ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৩৮৬-৩৮৭

১৪. আহওয়ালুল কুবুর ওয়া আহওয়ালু আহলিহা ইলান নুসুর ঃ পৃষ্ঠা ১৪১

১৫. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর "আহকাম আল জানায়েজ ওয়া বিদয়ুহা" পৃষ্ঠা ৮১

১৬. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর "আহকাম আল জানায়েজ ওয়া বিদয়ুহা" পৃষ্ঠা ১০৩-১৬৬

১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯

১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯

১৯. কুরআন ও হাদীসের আলোকে আখিরাতের চিত্র ঃ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন।

২০. হাদীসটি মেশকাতুল মাসাবীহ এর বাব আল ইসবাতি আযাবিল কবর অধ্যায়ে আছে।

২১. মাজদী ফাতহী আস সাইয়েদ ঃ আল হায়াত আল বারযাখিয়্যা লিননেসা, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৭

২২. আররূহ ঃ আল্লামা ইবনে কায়্যিম, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৭

২৩. আহওয়ালুল কুবুর ওয়া আহওয়ালু আহলিহা ইলান নুসুর ঃ আল্লামা আব্দুর রহমান বিন আহমদ বিন রযব, প্রথম সংস্করণ ২০০১, দার আল কিতাব আল আরবী, বৈরুত, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

২৪. পহ্বর্বোক্ত, পৃ- ৩১

২৫. আহওয়ালুল কুবুর ওয়া আহওয়ালু আহলিহা ইলান নুসুর ঃ পৃ-১৪১

২৬. তাফসীর মাআরেফ আল কুরআন ঃ সূরা আন নামল-এর তাফসীর, আয়াত ঃ ৮০

২৭. তাফসীরে কুরতুবী ৭ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৩২-২৩৩

২৮. তাফসীরে তাফহীম আল কুরআন ঃ সূরা আন-নামল এর ৮০ নম্বর আয়াতের তাফসীর।

২৯. তাফসীরে কাবীর দ্বাদশ খণ্ড ঃ সূরা নামলের তাফসীর, পৃষ্ঠা ২১৬

৩০. তাফসীরে কুরতুবী ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৬৮-২৭৫

৩১. তাফসীরে তাফহীম আল কুরআন ঃ সূরা আল বাকারা ১৫৫ নম্বর টীকা।

৩২. আহওয়ালুল কুবুর ওয়া আহওয়ালু আহলিহা ইলান নুসুর ঃ পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৬

৩৩. মাজদী ফাতহী আস সাইয়েদ ঃ আল হায়াত আল বারযাখিয়্যা লিননেসা, পৃষ্ঠা ৮২

৩৪. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী লিখিত "আহকাম আল জানায়েজ ওয়া বিদয়ুহা" পৃষ্ঠা ২৬২

www.pathagar.com

৩৫. আব্দুর রহমান আল জাযায়েরী, কিতাব আল ফিকহ্ আলাল মাযাহিব আল আরবা, ১ম খণ্ড ঃ ৪১৪

৩৬. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী কর্তৃক লিখত "আহকাম আল জানায়েজ ওয়া বিদয়ুহা" পৃষ্ঠা ২৩০

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৫

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৮

৩৯. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর "আহকাম আল জানায়েজ ওয়া বিদয়ুহা" পৃষ্ঠা ২০৬-২০৭

৪০. আল্লামা আবুল হাসান, তানজীম আল আশতাত ২য় খণ্ড ঃ পৃ-৪৭

৪১. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী কর্তৃক লিখিত "আহকাম আল জানায়েজ ওয়া বিদয়ুহা" পৃষ্ঠা ২১৪-২১৯

৪২. মাজদী ফাতহী আস সাইয়্যেদ ঃ আল হায়াত আল বারযাখিয়্যা লিননেসা, পৃষ্ঠা ৯৩

৪৩. পৃথিবী হল মহাশূন্যে ভাসমান একটি গ্রহ। প্রতিদিন নিজ অক্ষে একবার করে ঘুরছে আর সূর্যের চারদিকে বছরে একবার ঘুরছে। গ্রহ সূর্যের চারদিকে আছে। প্রায় গ্রহেরই এক বা একাধিক উপগ্রহ রয়েছে। যেমন– চন্দ্র হল পৃথিবীর উপগ্রহ। এ ছাড়া সূর্যের চারদিকে অসংখ্য বস্তুপিণ্ড এবং ধূমকেতু ছড়িয়ে আছে। এসব কিছু নিয়েই সৌরজগৎ গঠিত। এ সৌরজগৎ একটি গ্যালাক্সির মধ্যে অবস্থিত। সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গ্যালাক্সির চারিদিকে ঘুরছে। এ গ্যালাক্সিতে অনেকগুলো নক্ষত্র দলবদ্ধভাবে থাকে। সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সিতে তার নাম মিলকীওয়ে। এতে প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে। মিলকীওয়েতে যেসব নক্ষত্র রয়েছে তা একটি থেকে আরেকটি গড়ে চার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আর গ্যালাক্সির এক কিনারা থেকে আরেক কিনারার দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ আলোক বর্ষ। মিলকীওয়ে গ্যালাক্সি পঁচিশ কোটি বছরে একবার ঘুরে। আর এর কারণেই সূর্যকে তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে হয়।

আমরা খালি চোখ বা দূরবীন দিয়ে মিলকীওয়ে গ্যালাক্সির সামান্য অংশই দেখতে পাই। মিলকীওয়ে ছাড়াও আরো অনেক গ্যালাক্সি আছে। বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী কোন কোন গ্যালাক্সির ব্যাস পাঁচ লক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত হতে পারে। এই যে বিশাল মহাবিশ্ব তা সর্বদা সম্প্রসারিত হয়। একথা বিজ্ঞানীরা বলার অনেক আগেই কুরআন বলেছে, "আকাশমণ্ডলীকে আমরাই সৃষ্টি করছি শক্তি দ্বারা এবং নিশ্চয়ই আমরা একে সম্প্রসারিত করছি। (আল কুরআন ৫১:৪৭) মহাবিশ্ব বর্তমানে যে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আছে এ নিয়ম-শৃঙ্খলা একদিন ভেঙে যাবে। বর্তমানে বিশ্ব সম্প্রসারিত হল কিন্তু সময়ের ব্যবধানে আবার সংকুচিত হয়ে যাবে। আর সে সময় সব প্রাকৃতিক বিধান অচল হয়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। "At the Singularity, general relativity and all other physical laws would break down" - A Brief History of Time by Stephen Hawking. বিস্তারিত জানার জন্য মানুষ ও মহাবিশ্ব বইটি পড়ুন।

www.pathagar.com

৪৪. কেউ কেউ মনে করেন, শিঙ্গার প্রথম ফুঁকে সবাই মারা যাবে এবং সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই অচেতন হয়ে যাবে এবং তৃতীয় ফুঁকের পর সবাই চেতনা লাভ করে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটে চলবে। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন মানুষ ও মহাবিশ্ব পৃষ্ঠা ১৫১-১৭৮

৪৫. আল কুরআন ৬৯ ঃ ১৩

৪৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড ঃ সূরা আল যিলযাল এর তাফসীর দেখুন।

৪৭. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে মক্কী– আল আকীদাত আল ইসলামিয়্যা ঃ পৃষ্ঠা ৩০৬

৪৮. মেশকাতুল মাসাবীহ এর হাশিয়া পৃষ্ঠা ১৪৪

৪৯. আল মাদখাল লি দেরাসাতি আল আকিদাতি আল ইসলামিয়্যা।

৫০. আল আকিদাত আল ইসলামিয়্যা, পৃষ্ঠা ২৯১

৫১. মাওলানা মওদূদী– সীরাতে সরওয়ারে আলম দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২২-১২৩

৫২. প্রাগুক্ত ১৪৮-১৪৯

৫৩. প্রফেসর খুরশীদ আহমদ– সমাজতন্ত্র না ইসলাম ঃ পৃষ্ঠা ২২০-২২১

৫৪. মাসিক মদীনা– অক্টোবর ১৯৮৮ সংখ্যা।

৫৫. অধ্যাপক গোলাম আযম– ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পৃষ্ঠা ৬-৯

৫৬. মিনহাজুল মুসলিম ঃ পৃষ্ঠা ৬৭০

৫৭. তানজীম আল আশতাত ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৫৬

৫৮. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান পৃষ্ঠা ২৬৫

৫৯. তানজীম আল আশতাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭-২৯

৬০. আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদদা– সালাসু রাসায়েল ফী ইস্তিহবাব আদ দোয়া, পৃষ্ঠা ৩৫

৬১. বিস্তারিত জানার জন্য হিসনুল মুসলিম, জিকর ও দোয়াসহ বিভিন্ন বই পড়ুন

৬২. মাআরেফ আল কুরআন– সূরা আল যুমার-এর তাফসীর পৃষ্ঠা ১১৭২

৬৩. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন– সূরা আন নাস-এর তাফসীর

৬৪. তাফসীর তাফহীমুল কুরআন– সূরা আন নাস-এর তাফসীর

৬৫. কুরআনের পরিভাষা– ড. মুস্তাফিজুর রহমান পৃষ্ঠা ৬৫-৬৭

৬৬. গোলাম আহমদ হারিরী, তারিখ তাফসীর ওয়া মুফাসসিরীন পৃষ্ঠা ৫০৩-৫০৭

৬৭. প্রাগুক্ত ৩৫৩

৬৮. প্রাগুক্ত

৬৯. প্রাগুক্ত ৩১২

৭০. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. কুরআনুল করীম
২. হাদীস শরীফ
৩. মেশকাত শরীফ
৪. আত তারগীব ওয়া আত তারহীব - হাফেজ যাকিউদ্দীন আব্দুল আযীম ইবনে আব্দুল কাবি
৫. রিয়াদুস সালেহীন
৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর
৭. তাফসীরে কুরতুবী
৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী - তাফহীমুল কুরআন
৯. সাইয়েদ কুতুব শহীদ - ফী যিলালিল কুরআন
১০. মুফতী মুহাম্মদ শফী - মাআরেফ আল কুরআন
১১. সাইয়েদ কুতুব - মাশাহিদ আল কিয়ামাহ
১২. মাজদী ফাতহী আস সাইয়েদ, আল হায়াত আল বারযাখিয়্যাহ লিননিসা, মাকতাবাত আত তাওফিকিয়্যাহ
১৩. আল্লামা আবুল হাসান, তানযীম আল আশতাত
১৪. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী - ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (মাওলানা আব্দুর রহীম অনূদিত) খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ ১৯৯৯
১৫. আবু আয়মান আব্দুল মজিদ, আত তারীক ইলাল জান্নাত, দার আল উলুম, উম্মুল কুরা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৯
১৬. ড. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল মতলিক, হুস্ন আল খাতিমা, দার আল ওয়াতন, ১ম সংস্করণ ১৯৯৯
১৭. তালআত ইবনে ফুয়াদ আল হালওয়ানী, আহওয়াল আন নার ওয়া সাবীল আন নাজাত মিনহা, দার আদ দিয়া
১৮. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে মাক্কী, আল আকীদাত আল ইসলামিয়্যাহ
১৯. আহমদ ফায়েয– আল ইয়াওম আল আখের ফী যিলাল আল কুরআন
২০. আব্দুল্লাহ আহমদ খুসাইম– আলমাওত মা যা আদাদানা লাহু
২১. খাজা মুহাম্মদ ইসলাম, মওত কা মানযার
২২. মাওলানা মুহাম্মদ আশেক এলাহী– মরণ কে বাদ কিয়া হোগা
২৩. আব্বাস আলী খান– মৃত্যু যবনিকার ওপারে
২৪. এ. কে. এম নাজির আহমদ– হায়াত আদদুনিয়া ওয়াল আখিরাত

www.pathagar.com

২৫. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন কুরআন-হাদীসের আলোকে আখিরাতের চিত্র
২৬. ইমাম আয যাহাবী– কবীরা গুনাহ্ (হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক অনূদিত)
২৭. মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী– আদাবে জিন্দেগী
২৮. অধ্যাপক গোলাম আযম– স্টাডি সার্কেল
২৯. আশ শাতেব– আল ই'তেসাম
৩০. আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদদা– সালাসু রাসায়েল ফী ইস্তিহ্বাব আদ দোয়া
৩১. ড. সাবের তায়িমা, আল আকায়েদ আল বাতেনিয়্যাহ্, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬
৩২. আবূ মনসুর মাতুরুদী– তাবীলাত আহল আস সুন্নাত (টীকা ড. মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক সংযোজিত)
৩৩. ড. ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল বুরাইকান– আল মাদখাল
৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে জারুল্লাহ ইবনে ইব্রাহীম জারুল্লাহ্– আল কাওয়াকেব আননাইয়েরাত
৩৫. ড. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল খুমাইস– শরহ্ আল আকিদাত আত তাহাবিয়্যাহ্
৩৬. সদরুদ্দীন ইসলাহী– হাকীকতে নেফাক
৩৭. আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ– সমাজ সংগঠন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
৩৮. খন্দকার আবুল খায়ের– কবরের সওয়াল-জওয়াব
৩৯. মাওলানা এ কে এম ইউসুফ– মহাগ্রন্থ আল কুরআন কি ও কেন
৪০. ড. আব্দুল্লাহ আল মুসলিহ, ড. সালাহ আস সাবী– মুসলমানকে যা জানতেই হবে। (মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরী সম্পাদিত)
৪১. মেজর মোঃ জাকারিয়া কামাল, জি– মানুষ ও মহাবিশ্ব
৪২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)– মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাজ্যশাসন পদ্ধতি
৪৩. ড. মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮
৪৪. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী– জিকর ও দোয়া
৪৫. ড. সাঈদ ইবনে আলী– হিসনুল মুসলিম
৪৬. অধ্যাপক গোলাম আযম– ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, আল আযামী পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৯
৪৭. ড. নাসির উদ্দীন আলবানী– আহকাম আল জানায়েয ওয়া বিদয়ুহা, মাকতাবা আল মায়ারেফ, রিয়াদ, নতুন সংস্করণ ১৯৯২

www.pathagar.com

৪৮. আব্দুল লতিফ আশুর-হায়াতুনা বা'দাল মাওত, মাকতাবাত আল কুরআন, কায়রো, ১৯৯৮
৪৯. আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ বিন রযব, আহওয়ালুল কুবুর ওয়া আহওয়ালু আহলিহা ইলাল নুসুর - প্রথম সংস্করণ ২০০১, দার আল কিতাব আল আরবী, বৈরুত
৫০. আল্লামা ইবনে কায়্যিম, আররূহ, চতুর্থ সংস্করণ
৫১. প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, সমাজতন্ত্র না ইসলাম, দাওয়াহ্ একাডেমী আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান - ভাষান্তর লুৎফুর রহমান ফারুকী, প্রকাশকাল ১৯৯৫
৫২. আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী, ইসলাম ও খ্রীস্টবাদ, অনুবাদ মুহাম্মদ আব্দুল করীম নাঈমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩
৫৩. মুহাম্মদ অব্দুর রহীম, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ১৯৫২
৫৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামী অর্থনীতি, সংকলনে প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, সম্পাদনা অধ্যাপক শরীফ হুসাইন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বই প্রসঙ্গে

প্রাণীর জন্য মৃত্যু সবচেয়ে বড় সত্য। এই অনিবার্য সত্যই মানুষকে তার চূড়ান্ত ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিবে। মানুষের আসল ঠিকানা কোথায়? তার উৎস কোথায়? কোথায় তাকে চলে যেতে হবে? কী হবে তার সঙ্গী? কোন্ পথে চললে সে পাবে চিরস্থায়ী শান্তিনিবাস জান্নাত? আর জাহান্নামের কঠিন শাস্তিইবা কেন ভোগ করতে হবে? এসব বিষয়ে দলীল-প্রমাণের আলোকে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এ বইখানিতে। বইখানি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। ১. পৃথিবী মানুষের আসল ঠিকানা নয়, ২. মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা, ৩. কবরে সাওয়াল-জওয়াব ও বরযখের জগৎ, ৪. কিয়ামত বা মহাপ্রলয়, ৫. জান্নাত ও জাহান্নাম, ৬. যে সব কারণে মানুষ দোযখে যাবে, ৭. আরো যে সব কারণে মানুষ দোযখে যেতে পারে ও ৮. আখিরাতে সফলতা লাভের পথ।

লেখক প্রসঙ্গে

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ একজন উদীয়মান ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে 'আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ' বিষয়ে বিএ অনার্স ও এমএ পাস করেন। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'স্বর্ণপদক' প্রাপ্ত হন। জনাব ইউনুছ 'সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ঃ একটি পর্যালোচনা' বিষয়ে এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি লন্ডনে উচ্চ শিক্ষায় রত আছেন।

দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ
পরিবেশক ঃ কামিয়াব প্রকাশন